গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

# গল্প-সঞ্চয়ন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—সাড়ে তিন টাকা—

প্রথম সংস্করণ
কার্তিক ১৩৬০

লেখকের কয়েকটি নূতন অর্থাৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নয় এমন গল্পের সহিত পুরাতন কয়েকটি ভাল গল্প সঞ্চয় করিয়া এই সঞ্চয়ন প্রকাশিত হইল।

—প্রকাশক



শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান কর্তৃক নিউ সরস্বতী প্রেস ১৭, ভীমঘোষ লেন, কলিকাতা—৬
হইতে মুদ্রিত ও শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২
হইতে প্রকাশিত।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

করকমলেষু

এই লেখকের ঃ—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মনে ছিল আশা
ভাড়াটে বাড়ী
রাত্রির তপস্যা
পুরুষ ও রমণী
প্রভাত সূর্য
বহু বিচিত্র
স্বর্ণ মুকুর
সীমান্ত রেখা
শ্রেষ্ঠ গল্প
প্রেরণা
ছুটি
আবছায়া
কাছে আছে যারা
রাত মোহানা
সীমান্ত রেখা
জ্যোতিষী
নবযৌবন
দুর্ঘটনা
কমা ও সেমিকোলন
সাবালক
রজনীগন্ধা
কোলাহল
চতুর্দোলা
মিলনান্ত
নববধূ
স্মরণীয় দিন

# সঙ্কোচ

সেটা বোধ হয় কি একটা ছুটির দিন। হ্যাঁ, বইয়ের দোকানগুলো সব বন্ধ ছিল। তাই অত সন্ধ্যারাতেই পাড়াটা যেন থম-থমে হয়ে উঠেছিল।

অনেকদিন পরে প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়েছি, মনটা খুশী আছে। হাতে তেমন কাজও নেই—খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুটপাথের ওপর ঢালা বইগুলো দেখলুম, তারপর কী খেয়াল হ'ল, ইচ্ছে ক'রেই য়্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের পেছনের গলিটা ধরলুম। বহুদিন এ রাস্তায় চলেছি কিন্তু সে সব দিনে দোকান-পাট খোলা থাকে, লোক আর আলোতে এর চেহারা হয় স্বতন্ত্র। আজ এই অন্ধকারে কেমন লাগে, সেটাও দেখতে ইচ্ছে ছিল।

কিন্তু একটুখানি গিয়েই দাঁড়াতে হ'ল। একটি ষোল সতেরো বছরের ছোকরা সন্দেহজনক ভাবে একটা দোকানের রকে বসে আছে। মানে, আসলে সন্দেহজনক তার চেহারাটা। চুলগুলো উস্কো খুস্কো, গায়ের শার্ট আর পরনের ধুতি শতছিন্ন, মুখটাও কেমন ফুলো ফুলো—খালি পা। ক্লান্ত ভাবে বন্ধ দরজায় ঠেস্ দিয়ে বসে আছে। ব্যাপার কি, চোর নয় ত? এইটেই প্রথম মনে হয়েছিল, তবে একটু পরেই বুঝলুম তা নয়। ছেলেটা হঠাৎ উঠে সে পিচ্ ক'রে থুথু ফেললে। পাশেই গ্যাসের আলোর থাম, তার উজ্জ্বল আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেলুম, সে থুথুর প্রায় সবটাই রক্ত।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'ব্যাপার কি ভাই, শরীর কি খারাপ লাগছে?'

ছেলেটি ভাল ক'রে তাকালেও না আমার দিকে। বললে, 'শরীরের আর অপরাধ কি? শালারা যা বে-ধড়ক্ ঠেঙ্গিয়েছে! দেখুন না, কাঁচা দাঁত

একটা ভেঙ্গে দিয়েছে—' বাঁ হাতের মুঠোটা খুলে দেখালে, সত্যিই খানিকটা দাঁত রয়েছে সেখানে।

থুথুর সঙ্গে রক্তের রহস্যটা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আমি একটু ব্যস্ত ভাবেই প্রশ্ন করলুম, 'কারা মারলে ভাই এমন ক'রে? কী করেছিলে?'

তেম্‌নি নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর এল, 'পকেট কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিলুম। বাসের মধ্যে কি না, পালাতে পারিনি। একবাস লোক পড়ল একেবারে আমার ওপর। তবু ভাগ্যিস্ মার-ধোর করেই ছেড়ে দিলে, পুলিসে দিলে আরও ক্ষোয়ার হ'ত।'

ওর সহজ স্বীকারোক্তিতে রীতিমত কৌতুক বোধ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু কৌতূহলও হ'ল। প্রশ্ন করলুম, 'তা তুমি এই বয়সে এমন পেশাই বা ধরলে কেন? দেখলে ত তোমাকে ভদ্দর ঘরের ছেলে ব'লে বোধ হয়।'

হঠাৎ সে যেন একটু উত্তপ্ত হ'য়ে উঠল, ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলে, 'কী করব, ভদ্দর লোকের ত ছেলে! তাই ব'লে কি আর উপোস ক'রে শুকিয়ে মরব?'

'কেন, তোমার কি কেউ নেই?'

'থাকবে না কেন! রাবণের গুষ্টি আছে। বাবা ম'রে গেছে অবশ্য। কাকারা আছে শুনেছি। চোখে দেখিনি! মা মরে যাবার পরই দিদিমা সোহাগ ক'রে নিয়ে এসেছিল আর পাঠায়নি। বাবা তার পর বে করে, তবু নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমাকে, তখন এরা পাঠালে না! তারপর দিদিমা মরে গেলে মামা নিজমূর্তি ধরলে! ইস্কুলে পড়ছিলুম সে সব বন্ধ ক'রে দিলে, চাকরের মত খাটাতে লাগল—বাজার করা, রেশন আনা, গম ভাঙ্গানো, জল তোলা, কয়লা ভাঙ্গা, উনুনে আঁচ দেওয়া—কি নয়? এক ঠিকে ঝি আছে বাসন মাজার, সে না এলে বাসনও মাজতে হ'ত। কাজে একটু ফাঁক পেলে একটা না একটা ছেলেমেয়েকে ট্যাঁকে ক'রে ঘুরে বেড়ানো—সে কথা ত বাদই দিন—তার ওপর বেদম মার ছুতোয় নাতায়, কত সহ্য হয় বলুন! একদিন পাড়ার একটি লোক,

ডেকে বললে, হ্যাঁরে ছোঁড়া, তুই কি আর চাকরি পাস না কোথাও। কত মাইনে দেয় এরা? আমি ত অবাক্! বললুম, সে কি মশাই, উনি ত আমার মামা! জিজ্ঞেস করলে, আপন মামা? যখন বললুম, হ্যাঁ, তখন বললে, বাবা কংস কালনেমিকে যে ছাড়িয়ে গেল এরা! তা হ্যাঁরে খোকা, বিনি-মাইনেয় মামার বাড়ী কাজ না ক'রে অন্য কোথাও চেষ্টা দেখ্‌না, খাওয়া পরা ছাড়া মাইনেও পাবি।'

এই পর্যন্ত বলে ছোকরা চুপ করলে। বোধ হয় ক্লান্তই হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু আমার তখন কৌতূহল বেড়ে গেছে, বললুম, 'তারপর?'

পিচ্‌ ক'রে আর একবার থুথু ফেললে, আরও খানিকটা রক্ত—সে কিন্তু তা গ্রাহ্যও করলে না। বললে, 'সেই বড় ধিক্কার লাগল জানেন। একদিন তাই দুত্তোর ব'লে বেরিয়ে পড়লুম। নিজের একটা জামাও ছিল না, মামার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ডাইংক্লিনিং গিয়েছিলুম—মামারই ধুতি শার্ট পরে হাওয়া। গিয়ে উঠলুম ইস্কুলের এক বন্ধুর বাড়ী! সে সব শুনে বললে, গ্যাখ্‌ ভাই আমি ছুতো নাতা ক'রে দুতিন দিন রাখতে পারি বড় জোর। আমার বাবা তেমন নয়—তারপর থাকলে বক্‌বে।...তাই তাই সই—তখন ভেবেছিলুম দুদিনে কি আর কিছু জুটবে না? ও হরি—শহর চষে ফেললুম—যেখানে যা আমার করার মত কাজ আছে, সব বলে রিফিউজি হ'লে পেতে, তোমার ত এদেশে বাড়ী। ।দিকে দুদিন হ'য়ে গেছে—বন্ধুকে আর উত্যক্ত না ক'রে সরে পড়লুম। শেষে বাসন-মাজার কাজেরও চেষ্টা করলুম তাও জুটল না। সবাই সন্দেহ করে ভদ্দর লোকের মত দেখতে অথচ বাসন মাজার চাকরী চাইছে, চুরিদারী ক'রে পালাবে না তার ঠিক কি!......দুটো দিন ঘুরে বেড়ালুম রাস্তায় রাস্তায়—না খেয়ে। রিফিউজি ক্যাম্পে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করলুম, তা ওদের ভাষা মুখ দিয়ে বেরোয় না—ধরে ফেলে তাড়িয়ে দিলে!......এমনি দিন কাটছে, সতীশ ব'লে এক ছোক্‌রার সঙ্গে আলাপ হ'ল—আমার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু তবু খুব ভাব জমে গেল। অজানা অচেনা—একেবারে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেল বাসায়, খেতে

দিলে, শুতে দিলে। সে যা কাজ করে তাই শেখালে, পকেট মারতে! তা তার চেয়ে আপনার লোক আর আমার আজ কে আছে বলুন! ভাবলুম সে যদি করতে পারে ত আমার আপত্তি কি? সেও এককালে ভদ্দর ঘরের ছেলে ছিল। সতে, হানিফ্—কেউ এরা লোক খারাপ নয়। দিল্ আছে। একমাস বসিয়ে খাইয়েছে—যদ্দিন না রোজগার করতে শিখেছি!'

'তোমার নাম কি? কী জাত তুমি?'

এইবার যেন প্রথম ওর চমক্ ভাঙ্গল। একটু সন্দেহের স্বরে বললে, 'কেন বলুন দিকি, এত নিকেশ নিচ্ছেন? পুলিশের লোক নাকি?···আর কিছু বলব না, সরে পড়ুন।'

'না ভাই সত্যি করে বলছি, পুলিশের লোক আমি নই, পুলিশে দিতেও চাইনা—'

'মাইরি? কালির দিব্যি?'

'কালির দিব্যি বলছি।'

তখন সে একটু আশ্বস্ত হ'ল, বললে, 'আমি বামুনের ছেলে। নবগোপাল চক্রবর্তী নাম।'

আমার কী এক খেয়াল চাপল মাথায়। ওরই পাশে বসে পড়ে বললুম, 'এ কাজের কী ফল তা ত দেখলে। এর ওপর পুলিশে দিলে না হোক্ ছমাস জেল দিত। এ পথে থাকলে মধ্যে মধ্যে ধরা পড়বেই। এসব ছেড়ে দাও।'

'তারপর, খাবো কি?'

'ধরো, যদি কোন কাজ দিই তোমাকে।'

ছেলেটা দার্শনিকের মতই হাসল। বললে, 'মজা মন্দ নয়। পথে পথে আমার বেশ বন্ধু জুটে যায়। কী কাজ দেবেন আমাকে?'

'ধরো এখন আমার বাসাতে থাক্‌বে। ফায় ফরমাশ খাটবে, তারপর ফাঁক পেলে আমার অফিসে কোন বেয়ারার কাজে টাজে ঢুকিয়ে দেব।···তা মাইনে

টাইনে মিলিয়ে ভালই পাবে। তারপর তোমার কপাল, যা পারো তোমার পথ তুমি বেছে নেবে। কতদূর লেখাপড়া জানো ?'

একটু চুপ করে থেকে যেন অন্যমনস্কভাবেই বললে, 'ক্লাস এইট্ পর্যন্ত উঠেছিলুম, কিন্তু সে ত চার বছরের কথা, সবই ভুলে গেছি। আঁক খুব ভাল কষতুম। আমার সঙ্গে কেউ পারত না।'

'চার বছর ! তোমার বয়স কত ?'

'তা আঠারো উনিশ হ'ল।' তারপর বোধ হয় আমার চোখে বিস্ময় লক্ষ্য করেই বললে, 'আমাকে দেখায় আরও ছোট, না ? আমার বাড়টা একটু কম, কিন্তু বয়স হয়েছে।'

'তা হোক, তা'হলে তাই ঠিক রইল। আমার সঙ্গে চলো—'

'এখনই ? সতীশদের বলব না ?'

'না, বললে কি আর তোমাকে তারা ছাড়বে ! থাক্—'

'কিন্তু না বলে গেলে কি ভাববে ?'

'ভাববে পুলিশের হাতে পড়েছ। এ লাইনে ত এমন হামেশাই হয়।'

হা হা করে হেসে উঠল নবগোপাল, বললে, 'তা মন্দ বলেন নি। হানিফ অম্‌নি একবার ডুব মেরেছিল, সতে বললে, নিশ্চয় শালা ধরা পড়েছে।··· চলুন—'

সহজ ভাবেই উঠে এল আমার সঙ্গে। কিন্তু হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত এসে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। প্রশ্ন করলুম, 'কী হ'ল ?'

'নিয়ে ত যাচ্ছেন, বাড়ীতে কী বলবেন ? চোর শুনলে তাঁরা বাড়ীতে ঠাঁই দেবেন ? দিলেও ভয়ে ভয়ে থাকবেন সর্বদা। কী দরকার ?'

আশ্বাস দিয়ে বললুম, 'সে ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। তুমি ভেতরে ঠিক আছ ত ?'

একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'বোধ হয়ত খাঁটিই থাকতে পারব। আসলে আমার কাজটা খুব ভাল লাগেনি কখনও। বিশেষ সুবিধেও করতে পারিনি তাই।

তিন মাসের মধ্যে কতবার যে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি তার ঠিক নেই। ...তা চলুন বরাত ঠুকে দেখা যাক্।'

নবগোপালের আশঙ্কাটা খুব অমূলক নয়। গৃহিণী প্রথমটা খুবই বিদ্রোহ করলেন, 'জেনে শুনে তুমি একটা চোর এনে বাড়ী ঢোকালে?'

গলায় জোর দিয়ে বললুম, 'না জেনে ত অনেকবার ঢুকিয়েছ, এবার না হয় জেনেই ঢোকালে। তবু সাবধানে থাকবে একটু!'

বললুম বটে কিন্তু কদিন আমারও খুব অস্বস্তিতে কাট্‌ল। ঝোঁকের মাথায় কাজটা ক'রে ফেলে একটু ভয়ে ভয়েই ছিলুম। বিশেষ ছেলেটাকে যেন চিনতে পারছিলুম না। সত্যিই কি এত সরল? না পাগল? কিংবা বদমাইস? সরলতাটাই হয়ত ভান। বোকা পেয়ে সবটা বানিয়ে বললে!

আমার দ্বিধার ভাব যেতে দেরি হ'ল বটে কিন্তু আমার গৃহিণীই সব-আগে গলে গেলেন। বাড়ীর কাজও বিস্তর। ছেলেগুলোর পড়ার খুব ক্ষতি হ'ত আগে—আমারও সকাল বেলাটা নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ থাকতো না। শ্রীমান্ নবগোপাল যেন চার চালের ভার মাথায় তুলে নিলে। বাজার করে, রেশন আনে, গম ভাঙ্গায়, ধোপার বাড়ী ছোটে, গয়লা এলে দাঁড়িয়ে দুধ দুইয়ে নেয়—উনুনে আঁচ দেয়, ভোর বেলায় উঠে চা করে। এমন কি ঝি না এলে নিজেই আমার গৃহিণীকে সরিয়ে বাসন মাজতে বসে যায়। বলে, 'আমার অভ্যেস্ আছে, আমার কাছে কতক্ষণ?'

আবার নিজেই মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে বলে, 'মামার বাড়ীর কাজ সবগুলোই যেন বসে ছিল আমার জন্যে। তবে তফাতের মধ্যে মার খাওয়াটা নেই, আর খাওয়াটা পুরো মেলে। তার চেয়েও আরাম—ছেলে বইতে হয় না।'

আমার ছেলেমেয়েরা ওর ভক্ত হয়ে পড়ল খুব। জমিয়ে গল্প বলতে পারে, ঘুড়ি তৈরী করতে অদ্বিতীয়, আর তাদের ফায়ফরমাস খাটে অম্লান বদনে, মায় জুতোগুলো পর্যন্ত বুরুশ ক'রে দেয়।

নবগোপাল মাঝে মাঝে আমাকে তাগাদা করে বটে, ‘আমার চাকরীর কী হ’ল মেশোমশাই ?’ কিন্তু খুব যে তাড়া আছে, তা মনে হয় না।

অবশেষে আমার গৃহিনী একদিন খবরটা দিলেন, ‘ওগো শুনছ, আমাদের নবর সত্যিই অঙ্কে খুব মাথা।’

‘কেন, কী করে জানলে ?’

‘আমাদের ছোট খোকার মাথায় বুদ্ধির অঙ্ক কিছুতে ঢুকত না ত, মাস্টার মশাই ত হিম-সিম খেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। নবগোপাল তিন দিনে ওকে কেমন শিখিয়ে দিলে। এখন বেশ বুঝে গেছে···আহা ওকে আবার লেখাপড়া শেখালে হয় না !’

ইচ্ছে হ’ল কথাটা মনে করিয়ে দিই, এমন বিনা মাইনের চাকরটিকে স্বেচ্ছায় হাত-ছাড়া করতে চাইছ কেন ? লেখাপড়া শিখলে কি আর এই ভাবে থাকবে ? কিন্তু নিজে নিজেই লজ্জিত হলুম—আমার স্বার্থের জন্য ওর এত বড় ক্ষতি করি কেন ? আর চিরদিনই কিছু এম্‌নি পেট-ভাতায় আমার বাড়ী থাকবে না— বয়স বাড়বে, নিজের সংসার পাতবার ইচ্ছে হবে, উন্নতির পথ খুঁজবে।

ওকে ডেকে বললুম, ‘তোমার মাসিমার ইচ্ছে তোমাকে আবার ইস্কুলে দেয়।’

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর—তবে সে নিমেষের জন্য। পরক্ষণেই ম্লানমুখে বললে, ‘এই বুড়ো বয়সে গিয়ে ক্লাস এইট-এ ঢুকব ! বাকী ছেলেরা ঠাট্টা করবে !’

আমি বললুম, ‘না না তোমাকে দেখায় ছোট—আসল বয়স না বললে বুঝতেই পারবে না। বেশ মানিয়ে যাবে—’

শেষ পর্যন্ত সে আনন্দের সঙ্গেই রাজী হ’ল। তবে আমি তখনই তাকে ইস্কুলে ভর্তি করলুম না—বললুম, ‘ক্লাস এইট-এর বই ত বাড়ীতেই আছে দুপুরে পড়ে ঝালিয়ে নাও, আমি একেবারে ক্লাস নাইনে ভর্তি ক’রে দেব !’

পড়ায় তার সত্যিই চাড় ছিল, মাস-তিনেকের মধ্যেই সে এমন তৈরী হয়ে নিলে যে অনায়াসে তাকে ক্লাস নাইনে ভর্তি ক’রে দেওয়া গেল।

জুন মাসের শেষাশেষি আমার ভগ্নিপতির চিঠি পেলুম যে ভাগ্নী অমলা আই-এ পাস করেছে, সেখানে আর পড়াবার উপায় নেই। এখন যদি আমি আমার বাড়ীতে তার থাকবার ব্যবস্থা করতে পারি তবেই তার বি-এ পড়া হয়।

সেই অমলা, এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ফুট-ফুটে ফুর্তিবাজ একরত্তি মেয়ে, সে এরই মধ্যে আই-এ পাস করে ফেললে!

কথাটা বেশ গর্বের সঙ্গে আলোচনা করলুম আমরা, রাত্রে খেতে বসে ছেলেদেরও বললুম।

নবগোপাল হঠাৎ খাওয়া বন্ধ ক'রে প্রশ্ন করলে, 'আপনার ভাগ্নীদের দেশ কোথায় বললেন?'

দেশের নাম বলতে আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে খেতে আরম্ভ করল।

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'দেশের নাম জানতে চাইলে কেন নবু?'

'না এমনি' তারপর একটু হেসে বললে, 'আমাদের পাশের বাড়ীতে এক ভাড়াটে এসেছিল দিন-কতক, তাদের একটি মেয়ে ছিল তারও নাম অমলা, প্রায় আমারই বয়সী হবে মেয়েটা—মধ্যে সে আমার কাছে আঁকও শিখেছিল কদিন—'

'তার দেশ কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'কে জানে। বলেছিল সে, ভুলে গেছি।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'কত বয়স হবে আপনার ভাগ্নীর?

ঐরকমই ওর কথাবার্তা, আদব-কায়দার ধার ধারেনা সে মোটেই! মনে মনে হিসেব করে নিয়ে বললুম, 'আঠারোর বেশী নয়।'

'দেখুন দেখি, আমার চেয়ে ছোট—বি-এ পড়বে। আর আমি—! যাক্ গে মেশোমশাই, কালই আমাদের হেড স্যার বলছিলেন বেটার লেট্ দ্যান্ নেভার, কী বলেন, তাই ভেবেই আমি খুশী! নয় কি?'

ভগ্নিপতিকে লিখে দিলুম যে পাঠিয়ে দাও। যতদিন আমি আছি ভাগ্নীর লেখাপড়া হবে না, সে কি কথা! এধারেও কলেজে য়্যাড্‌মিশনের সব ব্যবস্থা করে রাখলুম।

যে দিন আসবার কথা, তার আগের দিন এক চিঠি পেলুম দিদির অসুখ, অমলা সকালের ট্রেনে একাই রওনা হবে, আমি যেন তিনটের সময় স্টেশনে থাকি।

গেলাম যথা সময়ে, গাড়ী থেকে নেমে অমলা প্রণাম করল। দিব্যি ফুটফুটে হয়ে উঠেছে। সুন্দরী বলা চলে। আর বড়ও হ'য়ে পড়েছে ঢের। আগেকার মত আতুরেপনা নেই। বেশ একটি শান্ত সলজ্জ ভঙ্গী ওর কথাবার্তায় চাল-চলনে। মোটের ওপর খুশীই হলুম।

বাড়ীতে পৌছে প্রণামাদি সবে সারা হয়েছে এমন সময়ে নব এল ইস্কুল থেকে। সে অত লক্ষ্য করেনি, গৃহিণীই ডেকে বললেন, 'এই যে নব, আমার ভাগ্নী এসে গেছে।'

নব হাসি হাসি মুখেই এগোচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ অমলাকে দেখে যেন পাথর হ'য়ে গেল, মনে হ'ল মুখের সব রক্ত নিমেষে সরে গিয়ে কাগজের মত সাদা হয়ে উঠল।

অমলা কিন্তু প্রথমটা চিনতে পারেনি। তারপরেই ওরও এক আশ্চর্য পরিবর্তন হল। ওর সুন্দর মুখ খুশীতে ঝল্‌মলিয়ে উঠল। উজ্জ্বল গৌর বর্ণাভায় যেন কে মুঠো মুঠো আবির দিলে ছড়িয়ে। সে সাগ্রহে দু-পা এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'নবুদা তুমি?'

আমরা ত অবাক্।

আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, 'তুমি নবুকে চিনতে বুঝি অমলা?'

কিন্তু তার আগেই আরও বেশি বিস্ময়ের কারণ ঘটল, নবগোপাল অকস্মাৎ ওর হাতের বই-খাতাগুলো ছুঁড়ে তক্তপোষের ওপর ফেলে ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

'কী হ'ল, কী হ'ল—ও নবগোপাল।'

আমরা ডাকাডাকি করতে লাগলুম, ছেলেরা কেউ কেউ ছুটে গেল কিন্তু ওকে আর ধরা গেল না।

'ব্যাপার কি অমলা?' প্রশ্ন করি।

'কিছুই ত বুঝতে পারছিনা ছোট মামা। বছর চার পাঁচ আগে একবার গরমের ছুটিতে কাকার বাসায় আসি, তখন কাকা বদলি হননি, কলকাতাতেই থাকতেন—দর্জিপাড়ায়। তার পাশেই ছিল ওর মামার বাড়ী। দু বাড়ীতে খুব আসা যাওয়া চলত, নবুদাও আসত। সেই সময়—মানে নবুদা খুব ভাল অঙ্ক বোঝাতে পারত, আমাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিত। ওর মামার বাড়ীতে তখন ওকে বড় পীড়ন করত—সেই জন্যে কাকীমা ফাঁকে পেলেই কিছু না কিছু খাইয়ে দিতেন। কিন্তু ওর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল বড় বেশি—খেতে চাইত না সহজে। তারপর একদিন আমি কী কথায় বলে ফেলেছিলুম ডালমুট খাবার কথা, নবুদা বুঝি বাজারের পয়সা থেকে লুকিয়ে আমার জন্যে ডালমুট এনেছিল—সরল মানুষ কিনা, ধরা পড়ে গিয়ে কী মার খেলে! ওর মামা আমাকেও শুনিয়ে শুনিয়ে কতকগুলো বিশ্রী কথা বললে। সেই থেকে আসা বন্ধ হ'ল আমাদের বাড়ী।···তারপর যখন বাড়ী ফিরি—'

এই পর্যন্ত বলে অমলা থেমে গেল! কিন্তু আমার গল্প-লেখকের মন ততক্ষণ গল্পের আভাসে জমে উঠেছে, বললুম, 'যখন বাড়ী ফেরো তখন কী?'

আরও লাল হ'য়ে উঠে অমলা বললে, 'তখন ওকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলুম, লুকিয়ে ষ্টেশনে গিয়েছিল দেখা করতে। বলেছিলুম চিঠি দিও, তা বেচারী করুণ মুখে বলেছিল, খাম পোষ্টকার্ড কেনবার পয়সা কোথায় পাবো ভাই, তাছাড়া তোমার চিঠি যদি মামার হাতে পড়ে—তোমাকে আবার খারাপ কিছু বলে! থাকগে!···তারপর আর কোন খবর পাইনি। ম্যাট্রিক পাস করার পর ওর মামার ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়েছিলুম আন্দাজে আন্দাজে—তারও জবাব পাইনি!'

বললুম, ‘সে চিঠি নিশ্চয় ওর হাতে পৌঁছয়নি। তাই ত, ছোকরা গেল কোথায় !’

অমলা বললে, ‘কিন্তু আমাকে দেখে অমন করে পালাল কেন ছোট মামা ?’

সংক্ষেপে সব বললুম। অমলার মুখ বেদনায় ম্লান হ’য়ে উঠল, শুধু বললে, ‘আহা বেচারী !’

সেদিন আর নবগোপাল ফিরল না। পরের দিনও না। আর কোনদিনই না। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলুম, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম, কোন খবরই পাওয়া পাওয়া গেল না। হঠাৎ এসেছিল, হঠাৎই আবার চলে গেল।

অমলা এই কদিনে যেন আধখানা হ’য়ে গেছে। আরও তার পীড়াপীড়িতেই বেশি খোঁজ করতে হ’ল। সে কেবলই বলে, ‘আমার জন্যই এই কাণ্ডটি হ’ল, —হায় হায়, কেন আমি এলুম, হয়ত ওর জীবনটাই নষ্ট হ’য়ে গেল !’

অনেকদিন পরে জ্বরভাব হওয়ায় আমি বিছানায় শুয়ে আছি, অমলা এসে কাছে বসল।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পায়ে হাত বুলোবার পর সহসা প্রশ্ন করলে, ‘আচ্ছা আমাকেই ওর এত লজ্জা ক’রল কেন মামা ?’

একটু চুপ ক’রে থেকে বললুম, ‘তোমার মনকেই জিজ্ঞাসা কর মা, জবাব পাবে। আয়নাতে আজকালের মধ্যে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ ?’

ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে ওর মুখের চেহারাটা ঠিক ঠাওর হ’ল না—শুধু একটু পরে দু-ফোঁটা গরম জল আমার পায়ের উপর পড়ায় বুঝলুম উত্তরটা ও বুঝেছে।

# চিরন্তন

প্রায় একশ বছর আগেকার কথা বলতে বসেছি। আপনারা, যাঁরা এ গল্প শুনতে চান, বর্তমান পরিবেশ থেকে মন ফিরিয়ে নিয়ে যান ইতিহাসের পাতার মধ্যে। সেই একশ বছর আগেকার ভারতকে কল্পনা করার চেষ্টা করুন।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে সারা ভারতে। সে আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ ব্যারাকপুরে দেখা গেলেও বাংলা মোটামুটি শান্তই ছিল। প্রকৃত বিদ্রোহ শুরু হ'ল মীরাট থেকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদী সিপাহীদের মুক্ত ক'রে ইংরেজদের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ক'রে এগিয়ে এল দিল্লীর দিকে। তারপর সেখানে লালকেল্লা দখল ক'রে বৃদ্ধ এবং প্রায়-অন্ধ বাহাদুর শাকে তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা বলে ঘোষণা করতে দেরি হ'ল না। কারণ ইংরেজ কোম্পানীর জোর দিল্লী দুর্গে ছিল না, ছিল মীরাটেই। জেনারেল হিউয়েট দুহাজার শ্বেতাঙ্গ ফৌজ নিয়ে মীরাটে বসেছিলেন, তিনিই যখন কিছু করতে পারলেন না, দিল্লীর মুষ্টিমেয় ইংরেজ কি করবে? এই দিল্লী দখল করারই যেন অপেক্ষা করছিল ভারতের বাকী সিপাহীরা। এক সঙ্গে সর্বত্র আগুন জ্বলে উঠল—কানপুর, আগ্রা, বেরিলি, এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ এমন কি রাজপুতানারাও কোন কোন স্থানে। যদিচ সেখানে বেশি কিছু হয়নি, কারণ দেশীয় রাজারা সেদিন ইংরাজদেরই সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা যে বহু দিন পরে ইংরেজদের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের স্বাদ পেয়েছেন!

আরায় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন জগদীশপুরের কুন্‌ওয়ার সিংহ—বিদ্রোহের প্রধান চক্রী। কিন্তু তিনি অতি সহজেই পাটনা ডিভিসনের কমিশ্যনর টেলারের কাছে হেরে গেলেন! কাশীর বিদ্রোহ দমন করলেন কর্ণেল নীল। এলাহাবাদ দুর্গ তখনও ক্যাপ্টেন ব্রেজার মুষ্টিমেয় শিখ সৈন্য নিয়ে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রেখেছেন—বিদ্রোহীদের হাতে পড়তে দেননি। নীল কাশী দখল করেই

আগে এগিয়ে গেলেন এলাহাবাদে, কারণ ব্রেজারকে উদ্ধার না ক'রে অন্য কোন কাজে মন দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু তারপর আর তিনি ইংরেজ বা শিখ সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না—তারা অন্য সমস্ত কর্তব্য ভুলে প্রতি-শোধের নেশায় মেতে উঠল। নীল গবর্ণর জেনারেলের নামে কাশী এলাহাবাদ অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করলেন, আর সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোরা আশ মিটিয়ে সদ্য প্রতিহিংসার লাল সুরা পান করতে লাগল। বিদ্রোহী, সাহায্যকারী, সন্দেহভাজনরা ত বটেই—এমন কি বলিষ্ঠ তরুণ ছেলেরা শুধু মাত্র তরুণ ও বলিষ্ঠ এই অপরাধেই নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হ'ল! হত্যার কত রকম উপায় যে নিত্য উদ্ভাবিত হ'তে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। অসামরিক ইংরেজেরা পর্যন্ত ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের সঙ্গে মিলে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঘাতকের কাজ করতে লাগল। রক্ত-পানের মহোৎসব শুরু হয়ে গেল চারিদিকে।

কানপুরে কিন্তু অত সহজে মেটেনি। এই বিদ্রোহের মূল নায়করাই সেখানে ছিলেন—নানা সাহেব ও তাঁতিয়া টোপী। ওখানকার ইংরেজরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিলেন না, সামরিক ও অসামরিক মিলিয়ে শ-চারেক পুরুষ, এবং শ-দুই স্ত্রীলোক ও শিশু। এঁরা সকলেই কোন মতে একটা ঘাঁটি-মত ক'রে তাতে আশ্রয় নিলেন ও প্রাণপণে সিপাহীদের অবরোধ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু একে ত এই ক'টি লোক, তার ওপর ওঁদের সেনাপতি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ হুইলার। সুতরাং প্রাণপণেরও একটা সীমা আছে। অবশেষে আত্মসমর্পণ করতেই হ'ল। তাই ব'লে খুব সহজে করেন নি, বিনাসর্তেও না—কারণ এই ক'টি লোককে নিয়েই সিপাহীরা জেরবার হয়ে পড়েছিল। কথা হ'ল পুরুষরা নিরাপদে নৌকো ক'রে এলাহাবাদে চলে যেতে পারবেন ও মহিলারা একটি প্রাসাদে আশ্রয় পাবেন, সিপাহীরাই তাঁদের আপাতত দেখাশুনা করবে—স্ত্রীলোক ও শিশুর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

**কিন্তু মানুষ ভাবে এক, দৈব করায় আর এক।**

এলাহাবাদ ও কাশীতে নিষ্ঠুর বৈরনির্যাতনের সংবাদ এসে পৌচেছে তখন। প্রতিদিনই প্রতিশোধের নামে সেই ভয়াবহ পৈশাচিকতার অসংখ্য বিবরণ—হয়ত বা কিছু অতিরঞ্জিত হয়েই—কানে আসছে। এক্ষেত্রে এতগুলি ইংরেজের প্রাত কর্তৃপক্ষের এই সদয় ও ভদ্র আচরণ অধিকাংশ সিপাহীই সমর্থন করতে পারলে না। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 'হাতের মধ্য থেকে এই পিশাচগুলো বেরিয়ে যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখব?' এই মনোভাব অধিকাংশরই। কর্তারা ইচ্ছা থাকলেও তাদের দমন করতে পারলেন না—কারণ তাতে কর্তৃত্বই চলে যাবার সম্ভাবনা। ফলে যখন সকলে নৌকোয় চড়েছে তখন কূল থেকে গুলি-বর্ষণ শুরু হ'ল—খুব অল্প (বোধ হয় চার পাঁচ জনের বেশি হবে না) সংখ্যক ইংরেজই শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে এলাহাবাদে পৌছতে পারল।

আর মহিলারা?

যে প্রাসাদে তাঁদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল, যা পরে বিবিগড় প্রাসাদ বলে খ্যাত হয়েছে ইতিহাসে, একদা সেই খানেই তাদের হত্যা করে একটা কুয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া হ'ল। প্রকাণ্ড কুয়া মৃতদেহে ভ'রে উঠল, তবু হত্যা পিপাসা মিটল না।

সেদিন দু-একটি মহিলাও সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। ইতিহাসে সে হিসেব নেই কোথাও।...

এই পর্যন্ত গেল ঐতিহাসিক বিবরণ। ইতিহাস যেখানে পৌছয়নি সেইখানে আমাদের গল্প।

সুদূর বাংলা দেশের হুগলী জেলার এক গ্রাম থেকে গিয়েছিল মিহির মুখুজ্জে—বাড়ী-থেকে ঝগড়া ক'রে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছিল উনিশ বছর বয়সে; হাঁটা-পথেই পশ্চিম যাত্রা করে, পথে রবাহুত এক বিবাহ-বাড়ী অতিথি হয়ে

ছানাবড়া ও মোণ্ডা খাওয়ার প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাস্ত করে গৃহ-কর্তার চোখে পড়ে যায়। তারপর তাঁরই নৌকোয় স্থান পেয়ে একদা পশ্চিমে পৌছোয় এবং ঘুরতে ঘুরতে কানপুরে আশ্রয় পায়।

আর সুদূর ইংল্যাণ্ডের সারে অঞ্চল থেকে এসেছিল এড্‌ওয়ার্ড রলিনসন। সে-ও বাড়ী থেকে ঝগড়া ক'রে বেরিয়ে পড়েছিল একদা ভাগ্যান্বেষণে। তখন ইংরেজরা এ-রকম বেরিয়ে পড়েই আগে চেষ্টা করত গাড়ীভাড়া জোগাড় করে ভারতবর্ষে আসতে, নয়ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডন অফিসেই চাকুরি দেখত। রলিনসনেরও সেদিন চাকুরির অভাব হয়নি। তারপর—'একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে'! পঁচিশ বছরের ইংরেজ যুবকের সঙ্গে পঁচিশ বছরের বাঙালী যুবকের প্রগাঢ় সখ্য হয়ে গেল।

হুইলারের নেতৃত্বে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ যখন পাঁচিল ও কাঁটাতারের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করলে তখন এই নেড্‌ রলিনসনের জন্যই মিহির নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখ'তে পারেনি। ও যদিচ কোম্পানীরই চাকরী করত তবু ভারতবাসী বলে সিপাহীদের হাতে সহজেই ছাড়া পেয়েছিল! ইচ্ছা করলে এ সব গোলমাল থেকে একেবারে অব্যাহতি পেতে পারত বাংলা দেশে যাত্রা করে—কিন্তু মিহির মুখুজ্জে তা না করে নিজে স্বেচ্ছায় সিপাহীদের দলে যোগ দিলে এবং নানা সাহেবকে জানালে যে সে জান কবুল ক'রে ইংরেজ শিবিরের কার্য-কলাপের খবর এনে দেবে।

সন্দিগ্ধ নানা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কেমন ক'রে?'

'ওখানে আমার এক বন্ধু আছে মহামান্য পেশোয়া। ইংরেজ শিবিরে যাতায়াতে আমার কোন ভয় নেই।'

'তুমি যে ঠিক খবর আনবে তার প্রমাণ কি?'

'একদিন না একদিন ত প্রমাণ হবেই।' তখন আমার জান নেবেন।'

'যদি তুমি ওখানেই থেকে যাও?'

'নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে? আমি কি এত আহাম্মক মহান্ পেশোয়া?'

তবু সন্দেহ যায় না পেশোয়ার।

'কী ছুতোয় যাবে ?'

'ওরা শুনছি খেতে পাচ্ছেনা। বন্ধুর জন্য সামান্য কিছু খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। আমি যেন আপনাদের গোপন করেই যাবো।—কোন মতে সকলের চোখ এড়িয়ে গেছি, এই সবাই জানবে। শুধু সেই হুকুমটা দিয়ে দিন।'

তাঁতিয়া টোপী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। নানা সাহেব নিজে অত ঘোর-প্যাঁচের লোক নন—তিনি সুবেদার যশোবন্ত রাওকে ডেকে আদেশ দিলেন, 'এই বাঙ্গালীকে যদি ইংরেজদের রেড়ার ধারে যেতে দ্যাখো ত ধর-পাকড় করার দরকার নেই। তার মানে দেখেও দেখবেনা ওকে।'

মিহির আবারও ওঁকে প্রণাম করে বললে, 'একটা সিপাহীর পোষাক চাই হুজুর।'

ভ্রূকুঞ্চিত নানা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কেন ?'

'নইলে সিপাহীদের অবরোধ ভেদ করে যাবো অথচ কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, সন্দেহ করবে না—একথা ওদের বোঝাব কেমন ক'রে ? এ ধুতি বেনিয়ান চলবেনা হুজুর !'

'তা বটে। একে একটা পোশাক আর বন্দুক দিয়ে দাও। কিন্তু তোমার এত গরজ কেন বাঙালী ছোক্‌রা ?'

'স্বাধীনতা পেলে কি শুধু মারাঠীই পাবে—বাঙালী পাবে না ?'

'ঠিক আছে। তুমি যাও এখন।'

কিন্তু মিহিরের প্রাণ যদিবা সিপাহীদের হাত থেকে বাঁচল, ইংরেজদের হাতেই যায় যায় হ'ল। ওকে এরা সন্দেহ করবে না—এ তথ্যটা ত ঢাক পিটে যাওয়া যায় না। মিহির সিপাহীদের চোখে ধূলো দিয়ে যাচ্ছে এইটে বোঝাবার জন্যই ওকে অনেক কাণ্ড ক'রে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে যেতে হ'ল—নিঃশব্দে চোরের

মত। ফল হ'ল এই যে ইংরেজের গুলি ছুটল ওর কাঁধের পাশ দিয়ে—এক চুলের জন্য কাঁধটা বাঁচল—যে ইংরেজকে ও তখনও দেখে নি কিন্তু সে দেখেছে। মিহির এর জন্য প্রস্তুতই ছিল। পকেট থেকে একটা সাদা পতাকা বার ক'রে নাড়তে লাগল। তখন বেড়ার ধারে এগিয়ে এল দুজন পাহারাদার।

মিহির স্পষ্ট ইংরেজীতে বললে, 'ফ্রেণ্ড!'

'প্রমাণ?'

'তোমাদের এডওয়ার্ড রলিনসনকে ডাকো। সে চেনে।'

রলিনসন এসে একেবার ওকে জড়িয়ে ধরলে, 'মাই ডিয়ার মিহির! বাট হাউ—এলে কেমন ক'রে?'

'সে অনেক কষ্টে—সিপাইদের চোখে ধুলো দিয়ে। এই গ্যাখো তোমার জন্যে কি এনেছি—'

জামার নিচে পিঠের সঙ্গে বাঁধা খানিকটা কাঁচা মাংস বার করলে, আর বুকের দিকে বাঁধা খানিকটা আটা—। যে সব অন্য ইংরেজরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাদের চোখগুলো ক্ষুধার্ত বাঘের মতই জ্বলে উঠল। কতদিন টাটকা মাংস জোটেনি! রলিনসন ত মিহিরকে জড়িয়ে ধরে চুমুই খেলে গোটা কতক। বললে, 'মেপে খাবার খাচ্ছি কদিন, ক্ষিদে পেলেই জল—এই চলছে। আজ তোমার দয়ায় অন্তত পাঁচ সাত জন লোক খেতে পাবে।'

মিহির বললে, 'নেড্ একটু আড়ালে চলো—গোটা কতক কথা আছে।'

নিভৃতে গিয়ে সে কি ভাবে এবং কি সর্তে এসেছে সব খুলে বললে, তার পর বললে, 'তোমাদের অনিষ্ট না হয় এমন কয়েকটা খবর দাও, গিয়ে দিতে হবে। তা হ'লে ভবিষ্যতে সহজে আসতে পারব—চাই কি, বেশি করেই কিছু আনতে পারব।'

নেড ভেবে চিন্তে দু একটা খবর দিয়ে দিলে। কিন্তু বললে, 'মুখার্জি, অকারণ একটা ঝুঁকি নিওনা। দুদিক থেকেই তোমার ভয় আছে।'

'তা থাক্। মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতেই আমার ভাল লাগছে। তা ছাড়া তুমি এখানে উপোষ করবে আর আমি—। না, তা হয় না নেড।'

এডওয়ার্ডের চোখ ছল ছল করতে লাগল।

ফেরবার পথেও বার-দুই গুলির ঝাঁক চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে, যারা জানে না—উভয় পক্ষেই এমন লোকের সংখ্যা ত কম নয়। তবু মিহির শীষ দিতে দিতেই ফিরল!

নানা সাহেবের সামনে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে তিনি বললেন, 'তারপর?'

মিহির সংগ্রহ করা খবরগুলি দিলে একে একে। নানা সাহেব খুশি হলেন। তার কারণ, কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর বিশ্বস্ত গুপ্তচর এসে যে খবরগুলি দিয়েছে তার সঙ্গে এর দুটো খবরের মিল ছিল।

নানা সাহেব ওকে পুরস্কার দিতে গেলেন, মিহির নিলে না। বললে, 'যেদিন আপনি দিল্লীর তক্তে বসবেন সেদিন এটা নেব। আজ থাক পেশোয়া।'

আরও খুশী হয়ে নানা সাহেব একটা তামার ছোট আংটি ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'এইটে হাতে দিয়ে থেকো—অন্তত সিপাইদের হাতে তোমার আর কোন ভয় থাকবে না।'

ওঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে এল মিহির। নানা সাহেব না হোক্—ভারতবাসী আবার দিল্লীর তক্তে বসুক, এ ইচ্ছা ওরও। কিন্তু বন্ধুকে বাঁচাতে হবে, যেমন ক'রে হোক। বিশ্বাসঘাতকতা? মিহির মনকে বোঝালে যে সে ত কিছু কিছু খবরও এনে দিচ্ছে। তাতেই ওর অপরাধ কেটে যাবে।

এমনি ক'রে চলল কয়েক দিন। মিহির বহু খাদ্য নিয়ে গিয়ে ক্ষুধার্ত উপবাসী ইংরেজদের দিলে—কিন্তু সে ত ওর বন্ধুরই জন্য। তা ছাড়া এমন ক'রে মানুষ মারার সে সমর্থন করতে পারবে না কোন দিনই—

অবশেষে খবর এল—এরা ছাড়া পাবে, নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে এলাহাবাদ।

মিহিরই প্রথম সে খবর এনে দিলে ইংরেজ শিবিরে। দুঃখের মধ্যেও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবাইকার মুখ।

রলিনসন মিহিরকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে, 'ভাই মিহির—অনেক উপকার করেছ, তোমার ঋণের শোধ নেই। তবু আমি জানি যা করেছ তা আমাকে ভালবাস বলেই করতে পেরেছ। সেই দাবীতে আর একটি অনুরোধ করব।'

'কী বলো!'

'বিবিগড়ে যে বিবিরা আছেন তার মধ্যে আছে ক্লারা ডবসন বলে একটি মেয়ে। পাদ্রীর মেয়ে, আঠারো উনিশ বছর বয়স। অপরূপ সুন্দরী—অন্তত আমার চোখে। তোমারও ভুল হবার কোন আশঙ্কাই নেই, সে মেয়ে হাজারে একটা দেখা যায়। কথা ছিল তাকে বিয়ে করব—চাকরীতে একটু উন্নতি হ'লেই। আমি ত চললুম, সত্যিই নিরাপদে পৌছব কি না জানি না—সে যাই হোক—ওকে তুমি একটু দেখো। যদি সবাইকে ছেড়ে দেয়, কিংবা ওকে অন্তত তুমি মুক্ত করতে পার ত, এলাহাবাদে নিয়ে যেও কোন রকম করে। সেখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আর যদি না বাঁচি—তোমার বোন ব'লে মনে ক'রো—নিরাপদে কোন ইংরেজ আশ্রয়ে পৌছে দিও।'

রলিনসনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল—লজ্জিত হয়ে রুমালে মুছে নিলে তাড়াতাড়ি। মিহিরের চোখও শুষ্ক রইল না। সে বললে, 'প্রাণ দিয়েও যদি তার কোন উপকার করতে পারি ত করব ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

মনে তার একটু সন্দেহ ছিলই। সে দুবেলাই শুনছিল, এলাহাবাদ ও কাশীর খবর। সে-সংবাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। মিহির বিষণ্ণ চিত্তেই বিদায় নিল বন্ধুর কাছে।

তাই—সেই আশঙ্কাই যখন শেষ অবধি সত্য হ'ল তখন আর চুপ করে থাকতে পারলে না সে। নানা সাহেবের কাছে গিয়ে বললে, 'হুজুর এবার আর একটি ভিক্ষা।'

'কী বলো।'

মনটা ভাল ছিল না নানাসাহেবের। সেদিনের হত্যাকাণ্ডে নিজেকে তিনি যেন অপরাধী ভাবছিলেন।

'বিবিগড়ের পাহারাদারদের মধ্যে আমার নামটাও লিখিয়ে দিন।'

'কেন?'

'নানা কথা কানে আসছে। মেমসাহেবের সাদা চামড়ায় ভুলে কেউ কেউ নাকি চেষ্টা করছে ওদের ছেড়ে দেবার—'

'তাই নাকি? আচ্ছা তুমি থাকো গে। আমি জমাদারকে বলে দিচ্ছি—'

ওখানে থেকেও অবশ্য কোন সুবিধা হ'ল না। কারণ চারিদিকে লোক শুধু দূর থেকে ক্লারাকে দেখে চিনে রাখলে মিহির—এই পর্যন্ত। প্রাণপণে নিজের মাথাকে খাটাতে লাগল—কোন উপায় কোথাও থেকে পাওয়া যায় কিনা, এরই চিন্তায়। কিন্তু তার আর সময়ও ছিল না। হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে গেল মৃত্যুর তাণ্ডব। মিহির ছুটে গেল নানাসাহেবের কাছে, তিনি দেখা করলেন না। তাঁতিয়া টোপী নেই। সেই সুযোগই নিয়েছিল সিপাহীরা।

একেবারে মরীয়া হয়ে উঠলে অনেক সময়ে মানুষ সামনে পথ দেখতে পায়—যে পথ অন্য সময় কিছুতেই চোখে পড়ে না। ওদিকে কোন উপায় না পেয়ে সহজ পথটাই বেছে নিলে মিহির। জীবন-মৃত্যুর খেলা—ইতস্তত করার অবসর নেই। খোলা তলোয়ার হাতে করেই ছুটে এসে ঢুকল বিবিগড় প্রাসাদে। হত্যা না করুক, হত্যার অভিনয় করতে দোষ কি? কালান্তক যমের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল সে এঘর থেকে ওঘরে। চারিদিকে রক্তের বন্যা। রক্ত আর হাহাকার। হাত নিসপিস করছিল ওর—এই সব নারীহত্যাকারীদের বুকে নিজের তলোয়ার খানা বসিয়ে দেবার জন্যে। না হয় মরবেই শেষ পর্যন্ত, জীবনের পরোয়া সে করে না! কিন্তু কাজ যে বাকি এখনও—

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল ক্লারাকে। একটা জায়গায় নিভৃতে হাঁটু গেড়ে বসে বোধ করি বা ঈশ্বরকেই ডাকছে, ওকে সেই অবস্থায় এসে পড়তে দেখে

একটা চীৎকার করে উঠল ক্লারা, কিন্তু আওয়াজও শেষ পর্যন্ত বেরোল না। কেমন একটা অস্ফুট আর্ত চাপা শব্দ উঠল মাত্র। মিহির কাছে এসে বলল, 'কোয়ায়েট ক্লারা, য়্যাম ইওর ফ্রেণ্ড।'

ক্লারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। কিন্তু তখন আর বেশী কথার সময়ও নেই। রলিনসনের যাবার আগে দিয়ে যাওয়া এক টুকরো চিঠি জুতোর মধ্য থেকে বার ক'রে ক্লারার হাতে দিলে। তাতে ইংরেজীতে লেখা—'ক্লারা এ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। একে বিশ্বাস করো।' তবু ক্লারার সংশয় যায় না। অন্য কোন বন্ধুর হাতে নেড্ দিয়েছিল হয়ত এ চিঠি—তাকে মেরে এই নেটিভ সিপাই পেয়েছে ওটা। হয়ত আরও বেশি রকমের কোন শয়তানী মতলব আছে।

ওর চোখে সেই সংশয় আর অবিশ্বাস পড়ে মিহির ম্লান হাসল। বলল, 'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আর তোমার কি ভয় ক্লারা! কিন্তু তুমি কি আমার নাম শোননি—আমি মিহির।'

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলে ক্লারা। শুনেছে বৈকি—বহুবার শুনেছে। কম্পিত-কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু নেড্—নেড্ কি বেঁচে আছে? এ চিঠি কবেকার?'

'এ চিঠি যাবার আগে দেওয়া। তবে নেড্ বোধহয় বেঁচে আছে।' মিছে করেই বলে মিহির।

'তবে যে শুনছি কেউ বাঁচেনি।'

'কে বলল? দশ বারো জন অন্তত পালিয়েছে। হয়ত কিছু বেশিই হবে। নেড্ লাকি; নিশ্চয়ই বেঁচেছে। কিন্তু ঐ ওরা এদিকে আসছে—আর যে সময় নেই।'

হু হু করে কেঁদে উঠল ক্লারা, 'কী হবে আমার বেঁচে মিহির? মা বোন সব গেল! হয়ত বাবাও—'

'কিন্তু নেড্। নেডের কথা ভাবো। হয়ত সে তোমার জন্যই প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছে—'

মন্ত্রের মত কাজ করল কথাটা। নিমেষে শান্ত হয়ে ক্লারা প্রশ্ন করলে, 'বেশ, বলো কী করতে হবে।'

'মৃত্যুর অভিনয় করতে হবে। একমাত্র মরেই তুমি মৃত্যুর হাত এড়াতে পারবে আজ।'

ততক্ষণে পাশের ঘরে একটা উন্মত্ত কোলাহল উঠেছে। আর এক মুহূর্তও অবসর নেই। হিড় হিড় করে ক্লারার একটা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল মিহির। যতদূর সাধ্য মুখে পৈশাচিক শোণিত-তৃষা ফুটিয়ে তুলল

'আরে এ বাংগালী ভাইয়া! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ শিকার?

'চুপ। এ আমার শিকার। আমি মারব।' দাঁতে দাঁত চেপে বলে ক্লারাকে, 'তুমি কাঁদো, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করো! অভিনয়টা পুরো হওয়া চাই!'

ওর তলোয়ার আগেই কোন মৃতা ইংরেজ রমণীর রক্তে রাঙিয়ে নিয়েছিল—এখন চলতে চলতেই একটা কাটা গলা থেকে তাজা রক্ত মাখিয়ে নিলে, তারপর সেই বিরাট কুয়াটার কাছে যেতে যেতে তেমনিই চাপা গলায় বললে, 'তুমি শুধু রাতটা পর্যন্ত বেঁচে থাকবার চেষ্টা ক'রো। তোমাকে ওখানেই ফেলব—তবে অনেক দেহ জমে উঠেছে, লাগবেনা। ওপরেও দুচারটে পড়বে। তুমি নিচে পৌছে এক কোণে সরে যেও—আর নিঃশ্বাস না আটকায় সেইটে দেখো। আমি রাত্রে আসব।'

শিউরে উঠে ক্লারা বললে, 'ঐ অতগুলো শবের মধ্যে আমি গভীর রাত পর্যন্ত পড়ে থাকব! আর ও আমারই-আত্মীয়া' বান্ধবীর শব। সে আমি পারবো না!'

'উপায় নেই ক্লারা, দেখছ না পিশাচেরা ক্ষেপেছে। দেখছ না নরকের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। বাঁচতে গেলে মরতেই হবে এখন। প্রাণপণে শুধু তুমি নেডের নাম স্মরণ করো—তার কথা ভাবো।'

আরও কারা কাছে আসছে। কথা কইবার আর সময় নেই। সেই তলোয়ারের রক্ত তুলে ওর জামায় মাখিয়ে দিয়ে, ভান করলে ওর বুকে তলোয়ার

বসাবার, তারপর যতটা সম্ভব সন্তর্পণে ওকে ফেলে-দেবার মত করেই নামিয়ে দিলে।

'ঈশ্বর জানেন নেড—এছাড়া উপায় নেই!' অস্ফুট কণ্ঠে বললে মিহির।

গভীর রাত্রে স্তব্ধ হয়ে এল নররক্ত-পিপাসুদের বীভৎস হুঙ্কার। বিবিগড় প্রাসাদ থম্ থম্ করছে। সিপাহীরা ক্লান্ত হয়ে শহরে গেছে মদ খেতে। আর পাহারা দেবার প্রয়োজন নেই! স্বয়ং মৃত্যুর জিম্মা ক'রে দেওয়া হয়েছে বন্দিনীদের।

তারই মধ্যে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চরণে, ছায়ার মত অন্ধকারে গা মিলিয়ে এগিয়ে এল মিহির।

ভয়?

হ্যাঁ—তারও ভয় আছে বৈ কি! ভয় আর ঘৃণা। ক্ষোভ আর দুঃখে তার আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে এসেছে। তার ওপর সারা দিনের উপবাস। তবু এখানে আসবার আগে সে জোর করেই একটু জল খেয়ে এসেছে। গুড় আর জল; নইলে গায়ে জোর পাবে কেন?

আলো নেই, জ্বালাও যাবে না। কেউ নেই হয়ত কাছে, কিন্তু যদিই কেউ আলো দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে কৌতূহলী হয়ে! এক গাছা দড়ি এনেছে, দড়িটা কুয়ার পাথরে লাগানো একটা লোহার কড়ার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে, সেই দড়ি ধরে নামবে।

শৃগালের দল এরই মধ্যে জমায়েৎ হয়েছে! তবে তাদের খাদ্য চতুর্দিকে—কুয়ার কাছে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ওর পায়ের আওয়াজে দুচারটে ছুটে পালাল, ওরাই যা জীবিত আছে এখানে।

আস্তে আস্তে নেমে গেল মিহির। ভয় হচ্ছে যদি বহু মৃতদেহ চাপা পড়ে থাকে ক্লারা, কেমন ক'রে বার করবে তাকে? এতগুলো শব সরাবে কোথায়? তা ছাড়া—যদি তার দম বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে? মিহিরের যেন কান্না পেতে লাগল, কি দরকার ছিল তার এত ঝুঁকি ঘাড়ে নেবার?

একটু যেতেই পা লাগল—হিম শীতল মৃতদেহ এবং চট্‌চটে রক্তে অর্থাৎ ক্লারাকে ফেলবার পর বহু দেহ পড়েছে আরও। যা ভয় করছিল তাই। হে ঈশ্বর, সে এখন কী করবে!

কিন্তু ঐ কী একটা আওয়াজ হ'ল না? মুহূর্তে যেন হিম হয়ে এল বুকটা। না—জীবিত প্রাণীরই শব্দ। ঐ যে, কে একটা অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, 'মাই গড!'

'ক্লারা! ক্লারা! কোথায় তুমি!'

'এসেছ মিহির। এসেছ! ও, আর যে পারি না।' প্রায় চীৎকার করে কেঁদে উঠল ক্লারা। এতক্ষণের সমস্ত অমানুষিক দুঃখ যেন বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইল সেই কান্নার সঙ্গে।

'চুপ! চুপ! চুপ করো ক্লারা লক্ষ্মীটি! এত দুঃখ বহনের যন্ত্রণা এক মুহূর্তের ভুলে ব্যর্থ ক'রে দিও না!'

হাৎড়ে হাৎড়ে একসময় হাতে ঠেকে উষ্ণ জীবন্ত একটি হাত। ছেলেমানুষের মতই টেনে বুকের মধ্যে এনে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়, 'আর একটুখানি ধৈর্য ধরো ক্লারা, লক্ষ্মী বোন্‌টি!'

রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে এক রকম জোর করেই রুমালটা ওর মুখে গুঁজে দেয়। তারপর ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে অতিকষ্টে দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। ওঠা সামান্যই—কিন্তু এক হাতে অত বোঝা নিয়ে কি ওঠা যায়? কোনমতে একটু একটু করে এগোয় সে।

ওপরে এনে ওকে দাঁড় করিয়ে দিতেই ক্লারা টলে পড়ে গেল।

'ক্লারা! দাঁড়াতে পারবে না বোন?'

মুখের রুমালটা কোন মতে সরিয়ে ক্লারা বললে, 'অসম্ভব, আমার হাতে পায়ে কোন জোর সেই। আর চেষ্টা ক'রেও কোন লাভ নেই, আমি বোধ হয় শিগ্‌গিরই পাগল হয়ে যাবো। তুমি একমাত্র দয়া আমায় করতে পারো মিহির—

যদি ঐ তোমার কোমরের ছুরিটা আমার বুকে বসিয়ে দাও। আত্মহত্যাও করতে পারতুম—কিন্তু কোন অস্ত্র ছিল না হাতের কাছে—'

'চুপ! চুপ! অধৈর্য হয়ো না। নেডের খবর পেয়েছি, সে বেঁচে আছে। তার কথা ভাবো!' মিছে করেই বলে মিহির।

ক্লারা কি একটু আশ্বাস পায় সে নামে? অন্তত শান্ত হয় অনেকটা। মিহির বললে, 'আমার গায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবে?'

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে ক্লারা বললে, না, 'সমস্ত পা কাঁপছে, কোন জোর নেই। আমার জন্যে তোমার জীবন বিপন্ন করো না মিহির, তুমি যাও—'

নিমেষে ওকে পিঠে তুলে নিলে মিহির বস্তার মত। হাত দুটো সামনে এনে নিজের দুহাতে চেপে ধরে হেঁটে চলল। ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছিল, নইলে দীর্ঘাঙ্গী ক্লারার পা মাটিতে ঘষে যায়।

ব্যাকুল হয়ে ক্লারা বলতে লাগল, 'পারবে না, পারবে না মিহির! এ অবস্থায় কখনও পথ হাঁটতে পারো? আমাকে ছাড়ো, নয়ত পথের ধারে কোনও ঝোপে ফেলে রেখে যাও—। আমি কথা দিচ্ছি বাঁচবার চেষ্টা করব। ও ডিয়ার বয়!'

কথার উত্তর দেবার সময় নেই। যে কোন সময় যে কোন লোকের সামনে পড়তে পারে। তাহলে দুজনের কারুর রক্ষা থাকবে না। ঘন আমবাগানের মধ্য দিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে মিহির এগিয়ে চলল। ঘামে তার সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে, এই অনভ্যস্ত পরিশ্রমে বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে—তবু যেতেই হবে।

এ কী বিড়ম্বনা ওর! অষ্টাদশী তরুণীর দেহলতা ওর দেহের সঙ্গে প্রায় জড়িয়ে আছে, তার ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগছে ওর গালে, সোনালী চিকন চুল গেছে ওর মুখের ঘামে জড়িয়ে—তার নরম গাল ওর গলার এক পাশে লেগে—এক যুবকের জীবনে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা কি ঘটতে পারে? কিন্তু সেটা ভাল ক'রে অনুভব করারও অবসর নেই যে ওর!

দীর্ঘ ক্রোশব্যাপী আমবাগান শেষ হয়ে শহরের উপকণ্ঠে মাঠ। তারই আলের উপর দিয়ে যেতে হবে। নক্ষত্রের আলোয় তাকে দেখা না গেলেও ক্লারার শুভ্র পোষাক বহুদূর থেকেই বোঝা যাবে। তবে তারও ব্যবস্থা করেছে বৈ কি মিহির। বাগান যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি পুকুর আছে। তারই বাঁধানো চবুতারায় অর্দ্ধমূর্ছিতা ক্লারাকে এনে নামিয়ে নিজেও কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসল সে—ক্লান্তিতে দেহ অনড় হয়ে আসছে। আর বোধ হয় চলা সম্ভব নয়।

তবু, তবু উঠতেই হবে। পুকুরে নেমে আঁজলা আঁজলা ক'রে জল এনে দিলে ক্লারার মুখে-চোখে-মাথায়। ব্যাকুল অসহ তৃষ্ণায় পশুর মত হাঁ করে সেই জল পান করলে ক্লারা। তারপর যেন একটুখানি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উঠে বসল।

'একটু কি ভাল বোধ করছ ক্লারা ?'

ঘাড় নেড়ে সে জানাল, 'হ্যাঁ।'

একটা বড় আম গাছের ডালে পাতার ফাঁকে লুকোনো ছিল একপ্রস্থ সিপাহীর পোষাক, পেড়ে এনে মিহির বললে, 'এইটে যে পরতে হবে তোমাকে এখন !'

ক্লারা শিউরে উঠল সেদিকে চেয়ে, 'সিপাইর পোষাক ?'

'হ্যাঁ ক্লারা—এ অবস্থায় যার সামনে পড়বে নিশ্চিত মৃত্যু। তোমার আমার দুজনেরই। এই পোষাক আর ঐ পাগড়ী পরিয়ে ছোক্‌রা সিপাই সাজিয়ে নেব তোমাকে। রং আছে তৈরী, মুখটাও তামাটে করে দেব আমাদের মত।'

যন্ত্রচালিতের মতই পোষাকটি হাতে নিলে ক্লারা, কিন্তু কিছুতেই যেন পরতে পারে না। এ দিকে সময় চলে যাচ্ছে ! অসহিষ্ণু হয়ে উঠে মিহির বললে, 'তাহ'লে অনুমতি করো ক্লারা, তোমার পোষাক আমিই বদলে দিই। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কোন লজ্জা, কোন অপমান বোধ ক'রো না !'

আবার হু হু করে কেঁদে ওঠে সে, 'শুধু বাঁচবার জন্য কী না করলাম মিহির, কী না করলাম ! শবগুলো পড়েছে কয়েকটা করে—আর আমি নিঃশ্বাস রোধ

হবার ভয়ে তাদের নিচে ফেলে ওপরে উঠে এসেছি, যেমন জলে ভেসে ওঠে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। প্রাণপণে এই যুদ্ধ করেছি নিজের বিবেকের সঙ্গে, নিজের মনুষ্যত্বের সঙ্গে। পাগলও যদি হয়ে যেতুম—তাহলেও রক্ষা পেতুম। আর যে পারছি না আমি! আমার সমস্ত দেহ মন অসাড় হয়ে গিয়েছে। ওঃ—কত নীচ আমি; তুচ্ছ প্রাণটার জন্যে সকলকে মরতে দেখেও বাঁচবার কী চেষ্টা!'

মিহির আর অপেক্ষা করল না। এ ত উন্মাদই—এর কাছে আর সঙ্কোচ কিসের?

সে ওর পোষাক ছাড়িয়ে কোনমতে সিপাহীর পোষাক পরিয়ে দিলে, মুখে রং করে তার ওপর দিলে খানিকটা ধুলো মাখিয়ে। তারপর পাগড়ী পরিয়ে চুলটা সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে সস্নেহে ডাকলে 'ক্লারা।'

ক্লারা কিন্তু ততক্ষণে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে উঠেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা ধরে উঠে দাঁড়াল, 'বলো কতদূর যেতে হবে?'

'বেশী দূর না। আর ক্রোশখানেক হেঁটে গিয়েই নৌকো পাবো। নৌকো ঠিক করা আছে।'

প্রায় সমস্ত দেহের ভার মিহিরের ওপর এলিয়ে দিয়ে ক্লারা হাঁটতে লাগল। মিহিরও এক রকম ওকে টানতে টানতেই নিয়ে চলল। ভোরের আগে এ পথটা পার হয়ে যেতেই হবে। দিনের আলোয় ছদ্মবেশ ধরা পড়তে পারে!

এলাহাবাদে পৌঁছে ইংরেজ আশ্রয় পাওয়া গেল বটে কিন্তু রলিনসনের কোন খবর নেই। পাঁচ-ছ'দিন প্রায় দিন-রাত খুঁজল মিহির—যদিও আশা ছিল খুবই কম।

যাঁর আশ্রয়ে ক্লারা ছিল তিনি বললেন, 'মুখার্জি, বৃথা খোঁজ করছ—আমার মনে হয় সে আর নেই।...যাক্—তুমি যা করেছ তার জন্য সমগ্র ইংরেজ জাতি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, কিন্তু ক্লারার জন্য তুমি আর ভেবো না। ওকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবার ভার আমার! তুমি নিজের কাজ ক্ষতি ক'রো না।'

বোধ হয় ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে ভারতীয় যুবকের ঘনিষ্ঠতায় শঙ্কিত হয়েই উঠেছিলেন তিনি।

মিহিরও কথাটা বুঝল। এই ক-বছর সে বৃথাই ইংরেজের সাহচর্য করে নি। সেই দিনই অপরাহ্নে ক্লারার সঙ্গে নিভৃতে দেখা ক'রে বললে, 'ক্লারা, আমি আজই শেষ রাত্রে কাশী রওনা হচ্ছি। সেখানেও রলিনসনকে খুঁজব, যদি পাই ত এখানের ঠিকানা দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব তখনই—'

একটু থামল মিহির। তারপর কি বলবে ভাবতে লাগল সে। কিন্তু ক্লারা তাকে কথাটা শেষ করতে দিলে না, 'যদি না পাও? মিহির!'

মাথা নিচু করে মিহির বললে, 'তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছি—এইটুকুই তখন আমার সান্ত্বনা থাকবে। আমাকে দেশের দিকে ফিরতে হবে ক্লারা!'

'তার—তার মানে—'যেন আর্তনাদ করে উঠল ক্লারা, 'তোমার আর দেখা পাবো না?'

'আর কি আমাকে কোন প্রয়োজন আছে তোমার? কোন কাজ থাকে ত নিশ্চয়ই ফিরে আসব।' অন্য দিকে চেয়েই মিহির উত্তর দিলে।

ক্লারা একটু এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরল। চোখে তার বিচিত্র এক দীপ্তি, সেই চোখ-দুটি ওর চোখের উপর রেখে কম্পিত গাঢ় কণ্ঠে বললে, 'আমি, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না মিহির!'

সে চাহনির অর্থ ভুল হবার নয়। মিহির প্রায় শিউরে উঠে বললে, 'ক্লারা, তুমি আমার বন্ধুর বাগ্‌দত্তা। আমার ভগ্নির মত—'

'সে ক্লারা মরে গেছে, রলিনসনও সম্ভবত মৃত। এ ক্লারাকে নব জন্ম দিয়েছ তুমি, এখন আমার ওপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। মিহির, তুমি কি বুঝতে পারছ না, এই কদিনে তুমি আমার আত্মার সঙ্গে—সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছ? হ্যাঁ—রলিনসনকে আমি ভালবাসতাম—কিন্তু সেটা অস্পষ্ট

ধারণা মাত্র, তোমাকে পেয়ে বুঝেছি ভালবাসা কাকে বলে। তুমি অদ্ভুত, তুমি অপূর্ব—তুমিই আমার ঈশ্বর মিহির!

'ক্লারা, ক্লারা, এমন ক'রে লোভ দেখিও না, তোমার ঈশ্বরের দোহাই!' কেঁপে যায় মিহিরের গলা, তালু শুষ্ক হয়ে ওঠে—'ভেবে দ্যাখো তোমার সমাজ আর আমার সমাজে আকাশ পাতাল তফাৎ। ধর্ম আলাদা, জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টি-ভঙ্গী আলাদা। এতে তুমি সুখী হতে পারো না। তোমার সমাজ তোমাকে ঘৃণা করবে, আমার সমাজ আমাকে ত্যাগ করবে। নতুনের মোহ যখন কাটবে আমরা দুজনেই অভিশাপ দেব পরস্পরকে—জীবন আমাদের দুর্বহ হয়ে উঠবে।'

ক্লারা ওকে জড়িয়ে ধরল সবেগে, উত্তপ্ত পিপাসু দুটি ওষ্ঠ ওর মুখের কাছে এনে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'সমাজ ছেড়ে লোকালয় ছেড়ে চলো আমরা গহন অরণ্যে কোথাও চলে যাই। হিমালয়ে, সমুদ্রতীরের কোন জেলেদের গ্রামে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। আমার ত আর কেউ নেই তুমি জানো। এখন তুমিও আমাকে আর ত্যাগ ক'রো না। যা জুটবে তাই খাবো, আমি তোমাকে পরিশ্রম করে খাওয়াবো। তুমি আমার রাজা, আমার দেবতা—আমাকে শুধু সেবা করার অধিকার দাও।'

স্বপ্নের ঘোর লাগে কি মিহিরের মনে?

সে যেন নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে।

'তা হয় না ক্লারা। আমাকে বিদায় দাও। এই যদি সত্য হ'ত ত আমি সানন্দে সব ত্যাগ ক'রে তোমাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতাম। তুমি রাজার জাতে জন্মেছ; বিলাস ও ঐশ্বর্যে মানুষ, দুঃখ তুমি বেশি দিন সইতে পারবে না আমি জানি।…তা ছাড়া, আমি এদেশি লোক, ইংরেজ অনেক দুঃখ পেয়ে প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠেছে, তোমাকে নিয়ে আমি যদি বাস করি ত তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ আমাদের দুজনকেই পুড়িয়ে মারবে। তার চেয়ে এই ভাল ক্লারা, ডার্লিং—আমি যে তোমার জীবন রক্ষা করতে পেরেছি, পেয়েছি অন্তত

একদিনেরও ভালবাসা—এই আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাথেয় হয়ে থাকবে।'

কেমন একটা যেন আচ্ছন্নভাবে কথা বলে ক্লারা, 'তুমি বিপদে পড়বে ঠিকই। এরা কখনও ক্ষমা করবে না। এখনই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।...তবে থাক্। কিন্তু তুমি কেন আমাকে এমন করে বাঁচালে মিহির? সবাই গিয়েছিল তবু তুমি ছিলে—এতেই নতুন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে ছিলাম। এখন কী নিয়ে থাকব? কি রইল আমার জীবনে? ওঃ—ঈশ্বর! ঈশ্বর!'

আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো খুলে নামিয়ে দেয় মিহির। নিজেকে মুক্ত করে নেয় জীবনের সব চেয়ে প্রেয় ও রমনীয় বন্ধন থেকে। তারপর চেষ্টা করে ক্লারার সেই আচ্ছন্নভাবের সুযোগে নিঃশব্দে সরে যাবার।

কিন্তু সে দরজার কাছাকাছি পৌঁছতেই ক্লারার যেন চমক ভাঙ্গে। ছুটে এসে ওর পথ রোধ করে দাঁড়ায়, 'তোমার ঠিকানাটাও কি আমাকে দেবে না? দেবে না কোন স্মৃতি-চিহ্ন?'

'লাভ কি?' ম্লান হাসি হাসে মিহির, 'শুধু শুধু দুঃখকে বাড়ানো।...তার চেয়ে ভুলে যাবার চেষ্টা ক'রো ক্লারা। দেশে গিয়ে নতুন নতুন মানুষ পাবে। তারাই তোমার স্বজন। অল্প বয়স তোমার—দুঃখ ভুলতে পারবে সহজেই। মিছিমিছি বন্ধন রেখে যেও না। তা ছাড়া, হয়ত এখন তুমি চিঠি দেবে ঘন ঘন, এর পর যখন কমে আসবে সে চিঠির সংখ্যা, আমি অত্যন্ত আঘাত পাবো। তার চেয়ে এতে তবু এই আশ্বাস থাকবে আমার যে, তুমি আমাকে ভোলনি!'

'আশ্বাস!' সাগ্রহে উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে ক্লারা, 'তাহলে তুমি কি আমাকে মনে রাখবে মিহির?'

'তোমাকে ভোলা কি সম্ভব? আমাকে ভুল বুঝো না ক্লারা, আমার দেহটা শুধু থাকবে এখানে, আমার মন আর আত্মা দুই-ই ত তুমি নিয়ে যাবে চির-কালের মত!'

'আর কিছু আমি চাই না মিহির। এই দুটো কথা—হয়ত মিছে কথা, হয়ত শুধুই বৃথা আশ্বাস—তবু এই রইল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতি চিহ্ন। আর আমি বাধা দেব না। তুমি যাও।'……

স্খলিত মন্থরপদে মিহির যখন বেরিয়ে এল ওদের বাড়ী থেকে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকের প্রান্তর ঘিরে। চারিদিকের বাড়ীঘর সে আঁধারে অস্পষ্ট একাকার হয়ে গেছে। মিহিরের মনে হ'ল ও অন্ধকার যেন নামল ওর অন্তরেই—চিরকালের মত। জীবনের আলো স্বহস্তে ও স্বেচ্ছায় নিভিয়ে দিয়ে এল সে এই মাত্র।

# তৃতীয় পক্ষ

পুঁটি নিঃশব্দে বাহির হইয়া ভিতরের রকে দাঁড়াইল। তখন সকলে শুইয়া পড়িয়াছে, নীচের তলাটা সমস্তই অন্ধকার। উপরেও অন্যদিন এতক্ষণে সকলে ঘুমাইয়া পড়ে, আজ সে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল যে এখনও সেখানে একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কান পাতিয়া যেন একটা চাপা গোঙ্গানীর আওয়াজও শুনিতে পাইল, বোধ হয় মাস্টার-গিন্নীর আবার অসুখ বাড়িয়াছে।

ভিতরের উঠানটা যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি দুর্গন্ধময়, সেখানে আসিয়া যে কোন মানুষ ইচ্ছা করিয়া দাঁড়ায় বা বিশ্রাম করে; তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পুঁটি প্রত্যহই গভীর রাত্রে এম্‌নি করিয়া এখানে আসিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকে, কোন কোন দিন খুব শ্রান্ত হইয়া পড়িলে এই জল জঞ্জাল এবং দুর্গন্ধের মধ্যেই বসিয়া পড়ে! ভোর হইতে সারা দিন এবং রাত্রি এগারোটা বারোটা পর্যন্ত তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না; এই সমস্ত সময়টা এমন গোলমাল ও কাজের মধ্যে কাটে যে তাহার সমস্ত প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, সে এক মনে আশা করিয়া থাকে এই সময়টুকুর জন্য। খানিকটা সময় অন্ততঃ তাহার নিজের পাওয়া দরকার, যখন তাহাকে কাজ করিতে হইবে না, বকুনি খাইতে হইবে না, ভাইবোনদের পিছনে হৈ হৈ করিতে হইবে না, এমন কি নিদ্রার মধ্যে অচৈতন্য অবস্থাতেও কাটিয়া যাইবে না—যে সময়টা সে জাগিয়া থাকিবে. অথচ পরের ইচ্ছা মত, পরের প্রয়োজনে তাহাকে চলিতে হইবে না, যে সময়টা একান্তভাবে তাহারই, যেটা লইয়া সে যাহা খুশী করিতে পারে।

অবশ্য 'যাহা খুশী' ত ভারি! অন্ধকারে ভূতের মত চারিদিক চাপা, দুর্গন্ধময় স্যাঁৎসেঁতে এই ছোট্ট উঠানটায় আসিয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া ড্রেনের একঘেয়ে ঝরঝর করিয়া জল পড়িবার শব্দ শোনা, নয়ত অতি সঙ্কীর্ণ মুক্ত পথে উপরের

একফালি আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা, ইহা ছাড়া আর কি-ই বা সে করিতে পারে! কিন্তু তবু ঐটুকুই তাহার যথেষ্ট, ইহার মধ্যে অনেকটা স্বাধীনতা আছে!

ছোট বাড়ী, তিন দিকে বড় বড় বাড়ীর দেওয়ালে ঘেরা, একদিকে অন্ধকার, ঠাণ্ডা গলি। ঘরও বেশী নয়, মোট চারখানি। একতলায় যে ঘরখানা বাহিরের দিকে পড়ে সেটাতে একদল উড়ে ভাড়াটে আছে, তাহারা সেইখানেই বাস করে এবং মুড়ি, চিঁড়া ও তেলে-ভাজা খাবারের সঙ্গে কিছু চাল-ডালও সাজাইয়া দিনের বেলায় দোকান খুলিয়া বসে। ভিতরের একটি মাত্র ঘরেই পুঁটিরা সপরিবারে থাকে, আর সমস্ত দোতালাটা লইয়া থাকেন এক স্কুলের মাস্টার।

অথচ উঁহাদের ঝঞ্ঝাট কম। মাস্টার, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং দুই-পক্ষের মিলাইয়া মাত্র দুইটি ছেলেমেয়ে। পুঁটি মাঝে মাঝে অবাক হইয়া ভাবে মানুষ শুধু শুধু এত বাজে খরচ কেমন করিয়া করে! সে, তাহার বাবা, মা এবং আরও সাতটি ভাইবোনের যখন ঐ একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ঘরেই কুলাইয়া যায় তখন চারিটি প্রাণীর জন্য দুখানি ঘরের ভাড়া গোনার কি কোন অর্থ হয়? সে একবার ইতিমধ্যে মাস্টার-গিন্নীকে ইঙ্গিতে কথাটা বলিয়াও ছিল, মাস্টার-গিন্নী জবাব দিয়াছিলেন, 'আমার ভাই শরীর খারাপ, পাশের ঘরে একগাদা ঝামেলা সহ্য করতে পারব না। এমনিই নীচে তোমরা গোলমাল করো, তাইতেই আমার কত কষ্ট হয়। কী করব, ওঁর কুলোয় না তাই, নইলে আলাদা বাড়ীতেই আমার থাকা উচিত।'

কথাটা মনে পড়িতে অন্ধকারেই যেন পুঁটির চোখ দুইটা হিংস্র হইয়া উঠিল। চালের কথা শুনিলে তাহার গা জ্বালা করে। এ শুধু গায়ে পড়িয়া বড়মানুষি দেখানো।......দেমাক্ কত, তবু যদি বর ঢর-ঢরে বুড়া না হইত!......

পুঁটির বাবা কাজ করেন কর্পোরেশনের কী একটা কারখানায়, বেতন এতদিন পরে উনচল্লিশ টাকা আট আনায় উঠিয়াছে। সুতরাং আটটি ছেলেমেয়ে লইয়া ইহার চেয়ে ভাল ঘরের সম্ভাবনা তাঁহার নাই। পুঁটিই বড়,

তাহার বাপ-মা যদিও গত কয়েক বৎসর যাবতই পরের কাছে বলিয়া আসিতেছেন তাহার বয়স ষোলো, কিন্তু পুঁটি ভাল রকমেই জানে যে সে-ষোলো সে বছর-ছয়েক পূর্বেই পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। তবে তাহার চেহারা একটু রোগার দিকেই, তাই এখনও তাহাকে ষোলো বলিয়া চালানো যায়, তেমন 'বাড়ন-শা' গড়ন হইলে বাপ-মাকে বিপদে পড়িতে হইত।

পুঁটির এখনও যে বিবাহ হয় নাই, তাহার মোটা কারণটা অবশ্যই অর্থাভাব। এতগুলির ভরণপোষণ চালাইয়া ঐ আয়ে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায় না। কিন্তু সে বাধা যে একেবারেই অতিক্রম করা যাইত না তাহা নয়। দুই-একজন এমন আত্মীয় আছেন, যাঁহাদের কাছে গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া পড়িলে দুই-এক-শ' আদায় হইতে পারিত। তবে সেই দুই-এক-শ'তে যে পাত্র পাওয়া যায় তাহাতে মন ওঠে না। দোজ-বরে বরে পুঁটির ঘোরতর আপত্তি, সে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে যে 'বুড়ো বরে' দিলে সে আত্মহত্যা করিবে। আর ঐ টাকায় যে প্রথমপক্ষ পাওয়া যায়, তাহাদের স্বভাব-চরিত্র এবং সঙ্গতি সম্বন্ধে এমন সংশয় জন্মায় যাহাতে বাপ-মায়ের মন শেষ পর্যন্ত সায় দিতে পারে না। তাহা ছাড়া, পুঁটি রোগা হইলেও সুস্থ ছিল, বাকী সব কয়টি ভাইবোনই কিন্তু তাহার রুগ্ন ও অকর্মণ্য। এতগুলি রুগ্ন সন্তানের জনক-জননীর পক্ষে পুঁটিকে পরের বাড়ী পাঠানোর কল্পনাও আশঙ্কাজনক; সেইজন্যই বোধ হয় ওপক্ষে একটু শৈথিল্যও ছিল। কিন্তু পুঁটি যেন এবার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অহোরাত্র এই দারিদ্র্য ও পরিশ্রম যেন আজকাল তাহার কাছে একান্ত অর্থহীন বলিয়া ঠেকে। অকারণে বিরক্ত হইয়া ওঠে ভাইবোনদের উপর, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, রাগ করিয়া খায়না প্রায়ই। অথচ ইহার কারণ সে নিজেও খুঁজিয়া পায় না।

সহসা যেন উপরের গোঙানীর শব্দটা বাড়িয়া গেল। পুঁটি কান পাতিয়া শুনিল কী যেন কথাবার্তাও হইতেছে, কিন্তু অত দূর এবং দ্বার বন্ধ বলিয়া বোঝা গেল না। অসুখ নিশ্চয় বাড়িয়াছে; এক্ষেত্রে তাহার উপরে যাওয়া উচিত

কি-না বুঝিতে পারিল না। বৌ-টির বড়মানুষী চালের জন্য তাহার রাগ যতই থাক, কোথায় একটু সহানুভূতির সুরও ছিল পুঁটির মনের মধ্যে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, মেয়েটি সুন্দরী এবং তরুণী। সে মনে মনে সরমার বাপ-মাকে গালি পাড়ে, আহা, অমন সোনার প্রতিমাকে বাপ-মা কোন্ প্রাণে ঐ ঘাটের মড়ার হাতে তুলিয়া দিল কে জানে! তাহার রাগ হয় মাষ্টারটার উপরও, এই বয়সে বিবাহ না করিলে চলিত না? আর মেয়েটাই বা কী বাপু, বুড়োটাকে বিবাহ করিবার আগে বিষ খাইতে পারিল না!······

খানিকটা পরেই উপরের ঘরের কপাট খুলিবার আওয়াজ হইল। যদুনাথবাবু হ্যারিকেন হাতে বাহির হইতেছেন, বোধ হয় ডাক্তার ডাকিতে যাইবেন। সিঁড়ির মুখের কাছে আসিতেই আলোর রেখাটা আসিয়া পড়িল পুঁটির গায়ে। যদুনাথবাবু চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কে, কে ওখানে?'

পুঁটি কোন দিন যদুনাথবাবুর সঙ্গে কথা কহে নাই। তবে না বলিবারও কোন কারণ ছিল না, তাই সে জবাব দিল, 'আমি।'

তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিল, 'দিদির অসুখ বেড়েছে বুঝি?'

যদুনাথবাবু ততক্ষণে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বুকের ব্যথাটা ত আছেই, আজ আবার যেন কেমন হাঁপের মত ধরেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, শুতেও পাচ্ছে না মোটে।'

তাহার পর মুহূর্তখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'আমি যাচ্ছি ডাক্তার ডাকতে, কিন্তু একলা রইল, তাই ভাবছি। অবিশ্যি আমি যাব আর আসব, এই মোড়েই ডাক্তারের বাড়ী, তবু বড় ভয় করে—'

পুঁটি কহিল, 'আমি গিয়ে বসব একটু?'

যদুনাথবাবু কহিলেন, 'তা হ'লে ত ভালই হয়। আমি এখনই ফিরব, এই মোড়েই—'

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। পুঁটি ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। সামনের ঘরেই মেঝেতে একটা বিছানার উপর বসিয়া সরমা কাতরাইতে ছিল,

তাহার কোলের উপর একটা তাকিয়া দেওয়া, যন্ত্রণায় বেচারীর মুখ নীল হইয়া উঠিয়াছে।

সেইখানে বসিয়া পড়িয়া পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল, 'বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে দিদি?'

হাঁফাইতে হাঁফাইতে সরমা জবাব দিল, 'আজ মোটে নিঃশ্বেস নিতে পারছি না, যেন দম আটকে আসছে—'

চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া এ যন্ত্রণা দেখাও কষ্টকর। পুঁটি একটা পাখা তুলিয়া লইয়া কহিল, 'একটু বাতাস করব দিদি মাথায়? তাতে আরাম বোধ হবে মনে হচ্ছে?'

সরমা কথা কহিতে পারিল না, ইঙ্গিতে নিষেধ করিল।

অগত্যা পুঁটিকে চুপ করিয়াই বসিয়া থাকিতে হইল। সে তখন ঘাড় ঘুরাইয়া ঘরের আসবাব-পত্র দেখিতে লাগিল। ইতিপূর্বে এই মেয়েটির চালের জন্যও বটে, আর সমায়াভাবের জন্যও বটে, আর কোন দিন সে উপরে ওঠে নাই। আলাপ যা হইত উভয় পক্ষে, একজন থাকিত উপরের বারান্দায়, নয়ত সিঁড়ির মুখে, আর একজন থাকিত নীচের উঠানে। আজ সে মাস্টারের গৃহস্থালী দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। মাত্র দুইটি লোকের সংসারে যে এত আসবাব থাকিতে পারে, তাহা যেন তার কল্পনাতেই আসে না। আয়না বসানো আলমারী, আলনা, দেরাজ, বাক্স, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ, টেবিল, ঘড়ি আরও কত কি এত জিনিস লইয়া ইহারা করে কি?

দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ তাহার চোখ আসিয়া পড়িল আবার সরমার উপর। কয় মাস হইতে অসুখে ভুগিয়া তাহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে বটে, তবু তাহাকে এখনও সুন্দরীই বলা যায়। আশমানী রঙের কাপড়টি তাহাকে মানাইয়াছে ভালই। গহনাও খুব কম নাই, চুড়ি, বালা, আর্মলেট, হার, আরও কত কি! মেয়েটি সর্বদাই সাজিয়া গুজিয়া থাকিত, আর সেই জন্যই উহার অত দেমাক্—। মাগো, অমন কাপড়-গহনাতে কাজ নাই, বর ত ঐ ঘাটের মড়া।.........দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া বুড়োটাও কম জব্দ হয় নাই,

ইহার বাবুয়ানা জোগাইতে গিয়া ইস্কুলের পরও রাত্রি দশটা পর্যন্ত ছেলে পড়াইতে হয়।

সরমাকে দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ গেল আয়নাতে প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে। যেমন কালো, তেমনি রোগা—আর তেমনি শ্রীহীন। গায়ে কোথাও এক ফোঁটা সোনা নাই, কবে কোন্ মান্ধাতার আমলে ব্রোঞ্জের উপর সোনার পাতমোড়া চুড়ি তৈয়ারী হইয়াছিল, অতিরিক্ত ক্ষইয়া যাওয়াতে বাধ্য হইয়া খুলিয়া রাখিয়াছে, এখন শুধু কাঁচের চুড়ি ভরসা। পরনের কাপড়খানা পযন্ত কুৎসিত, মোটা মিলের কাপড়, তাও খাটো হয়।

তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেই হারিকেনের আলোতে সরমার হাতের চুড়িটা ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ বুজিল।

ইতিমধ্যে যদুনাথবাবু ফিরিয়া আসিলেন। পুঁটি প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই। তাহা হইলে ডাক্তার আসিবার আগেই সে নামিয়া যাইত, কিন্তু এখন আর তাহার অবসর মিলিল না। অগত্যা সঙ্কুচিতভাবে পা'শর ঘরের দ্বারপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। অন্যদিন নিজের রূপ বা সজ্জার দৈন্যের কথা তাহার মনেই থাকে না। কিন্তু আজ যেন অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিতেছিল।

ডাক্তার আসিয়াই ইঞ্জেক্সনের সরঞ্জাম বাহির করিলেন, কহিলেন, 'একটু গরম জল চাই যে—'

যদুনাথবাবু অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাহিতেই পুঁটি কহিল, 'কাগজ জ্বেলে গরম করে দেব ?'

যদুনাথবাবু খুশী হইয়া কহিলেন, 'কাগজ জ্বালাতে হবে না, ওঘরে তাকের ওপর স্টোভ আর স্পিরিট আছে, একটা বাটি-ফাটি ক'রে চাপিয়ে দাও—'

পুঁটি পাশের ঘরে গেল বটে, কিন্তু জলটি কি উপায়ে গরম হইবে, ঠিক বুঝিতে পারিল না। স্টোভ বস্তুটির সহিত তাহার পরিচয় ছিল না, ইতিমধ্যে একবার মামার বাড়ী গিয়া দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু জ্বালিবার কৌশলটা জানিত

না। অথচ যদুনাথবাবুকে কথাটা বলিতেও তাহার অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইল, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

কিন্তু যদুনাথবাবুই কী একটা কাজে আসিয়া পড়িলেন, উহাকে ঐ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, 'ও, স্টোভ বুঝি জ্বালতে পারো না? আচ্ছা, দাঁড়াও আমি জ্বেলে দিচ্ছি—'

তিনি স্টোভটা ধরাইয়া দিয়া গেলেন, নিভাইবার কৌশলটাও বলিয়া দিলেন। কিন্তু পুঁটি লজ্জায় যেন মরিয়া গেল, জলটা গরম হইতে বাটিটা ডাক্তারের সামনে বসাইয়া দিয়া কোনমতে পাশ কাটাইয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং একেবারে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। যদিচ শুইয়াও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, বিছানায় পড়িয়া বার বার নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

পরের দিন পুঁটির ঘুম ভাঙ্গিল বেলায়। চোখ চাহিতেই তাহার প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়িল, তাহা তাহাদের সংসারের অপরিসীম শ্রীহীনতা! মা এত বেলা অবধি ঘুমাইবার জন্য কলতলা হইতেই চীৎকার করিতেছেন; তখনও পর্যন্ত বিছানা তোলা হয় নাই, তক্তপোশের উপর, মেঝেতে সর্বত্র ময়লা ও ছেঁড়া কাঁথা ছড়ানো, একটা ভাই আর একটা ভাইকে ঠেঙ্গাইয়াছে বোধ হয়, সে বাটির তেলমাখা মুড়িগুলা বিছানায় ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নীটি হামা দিয়া আসিয়া তাহার বাবার বিছানাতেই মলত্যাগ করিয়াছে, তাহার দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে; যেটুকু মেঝে খালি আছে, তাহাও জলে কাদায় যেন নরকে পরিণত হইয়াছে। সেদিকে চাহিয়া পুঁটির সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, তাহার পর নিষ্ফল ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, 'মর, মর, তোরা।···সবক'টা একসঙ্গে মরে ত বাঁচি।'

সেদিন আর সে উপরে উঠিল না। বার বার ডাক্তারের আগমনে বোঝা গেল যে অসুখটা খারাপের দিকেই, তবু সে আর খবর লইতে গেল না।

সরমাদের ঠিকা ঝি'কে যদুনাথবাবু পয়সার লোভ দেখাইয়া রাত্রে থাকিতে রাজি করাইয়াছেন, এই কথাটা ঝি যখন নিজেই শুনাইয়া গেল, তখনও কোন কথা কহিল না।

কিন্তু তাহার পরের দিন যখন ঝি ছেলেমেয়ে-দুটিকে অপটুহস্তে স্নান করাইতে বসিয়াছে এবং তাহার ফলে সরমার মেয়েটা ভীষণ চীৎকার করিতেছে কানে গেল, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। সটান্ উপরে উঠিয়া গিয়া ঝিকে সরাইয়া দিয়া নিজেই মেয়েটাকে স্নান করাইয়া দিল। তাহার পর পরিপাটিভাবে তাহার প্রসাধন শেষ করাইয়া নিজেই ঠাকুরের কাছে ভাত চাহিয়া লইয়া খাওয়াইতে বসিল। মেয়েটাও তাহার কোলে উঠিয়া আশ্চর্যরকমভাবে শান্ত হইয়া গেল ; সরমা হাঁফাইতে হাঁফাইতে একবার দম লইয়া কহিল, 'বাঁচলুম ভাই, চেঁচিয়ে যেন বাড়ী মাথায় করছিল !'

উহাদের খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া যখন পুঁটি নীচে নামিয়া আসিল, তখন তাহার মা একেবারে অগ্নিমূর্তি ধরিয়াছেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ, তাই শুনি ! ডেকে ডেকে গলা কাঠ হয়ে গেল !'

পুঁটি শুধু কহিল, 'ওপরে গিয়েছিলুম।'

'কেন ওপরে যাস্ ! আমার নিজের কুকুর পথ্যি পায় না, উনি যান পরের উপকার করতে।'

পুঁটিও ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, 'তোমার ও শুয়োরের পাল ত বারোমাসই আছে মা, পাড়া-পড়শীকেও দেখতে হয় মাঝে মাঝে !'

মা তাহার জবাবে চীৎকার করিয়া কী একটা কটূক্তি করিয়া উঠিলেন, কিন্তু পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াইল না, অন্য কাজে চলিয়া গেল।

ইহার পর হইতে পুঁটি সম্পূর্ণরূপে ছেলেমেয়ে দুইটির ভার গ্রহণ করিল। তাহাদের নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, সব—ঝি'কে আর কিছুই

করিতে দেয় না। যদুনাথবাবু কৃতজ্ঞভাবে স্ত্রীকে বলেন, 'মেয়েটাকে আগে 'ঝগড়াটি' বলেই জানতুম, এখন দেখছি অনেক গুণ আছে ওর মধ্যে!'

সরমা অতি কষ্টে জবাব দেয়, 'বাপ-মা যা দিনরাত খাটায়, ঝগড়াটি না হয়ে কি করে বলো!'

কিন্তু সরমা বাঁচিল না। সাত আটদিন পরেই অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল, আরও দিন-দুই পরে সব শেষ। যদুনাথবাবুর এক দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং পুঁটির আর বিশেষ দরকার ছিল না, তবু সে এ কয়দিন কয়দিন অযাচিতভাবে আসিয়া সরমার অনেক সেবা করিয়াছে। সরমাও মৃত্যুর পূর্বে যদুনাথবাবুকে বলিয়া গিয়াছে, 'আহা ও মেয়েটার একটা দেখেশুনে বিয়ে দিও। না হয় দু-একখানা গয়না যা লাগে আমার একখানা ভেঙ্গে গড়িয়ে দিও—'

অশৌচ চুকিতেই যদুনাথবাবু উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এ বাসায় তাঁহার আর থাকিতে ইচ্ছা করে না।

যে ভগ্নী আসিয়াছেন, তাঁহারই পাশের বাড়ীতে ঘর খালি আছে, আপাততঃ সেখানেই উঠিয়া যাইবেন। তাহা হইলে ছেলেমেয়ে দুটির জন্য বিশেষ ভাবিতে হইবে না, দিদির পুত্রবধূই দেখাশুনা করিতে পারিবেন।

রবিবার দিন সকাল হইতে বাঁধা-ছাঁদা, তোড়জোড় শুরু হইল। আহারাদির পর দিদি ছেলেমেয়েদের লইয়া নূতন বাসায় চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের গাড়ীতেও অনেক মোটঘাট চলিয়া গেল। এখন আলমারী, দেরাজ, সিন্দুক প্রভৃতি ভারী জিনিসগুলি বাকী।

মুটে ডাকিয়া যদুনাথবাবু সেগুলির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এ কয়দিন অর্থাৎ সরমার মৃত্যুর পর হইতে পুঁটি আর উপরে ওঠে নাই, এমন কি ছেলেমেয়ে দুটাকেও একবার ডাকে নাই। তাহার এই নিস্পৃহতায় যদুনাথবাবু একটু বিস্মিতই হইয়াছিলেন, তবে মনকে বুঝাইয়াছিলেন যে, বোধ হয় পরের ছেলেমেয়েদের উপর মায়া পডিবার ভয়েই আর আসে না। কিংবা বাপ-মা হয়ত নিষেধ করিয়াছেন—

কিন্তু সেদিন সহসা অপরাহ্ণবেলায় পুঁটি উপরে উঠিয়া গেল। যদুনাথবাবু তখন আলমারী খুলিয়া সরমার দামী সাড়ীগুলি বাহির করিয়া একটা ঝুড়িতে সাজাইতেছিলেন, আলমারী খালি না হইলে মুটেরা লইয়া যাইতে পারিবে না। পুঁটি আসিতে তিনি একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। পুঁটিও সেই শাড়ীর স্তূপগুলির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। বেনারসী, জর্জেট, ঢাকাই, শান্তিপুরী, ক্রেপ, আরও কত কাপড় কিনিয়াছিল মেয়েটা!

শুধু কি কাপড়! একটা তাক বোঝাই কত সৌখীন খেলনা, রূপার বাসন আরও কত কি। বৃদ্ধ স্বামীর গায়ের রক্ত জলকরা পয়সা কি অপব্যয়ই না করিত।......

পুঁটি পিছন হইতে একবার যদুনাথবাবুর দিকে ভাল করিয়া চাহিল। না, যতটা বৃদ্ধ তাঁহাকে সে ভাবিত অতটা নয়। চুলে পাক ধরিয়াছে বটে, তবে সবগুলি এখনও পাকে নাই, দেহ এখনও বেশ সমর্থ আছে—

মুটেরা আলমারী লইয়া চলিয়া গেল। তিনি তখন দেরাজ খুলিয়া তাহার টানাগুলি খালি করিতে লাগিলেন। সেখানেও এক গাদা কাপড়-জামা! সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ যেন পুঁটির চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল।...

সে আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া কহিল, 'ছেলেমেয়ে দুটোর ভারী অসুবিধে হবে—'

যদুনাথবাবু প্রথমটা যেন চমকিয়া উঠিলেন, তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'তাই ত ভাবছি। কিন্তু কীই বা করি।'

পুঁটি একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আপনাকে শিগগিরই বিয়ে করতে হবে আর কি!'

যদুনাথবাবু চকিত হইয়া কহিলেন, 'আবার বিয়ে?'

পুঁটি বেশ সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, 'তা করতে হবে বৈকি! না হ'লে ছেলে-মেয়ে দুটোকে দেখবে কে?'

যদুনাথবাবু কহিলেন, 'কিন্তু এই বয়সে, আবার তৃতীয় পক্ষ! লোকে বলবে কী?'

'লোকে ত আর আপনার ছেলেমেয়ে মানুষ করতে আসবে না! আর এমন কীই বা বয়স আপনার!'

যদুনাথবাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, 'কিন্তু কে-ই বা মেয়ে দেবে আমাকে? দুটো ছেলের ওপর, তায় তৃতীয় পক্ষ! বয়সও ত পঞ্চাশ হ'ল প্রায়।'

পুঁটি সহসা যেন মরীয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিল, 'আমাকে যদি খুব অপছন্দ না হয় ত আমি রাজি আছি। বাবাকে বলতে পারেন।'

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া যদুনাথবাবু কহিলেন, 'তুমি বিয়ে করবে? আমাকে?……কিন্তু তোমার বাবা-মা রাজি হবেন কেন?'

পুঁটি ঘাড় হেঁট করিয়াই জবাব দিল, 'না হয়ে আর করবেন কি? বয়স যে এধারে তেইশ চলছে। তাছাড়া, ছেলেমেয়ে দুটোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যদুনাথবাবু তেম্‌নিভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

# সামান্য পথ

সমস্তক্ষণই জেগে জেগে বই পড়েছি, হাতে ছিল বিলিতী ভূতের গল্প—ঘুম পাবার কথাও নয়, তবু বোধকরি দৈবের ষড়যন্ত্রেই, একেবারে শেষমূহূর্তে কখন চোখ দুটি বুজে এসেছে—কিছুই টের পাইনি। আর অতক্ষণ পরের প্রথম তন্দ্রা বলেই হয়ত—এমন গভীর ভাবে ঘুমিয়েছি যে, জংসন স্টেশনের গোলমালেও ঘুম ভাঙ্গেনি। একেবারে যখন চমক ভাঙ্গল তখন পরের স্টেশন থেকেও ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম একটি সহযাত্রীকে, 'কী স্টেশন এটা ?'

নাম বলতেও বুঝতে পারলাম না।

'জংসনের আর কত দেরি ?'

'জক্শ্যন্ ? উ ত কব্ চলা গিয়া।'

নাম্ নাম্! হুইস্ল্ দিয়েছে গার্ড, গাড়িও চলতে শুরু করেছে। ভাগ্যিস ছোট একটি অ্যাটাচি কেস ছাড়া আর কিছু ছিল না সঙ্গে—কোনমতে ঘুম-চোখেই চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম।

যাক্ বাবা—ভাগ্যিস হাত পা ভাঙ্গেনি।

কিন্তু এ কোথায় এলাম ! একেবারে ছোট্ট নগণ্য স্টেশন। জনপ্রাণী নজরে পড়ে না। আর তেমনি ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। একটা কেরোসিনের আলোও কি কোথাও জ্বালতে নেই !

ততক্ষণে উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে ভালমতই। তাকিয়ে দেখলাম টিকিট ঘরের খুপরি থেকে একটা আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে বটে। তবু ভাল, ওখানে অন্তত গাড়ি-টাড়ি গুলোর হদিশ মিলবে।

নক্ষত্রের আলোতে চোখ্ তখনও অভ্যস্ত হয় নি, কোনমতে অন্ধকারে হোঁচট্ খেতে খেতে সেই মাটির-সঙ্গে-মিশে-থাকা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ত স্টেশন ঘরের কাছে এলাম—কিন্তু ও হরি, এ কি ! দোরে যে চাবি দেওয়া ! টিকিটের খুপরি

দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ঘরে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জলছে বটে—যৎপরোনাস্তি কমানো আছে পলতেটা কিন্তু মানুষের কোন ' নেই। গাড়ি আসার সময়ও মাস্টার বাবু ছিলেন কিনা সন্দেহ, গার্ডের সঙ্গে অনেক সময় বন্দোবস্ত থাকে এসব ফ্ল্যাগ স্টেশনে, গার্ডই গাড়ি ছেড়ে দেন নিজের দায়িত্বে—আর থাকলেও গাড়ি আসার সঙ্গেই সঙ্গেই আশ্চর্য রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে পড়েছেন।

তাইত, এখন উপায় ?

কোয়ার্টার আছে একটা দূরে কিন্তু সেখানেও আলো নেই। মাস্টার বাবু (উনিই বোধহয় টিকিটবাবু—এক এবং অদ্বিতীয়) ওখানে থাকেন কিনা কে জানে—হয়ত এই গ্রামেই বাড়ি, রাত্রে বাড়িতে চলে যান। সাধারণতঃ স্টেশনের পাশে দু একটা খাবারের দোকান থাকে, 'দুধ দহি'র দোকান ত এখানে অনিবার্য—কিন্তু আমারই অদৃষ্টক্রমে বোধহয়, এখানে কিছুই দেখলাম না।

উত্তর প্রদেশের এই উত্তর দিকটায় আমি কখনও আসিনি এর আগে। এখানের পথ-ঘাট ট্রেন-বাস সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। এক্ষেত্রে কি করা উচিত, কাছাকাছি কোন গ্রাম থাকলেও না হয় গিয়ে রাতটার মত আশ্রয় নেওয়া যেত কোন গৃহস্থের বাড়ি। তাও ডাকাত মনে করে আশ্রয় দিত কিনা সন্দেহ। · সে যাই হোক্—গ্রামও ত দেখা যায় না।···হয়ত আশে-পাশেই কোথাও আছে কিন্তু এমনই অন্ধকার যে মাঠে বনে গ্রামে সব একাকার হয়ে গেছে, বোঝবার কোন উপায়ই নেই।

অগত্যা এই প্ল্যাটফর্মেই ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম। যা নির্জন চারিদিকে—ভয় হতে লাগল—বাঘ টাঘ নেই ত? হায়েনা বা নেকড়ে থাকা মোটেই আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া বসিই বা কোথায়। না আছে একটা বেঞ্চ, না আছে কিছু। স্টেশন ঘরের যদি একটা বাঁধানো সিঁড়ি থাকৃত ত না হয় সেখানেই বসতাম, তাও যে নেই।

ইতস্তত করছি এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে সহসা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আপ কাঁহা জাইয়েগা বাবু ?'

যেন মনে হল চারিদিকের অন্ধ আকাশই কথা কয়ে উঠল।

চম্‌কে, প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম, 'কে—কে—কৌন হ্যায় ?'

এইবার লোকটিকে দেখা গেল। যদি বলি সেই তমিস্রঘন মহাশূন্য থেকেই লোকটি ছায়ামূর্তি পরিগ্রহ করে প্রকট হল—তাহলেও খুব ভুল বলা হয় না। এমনিই আকস্মিক আবির্ভাব সে লোকটির।

মিশ কালো রং, রেলের একটি নীল্‌চে-কালো রঙের কোট গায়ে, পরনের ধুতিটাও বোধ হল রঙীন—বড় বড় চুল এবং ঘন চাপ গোঁফ-দাড়ি। অথচ বৃদ্ধ নয়—মনে হ'ল মানসিকের চুল দাড়ি। সেই রকমই অযত্ন-বর্ধিত—এলোমেলো।

এতই কালো যে সেই অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রের আলোতে চোখটা সয়ে এলেও, তার মুখ চোখ কিছুই ঠাওর হ'ল না। শুধু কপালে বোধ হয় একটা সাদা চন্দনের ফোঁটা—আর কথা কইবার সময় সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত মাত্র দেখা যাচ্ছিল।

সে লোকটি দু-হাত তুলে নমস্কার করে বললে, 'হাম্ পোর্টার হ্যয় বাবু!'

'পোর্টার হ্যয়! কাঁহা গিয়াথা—একো আদমিকা পাত্তা নেহি মিলতা!' কিছুক্ষণ পূর্বের আতঙ্কের সঙ্গে রাগ মিশে দস্তুরমত উষ্ণ হয়ে উঠেছি—প্রায় খিঁচিয়ে উঠলাম।

সে তখন পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে জবাব দিলে যে সে গ্রামে তার ভাতিজার বাড়ি খেতে গিয়েছিল। তাছাড়া এখন তার ডিউটী নেই।

কতকটা শান্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'বাপু এখান থেকে জংসন কতদূর হবে ?'

'জক্‌শ্যন্ ?' সে মনে মনে হিসেব করে বললে, 'করীব সাত আট মিল হোগা বাবুসাব!'

সাত আট মাইল ?

দমে গেলাম।

'তা বাপু যাবার গাড়ি কটায় ?'

'গাড়ি এখন কোথায় বাবু—সেই ভোর চারটায়।'

সর্বনাশ! আমি ওখান থেকে বড় লাইনের যে গাড়ি ধরব সে যে রাত তিনটেয়। এ গাড়ি না পেলে কাল বিকেল পর্যন্ত বসে থাকতে হবে।

ঘড়িটা দেখবার চেষ্টা করলাম। পকেটে একটা দেশলাইও নেই। টর্চটা ভেঙে গেছে সেদিন পকেট থেকে পড়ে গিয়ে, আর কেনা হয়নি। নক্ষত্রের আলোয় দেখা কি যাবে? ভাগ্যিস্ আধুনিক বাহারি ঘড়ি নয়—

যতদূর দৃষ্টি গেল—বোধ হয় রাত দশটা হবে। এখন থেকে চুপ করে বসে থাকব? সাত আট মাইল বলেছে—মনে মনে হিসাব করলাম—হয়ত দশমাইল হবে। এদেশের ডালভাঙা ক্রোশ। তাহলেও হেঁটে যেতে তিন ঘণ্টার বেশী লাগবে না। অর্থাৎ রাত একটার মধ্যে জংশনে পৌছে যাব। মিছি মিছি চব্বিশ ঘণ্টা মাটি করব?

না। সেই ভাল। এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে জবুথবু হয়ে সারারাত বসে থাকা কিছু নয়। তখন আমার জোয়ান বয়স—নিক্রিয়তাই সব চেয়ে খারাপ লাগত।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই লাইন ধরে যেতে হবে না, অন্য রাস্তা আছে? বাঘটাঘের ভয় নেই ত বাপু? কিংবা ডাকাত?'

সে একটু চিন্তা করে জানালে যে, সে যতদূর জানে শেরটেরের ভয় নেই। ডাকুর কথাও ত শোনে নি।...কিন্তু আর একটা পথ আছে এই কোণাকোণি মাঠের মধ্যে দিয়ে, সে পথ দিয়ে যদি যেতে পারি ত রাস্তা প্রায় আধা কমে যাবে!

বিলক্ষণ, তাহ'লে ত বেঁচে যাই। ঘণ্টাখানেক কি বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক হাঁটা কিছুই নয়।

'নিশ্চয়ই যাব।' যতদূর জানা ছিল হিন্দীতে উত্তর দিলাম, 'তা বাপু যদি-যেতে-পারি বল্‌ছ কেন? কী হয়েছে কি?'

'না, তেমন কিছু নয়। ঐ যে মাঠটা দেখছেন, ঐ মাঠের শেষে একটা

জঙ্গল পড়ে। পথ আছে কিন্তু সে ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই পথ। এমন কিছু লম্বা জঙ্গলও নয়—বড় জোর আধা মিল হবে। জঙ্গল পেরিয়ে আবার একটা মাঠ আছে এমনি তারপরই জক্‌শ্যন্।

'তা জঙ্গলে ভয়টয় কিছু আছে নাকি ?'

'না। তেমন কিছু নয়। থোড়া জঙ্গল। শেরটের কিছু নেই।'

'তবে ভয়টা কিসের ? ভূতের ?'

'সীতারাম বাবু। ভূত কোথায় ?'

তখন একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলি, 'তবে ব্যাপারটা কি খুলে বলই না বাপু। কেবলই ত বলছ তেমন কিছু নয় !'

'না। কী জানেন—বান্দরের বড় উপদ্রব বাবু ! তাই বলছিলুম যে ওপথে যাবেন, না সিধা লাইন ধরবেন ?

বানর !

হে ভগবান ! লোকটা কি পাগল নাকি। আরে এই উত্তর অঞ্চলে বানর নেই কোথায় ?

খুব জোরেই হেসে উঠলাম।

'বানরের ভয় ! বানর আমার কি করবে ? ব্যাগটা কেড়ে নেবে ? তা পারবে না। না হয় একটা গাছের ডাল-টাল ভেঙে নিচ্ছি।'

লোকটা যেন চটেই গেল একটু, 'আপনি বান্দরকে অত উড়িয়ে দেবেন না বাবু। লঙ্কার রাজা দশানন বান্দরকে গ্রাহ্য করেনি, কারণ কি সে বান্দর ধরে খেত—সেই বান্দরের কাছেই হেরে গেল। মারাও গেল ধরতে পারেন—বান্দরের সাহায্য না পেলে কি রামচন্দ্র ওদের মারতে পারতেন ?'

'না না। অগ্রাহ্য করব কেন ?' সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'তা ছাড়া আমি ত ওদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি না, ওদের সঙ্গে কোন শত্রুতাও নেই। আমি যাব আমার পথে, ওদের সঙ্গে আমার ঝগড়া কি ?'

আর বাদানুবাদের অবসর দিলাম না।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে ষ্টেশন পেরিয়ে সেই পায়ে-চলা পথ ধরে রওনা হলাম। এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে চারদিক। যে দিকটা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা ভুল হবার নয়—দিক্-চক্ররেখায় বনের কালো ছায়াটাও দেখতে পাচ্ছি। বেশ হন্ হন্ করেই হাঁটতে লাগলাম। যখন অত বানর আছে বনে তখন বাঘ নেই এটা ঠিক। বাঘ বা ঐ জাতীয় কোন হিংস্র জন্তু থাকলে অত বানর থাকতে পারত না।

সে পোর্টারটিকে যখন আমি রওনা হই তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম সেইখানেই। খানিক পরে যখন ফিরে তাকালুম—তার আর চিহ্নও নেই। যেমন বাতাস থেকে ফুটে উঠেছিল তেমনি বাতাসেই মিলিয়ে গেল।

গাছের ডাল ভেঙ্গে নেওয়া হয়ে উঠেনি—কারণ পথে কোন গাছই পাইনি। ফসল-উঠে যাওয়া রিক্ত মাঠ ধূ ধূ করছে, ঘাস পর্যন্ত বিরল সেখানে। জঙ্গলে ঢোকবার ঠিক মুখে গোটা কতক বড় বড় মাটির ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরলুম। এখানকার মাটি প্রায় পাথরের মতই শক্ত, গায়ে লাগলে আঘাত পাবে যে-কেউ। যদি সত্যিই রামচন্দ্রের অনুচররা খুব জ্বালাতন করে ত দুই একটা ছুঁড়ে এবং বাকি ছোঁড়বার ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে।

জঙ্গল এমন কিছু ঘন নয়। বাব্‌লা গাছই বেশি, দু একটা অন্য কি গাছ আছে! আমগাছও আছে কিছু কিছু—মধ্যে মধ্যে এক এক জায়গায় অনেক গুলো করে। সেই সব 'পকেট' গুলো কিছু বেশি অন্ধকার, নইলে অন্য জায়গায় রাস্তা ও তার দুপাশ বেশ ভালই দেখা যাচ্ছিল। এদেশের জঙ্গলে নিচে আগাছা থাকে না বলে খুব ঘন জঙ্গলকেও যথেষ্ট বনময় বলে বোধ হয় না।

অনেক খানি এগিয়ে গেলাম।·· বেশ হন্ হন্ করেই চলেছি কারণ জঙ্গলটা যত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল। কতক্ষণই বা লাগবে, পাঁচ সাত মিনিট—বড় জোর দশ।

কিন্তু বানর কোথায়?

একটা কোন প্রাণীরও ত চিহ্ন দেখছিনা। লোকটা খামকা ভয় দেখিয়েছে। বানর যতটা থাকা উচিত এদেশের গাছ পালায়—ততটাই ত নেই। থাকলেও তারা ঘুমুচ্ছে। মনে মনে রাগ হল লোকটার ওপর। আর একটু হলেই ভোগাচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারলুম যে হঠাৎ এই 'শর্টকাট'টার কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের মনে অপর মানুষকে ভোগাবার যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকে সেই প্রবৃত্তি ওকে খিদার দিয়ে ওঠায় ও এই 'কিন্তু'র জেরটা টেনেছিল।

বদমাইস পাজী কোথাকার!

আর একটু হলেই আরও মাইল পাঁচেকের ফেরে ফেলেছিল লোকটা!

কিন্তু এই সব কথা যখন ভাবছি তখনও চলছি সমানেই—এটা ঠিক। আন্দাজে মনে হল মিনিট দশেক কেটে গেছে বহুক্ষণ। যে 'রেট'-এ হাঁটছি দশ মিনিটে আধ মাইল কেন—এক মাইলই-পার হয়ে যাবার কথা। কত গজে মাইল হয় এদের! এ দেখছি সেই ডালভাঙ্গা ক্রোশের প্যাঁচেই পড়েছি।

তবে—ভরসার মধ্যে এখনও আমার ক্লান্তি আসেনি একটুও। বেশ অনায়াসেই চলেছি। সেই জন্য মনে অসন্তোষও জমেনি। কতটাই বা হবে—এখনই পেরিয়ে চলে যাব।

কিন্তু আরও অনেকক্ষণ হাঁটলাম। অন্তত আরও মিনিট দশেক। কৈ বনের শেষ কোথায়? দূর মাঠের আলোও ত দেখা যায় না।

আরও পাঁচ মিনিট।

না, এই বার হাঁপিয়ে গিয়েছি। ধূমপানের অভ্যাস নেই, নইলে অনেক আগেই হাঁপিয়ে পড়তুম।...থমকে দাঁড়ালুম একটু। ঘড়িটা দেখবার চেষ্টা করলুম—এত আলো নেই যে, ভালো বোঝা যায়। তবু মনে হল এগারটা বেজে গেছে বহুক্ষণ। তার মানে অনেক হেঁটেছি। একটু কোথাও বসতে পারলে হ'ত, গাছতলায় বসব নাকি?...কেমন একটু যেন ভয় ভয়ও করে। যা নিস্তব্ধ থমথমে বন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একবার ফিরে তাকালুম।

পিছনের মাঠও যে কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিছু মাত্র আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক কোন্ দিকে স্টেশন বা মাঠটা ছিল! চারিদিকে শুধু নিবিড় ঘন বন—প্রাণ-স্পন্দন হীন—নিস্তব্ধ!

এই বার একটা সংশয় এবং আতঙ্ক ধীরে ধীরে মনে দেখা দিলে। পথ গুলিয়ে ফেলিনি ত? হয়ত কোন চক্রপথে অবিরাম ঘুরছি তাই বন আর শেষ হচ্ছেনা।

সর্বনাশ! গোলক-ধাঁধায় পড়লুম নাকি।

লোকজনের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই—যে চিৎকার করে ডাকলে এসে উদ্ধার করবে। দিনের আলো না ফুটলে কোন উপায়ই হবে না। তাও কি হবে?

ভয়ে হতাশায় হাত-পা যেন ভেঙ্গে এল। ডাক ছেড়ে খানিকটা কাঁদতে পারলে খুশী হতুম।

আচ্ছা—পথ ভুলই বা হবে কি করে? যতদূর মনে পড়ছে মাঠ ছেড়ে বনে ঢুকে এই একটি পথই দেখেছি, ডাইনে বাঁয়ে আর কোনদিকে হেলেছি বলে ত মনে হচ্ছেনা। আর কোন পথও ত ছিল না। তখন যেন মনে হচ্ছিল সোজা বনটাকে দ্বিধা-বিদীর্ণ করে রাস্তাটা চলে গেছে।

তবে?

এই সময় একটা সিগারেট কি অন্তত খানিকটা নস্যির অভাব খুব বেশি রকম অনুভব করতে লাগলুম। একটা কিছু নেশা করতে পারলে খানিকটা আশ্বাস পেতুম।

বসব নাকি? আর দাঁড়াতে পারছিনা।

বসাই যাক্। চেয়ে দেখলুম একটা আম-গাছের নিচেই দাঁড়িয়ে আছি। যাক্ কাঁটা গাছ ত নয়—বেশ আরাম ক'রে ঠেস দিয়েই বসলাম।

কী অন্যায়ই করা গেছে—ঐ সামান্য একটু তন্দ্রার খেসারৎ যে এতখানি দিতে হবে তা কে জানত! নিদেন স্টেশনে বসে থাকলেও হ'ত, ভোরের

গাড়িতেই চলে যেতুম। তবু সে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের জগৎ—এমন ভয়াবহ নির্জন বন নয়।

কী বিপদে পড়লাম এবং কেমন করে এ থেকে অব্যাহতি পাব ভাবছি—বেশ একটু ব্যাকুল ভাবেই ভাবছি—তাই হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। তবে ঘুমুইনি এটা ঠিক, চোখও বুজিনি। কিন্তু হঠাৎ যেমন খেয়াল হল যে এবার ওঠা দরকার, এর পর বসে থাক্‌লে ঘুমিয়েই পড়ব, তাছাড়া বেরবার চেষ্টা করা উচিত আর একবার—মুখ তুলে চারিদিকে তাকিয়ে—চম্‌কে শিউরে উঠলুম।

এ কি!

আমার চারিদিকে, আমাকে ঘিরে—বহু দূর দূরান্তর পর্যন্ত যেখানে যত ফাঁকা জায়গা ছিল, যতটা দৃষ্টি যায়—শত শত, সহস্র সহস্র—হয়ত বা লক্ষ লক্ষ বানর! নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তাকিয়ে আছে কিনা তা অবশ্য ঠিক দেখিনি, কিন্তু কেমন যেন আমার মনে হল সেই মুহূর্তে—এরা আমার দিকে তাকিয়েই আছে!

এ কি, আমি চোখে ভুল দেখছি না ত?

এ কি মায়া, আমার আতঙ্কে কল্পনা করছি সবটা?

ভাল ক'রে চোখ মেলে চাইলাম—যতটা সম্ভব বিস্ফারিত করে। না—ভুল না। চিম্‌টি কাটলাম নিজের পায়ে খুব জোরে—না সমস্ত অনুভূতিই ঠিক আছে। ঐ ত একটার গা ঘেঁষে একটা—পর পর যেন নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র ব্যূহ রচনা ক'রে বসে আছে। একেবারে নিঃশব্দে—

কখন এল ওরা?

কোথা দিয়ে এল?

একটা গাছের ডাল নড়ার শব্দও ত পাইনি, পাইনি "ধুপ্‌" করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ। অথচ এত কাছে—ডাইনে বাঁয়ে সামনে, পিছনেও খুব সম্ভব, এক বিঘৎ নড়লেই গায়ে গা ঠেকবে।

কী বিপদ! এদের মতলব কি?

কামড়াবে নাকি ? এত গুলো বানর—ইচ্ছে করলে নিমেষে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিতে পারে। ভয়ে যেন বিবশ হয়ে এল সমস্ত স্নায়ু—হাত পা ঝিম্ ঝিম করতে লাগল।

আর অমন নিশ্চল হয়েই বা বসে আছে কেন ? একটু কিচকিচ করলেও ত বাঁচতাম।

একটা অজানা ভয় যেন মৃত্যু-শীতল হিমস্পর্শ নিয়ে মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে গেল।

কী করব ? কী করা উচিত ?

এমন করে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাব যে !

হা-হা করে হেসে উঠলাম। যেন কতকটা নিজের মনে সাহস আনবার জন্যই। তাছাড়া ওদের কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটাও দেখা বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল

কিছুই হল না কিন্তু। তেমনি নিশ্চল স্থির হয়ে বসে আছে। তেমনি একদৃষ্টে চেয়ে।

আচ্ছা ওগুলো পাথরের নয়ত ? কিংবা মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে যেমন —অসংখ্য হরিণ—তেমনি কিছু নয় ?

এগিয়ে যাবো নাকি ? ঠেলে পথ করে নিলে কি হয় ওদের মধ্য দিয়ে ?

অসীম সাহসে ভর করে প্রাণপণ চেষ্টায় একবার মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম সামনের বানরটার কাছে। না, পাথরের ত নয়, ঐ ত চোখ পিট্ পিট্ করছে। তবু নিঃশ্বাসের শব্দ হয় না কেন ? এতগুলো প্রাণীর নিঃশ্বাসের আওয়াজও ত কম হবেনা।

না—যেতেই হবে আমাকে। আমি বিংশ-শতাব্দীর সভ্য মানুষ, বুনো বানরকে ভয় করব ?

উঠে দাঁড়ালুম।

সে যে কী সাধনা, ঐটুকু দেহ নাড়বার জন্য ! কি চেষ্টায় যে সেটা সম্ভব হ'ল তা আপনাদের বোঝাতে পারবনা। শুধু আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুতে নড়াতে পারতনা তখন, ভয় এমনই পেয়ে বসেছে আমাকে ! উঠে দাঁড়াতে

আরও অনেকখানি দৃষ্টিগোচর হ'ল। সর্বত্রই ঐ এক। কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নেই। প্রায় এক আকারের গোদা গোদা রূপী বানর। একটার গায়ে গা ঠেসিয়ে আর একটা।

এত বানর পৃথিবীতে আছে?

এগোবার চেষ্টা করলুম। একটা পা ফেললুমও—কিন্তু ওরা তেম্‌নি নিশ্চল। এমন শান্ত নিস্পন্দ বিরোধিতা এর আগে আর কোথাও দেখিনি।

ঠিক ওদের গায়ে পা ঠেকাতে ভরসায় কুলোলনা কিছুতেই। অথচ—অথচ এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব কি ক'রে?

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হ'ল। লোকটার কথা শুনলে কি ক্ষতি হ'ত আমার! এই দেশেরই লোক, সব জানে শোনে!

'হেই! এই যাঃ! হট্‌!'

মুখে গরু তাড়াবার মত শব্দ করলুম। ফল পূর্ববৎ! মনে পড়ল পকেটের মাটির ডেলার কথা। দু-একটা ছুঁড়ব নাকি? যদি রেগে সবাই মিলে আক্রমণ করে?

করুক। না হয় মরেই যাবো। কিন্তু এ অবস্থা যে অসহ্য।

ছুঁড়লাম একটা মাটির ডেলা। আর একটা, আর একটা। পাগলের মত যে ক-টা ছিল নিঃশেষ করলাম। পাগল হয়েই উঠেছিলাম বোধ হয়। কিছুই হ'ল না—এমন কি ঢিলগুলো গায়ে লাগার মত শব্দও হ'ল না। আর ওরাও নির্বিকার।

আচ্ছা—ভূত নয় ত? ভূতে ভয় দেখাচ্ছে?

রাম নাম করব?

'রাম, রাম, রাম।' বার কতক রাম নামই করলাম, বেশ চেঁচিয়ে।

এইবার ফল একটা ফলল। তবে যা আশা করেছিলাম তার বিপরীত।

হঠাৎ মনে হ'ল সেই বানর বাহিনী—বাহিনী না ব'লে বোধ হয় কটক বলাই উচিত—সেই লক্ষ লক্ষ বানর এক সঙ্গে হেসে উঠল। নিঃশব্দ হাসি—মানুষের

মত। হয়ত তখন ভুল দেখেছি কিন্তু নিশ্চিত মনে হ'ল—ওদের সেই কোটি কোটি ঈষৎ হল্‌দে দাঁত আধো-অন্ধকারে আমার দিকে চেয়ে বিকশিত হয়েছে এবং ওদের স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি বিদ্রূপ আর উপেক্ষার হাসি হাস্‌ছে। কিন্তু নড়েনি কেউ, সংখ্যাও কমেনি—বরং মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই তারা বাড়ছে।

চিৎকার করে উঠেছিলাম প্রাণপণে—এইটুকু শুধু মনে আছে। আর কিছু মনে নেই।

যখন আবার অনুভূতি ফিরল তখন দেখলাম একটা মাঠেই শুয়ে আছি। দূরে গ্রাম, রেলের লাইন সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় ঐ সেই জংশন।

খানিকটা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম জ্ঞান আমার এম্‌নি হয়নি। তুটি হিন্দুস্থানী লোক লোটা হাতে দাঁড়িয়ে, আমার মুখে মাথায় জল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম অনেক পিছনে সেই বনের রেখা।

'বাবুজী এখন কেমন বোধ করছেন?'

সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী—তবু কী স্নেহ ও উদ্বেগ তাদের কণ্ঠে মনে হ'ল প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

ঘাড় নেড়ে জানালাম, ভাল বোধ করছি। উঠে দাঁড়ালামও। ঐ যে য়্যাটাচি কেস্‌টাও পড়ে আছে দেখছি।

'কেমন করে এমন হ'ল বাবুজী? এখানে এলেন কোথা থেকে? বাড়ি কোথায়? মূর্চ্ছার অসুখ আছে না কি?' ইত্যাদি সহস্র প্রশ্ন। এ কৌতূহল স্বাভাবিক। রাগ হ'লেও যুক্তিতে সে রাগ দমন করলুম। সংক্ষেপে বললুম সব কথা।

বৃদ্ধটি যেন শিউরে উঠল, 'বাবুজী ঐ বনের মধ্যে দিয়ে আপনি এসেছেন? কী সর্বনাশ।'

'কেন বলো ত? কি আছে ও বনে?'

'মাফ কিজিয়েগা বাবু!' বুড়ো আর দাঁড়ালনা, তুহাত তুলে, বোধ করি

কোন দেবতার উদ্দেশে—হয়ত বা ভগবান রামচন্দ্রের উদ্দেশেই, প্রণাম জানালে—তারপর দ্রুত গ্রামের পথ ধরলে।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স যেটির, সে স্টেশনটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওহি জংশন্ হায়, চলে যাইয়ে।"

সেও দ্রুত বৃদ্ধের পশ্চাদ্ধাবন করলে। এত তাড়াতাড়ি চলে গেল ওরা যে, কিছুতেই আমি এই দুর্বল শরীরে ওদের আর ধরতে পারলুম না।

অগত্যা স্খলিত দুর্বল পদে জংশনের পথই ধরলুম। রহস্যটা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেল আমার কাছে। জংশনেও দু একজনকে প্রশ্ন করেছি, কেউ বিস্মিত হয়েছে, কেউ নিরুত্তরে হাত তুলে প্রণাম ক'রে ওদেরই মত সরে পড়েছে।

# ঈশ্বরের লজ্জা

অনন্ত। সীমাহীন মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্র ও গ্রহ, পরস্পরের সহিত কোটি কোটি যোজন ব্যবধান রচনা করিয়া বিরাজ করিতেছে। কোনটা সূর্যের দশ গুণ বড়, কোনটা বা লক্ষ গুণ। কোন নক্ষত্রের গ্রহ আছে—কেহ বা সঙ্গিহীন। কোথাও প্রাণীজগৎ আছে—কোথাও জীবলক্ষণ-মাত্র নাই।

এই মহাশূন্যের মধ্যেই অসংখ্য ভাগ আছে। তার মধ্যে কতগুলি স্বর্গ কতগুলি দেবলোক কতগুলি ব্রহ্মলোক আছে তাহার কোন হিসাবই মেলে নাই নারদের। অথচ তিনি সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত শুধু ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন। ইচ্ছামাত্র গতি তাঁর, শূন্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া নারদ দিবারাত্র ঘুরিতেছেন; বাতাসের চেয়েও দ্রুত চলেন তিনি, রেডিও পরিচালিত রকেট বোমাও আজ পর্যন্ত তাঁহার মত দ্রুত যাইতে পারে নাই। আর চলিতেছেন বা কত দিন! কত মনু গেল, কত কল্প গেল তাঁহার চলার আর বিরাম নাই। তবু ত এই সৃষ্টিটার কোন হদিস্ মিলিল না। মনে মনে ধারণাও করা গেল না অনন্তটা কত বড়। তাই বিরক্ত হইয়া ইদানীং নারদ ও মাপজোপের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে যে জীবলোকগুলি তাঁহার ভাল লাগে, সেইগুলির মধ্যেই তিনি পালাক্রমে ঘুরিয়া বেড়ান।

পৃথিবীর উপর মহর্ষি নারদের প্রীতিটা একটু বেশী। মানুষ নামধেয় জীবগুলি তাঁহাকে বেশ মানে গণে। তাহারা তাঁহাকে বিবাদের দেবতা করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার সম্মানার্থে ঝগড়া বিবাদ লড়াই তাহারা প্রায়ই করে। কিন্তু সম্প্রতি পৃথিবীতে আসিতে গিয়া আর একটু হইলে অমরত্ব প্রায় ঘুচাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহারই ষোড়শোপচার পূজার আয়োজনে আণবিক বোমা না কি একটা বস্তু পৃথিবীর মানুষগুলি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছে তা তিনি জানিতেন না। হঠাৎ সেই বোমাটি ফাটার ফলে কিছুক্ষণের জন্য মহাশূন্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে নানা উৎপাত শুরু হয়—নারদের গতিতেও গণ্ডগোল

ঘটে। তিনি পড়ন্ত এরোপ্লেনের মত তাল পাকাইতে পাকাইতে কোথায় একটা নিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন, অতিকষ্টে দৈব অনুগ্রহে এ যাত্রা সাম্‌লাইয়া লইয়াছেন।

তবে বাঁচিয়া গেলেও নারদ বিরক্ত হইয়াছেন, পৃথিবীতে আসিবার সাধ তাঁহার মিটিয়াছে। এই ক্ষুদ্রকায় জীবগুলি কখন যে কি কাণ্ড করিয়া ফেলিবে তার ঠিক কি! তা ছাড়া ইহাদের একটা ব্যাপারে বড় কৌতুক বোধও করিতেছেন তিনি—কথাটা শ্রীভগবানকে না বলা পর্যন্ত শান্তি নাই। সেইজন্য আজ তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র পার হইয়া, অগণিত জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা ডিঙ্গাইয়া তিনি দ্রুততমগতিতে চলিয়াছেন। কোথায় কোন্ লোক হইতে অপূর্ব সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে, কোথায় কোন্ নক্ষত্র বর্ণনাতীত অপরূপ দ্যুতিতে উদ্‌ভাসিত, সে সবের দিকে আজ ভ্রূক্ষেপও নাই নারদের—লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে সাইকেলারূঢ় সঙ্গীতজ্ঞের গানের কলি যেমন মুহূর্তের জন্য আমাদের কানের কাছে বাজিয়া আবার দূরে মিলাইয়া যায়—তেমনই এসব প্রভাবও আজ নারদের উপর অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। আজ আর কোনদিকে লক্ষ্য নাই। পার্থিব সময়ের হিসাবে মাপা যায় না সেখানকার সময় ও দিনরাত্রি—এমনই একটা অংশে নিরাকার ঈশ্বর লীলাচ্ছলে আকার ধরিয়া উপযুক্ত ভক্তদের দর্শন দেন। ক্ষীরোদ সাগরে অনন্তশয্যায় শয়ান্ মেঘ-নীলবর্ণ পরম-পুরুষরূপেই নারদ তাঁহাকে দেখিতে ভালবাসেন, নারদের ইচ্ছায় সেইরূপেই তিনি প্রকাশিত হন্। আজ নারদ এক মনে তাঁহার সেই রূপটি ধ্যান করিতে করিতেই ছুটিয়াছেন—হাতের বীণাযন্ত্রে মধ্যে মধ্যে ঘা দিয়া ওঙ্কার ধ্বনি সৃষ্টি করিতেছেন—মুখে করিতেছেন স্তব।

অবশেষে এক সময়ে ঈশ্বরের দর্শন মিলিল! নারদের স্তব গান শেষ হইলে শ্রীভগবান প্রসন্ন হাস্যে তাঁহাকে অভয় দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'সংবাদ কি বৎস?'

'সংবাদ একটু আছে বৈকি প্রভু! আচ্ছা, পৃথিবীর কথা মনে আছে আপনার?'

'পৃথিবী ? সেটা আবার কি ?' বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করেন ভগবান।

নারদ আরও বিস্মিত হন—'পৃথিবীর কথা ভুলে গেছেন প্রভু। সেই যে সূর্য বলে একটা নক্ষত্রের চার পাশে ছোট্ট গ্রহটা ঘুরপাক্ খায়। সেই যেখানে কয়েকবার আপনার প্রত্যক্ষ বিভূতি প্রকাশ পেয়েছিল অবতার রূপে ? সেখানকার প্রধান জীব হ'ল মানুষ। তাদের কথা ভুলে গেছেন এরই মধ্যে—তাদের ওপর ত আপনার দয়া একটু বেশীই ছিল প্রভু!'

নারদের কণ্ঠস্বর একটু ক্ষুব্ধ শোনায়। ভগবান আরও মধুর ভাবে হাসেন। বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে—তা সেখানকার কি খবর ?'

কিন্তু নারদের আর সেদিকে মন নাই। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা ঠাকুর, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে ? ঠিক ঠিক জবাব দিতে হবে কিন্তু! যদিও আজ পর্যন্ত আপনার এবং আপনার সৃষ্টির কিছু হদিস পেলুম না, তবু মোটামুটি একটা ধারণা ছিল যে আপনি সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনারই অংশ। তা যদি হয় তা হলে আপনি এদের কথা ভুলে যান কি ক'রে ? ঐ যে মানুষ নামধেয় ক্ষুদ্র জীব—ওরাও ত আপনারই অংশ!'

ঈশ্বর বলিলেন, 'নারদ, একটা উপমা দিই, তা হ'লেই বুঝবে। ঐ যে মানুষের কথা বলছ, ওদের ত ঐটুকু দেহ। ওরই মধ্যে যে রক্তস্রোত বইছে তাতে কত কোটি বীজাণু ঘুরে বেড়ায়, তার খবর রাখো ? তুমি না রাখলেও মানুষ নিজে রাখে, এক রকম যন্ত্রও বানিয়েছে অনুবীক্ষণ ব'লে, তাতে করে দেখতেও পায়। ওরা জানে যে ঐ জীবাণুগুলো প্রতিমুহূর্তে ওদের দেহের মধ্যে বিচরণ করছে; কিন্তু তাই ব'লে কি ওরা সেটা অনুভব করতে পারে, না প্রত্যেকটি বীজাণুকে চিনে রেখেছে ? ওদের দেহের মধ্যে যে আরও অতগুলো জীবিত প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে সে সম্বন্ধে ওরা সচেতনও থাকে না অধিকাংশ সময়ে! তেমনি আমারও এই বিশ্বদেহে পৃথিবী আর তার মানুষ কতটুকু অংশ বলো। ঐ বীজাণুগুলোর চেয়েও ছোট নয় কি ? আমার পক্ষে কি ওদের হিসাব রাখা সব সময়ে সম্ভব ?'

তা বটে! নারদ লজ্জিত হইলেন। কথাটা তাঁহারই ভাবা উচিত ছিল।

শ্রীভগবান্ প্রশ্ন করিলেন, 'সে কথা যাক্ গে—এখন তুমি কী বলতে এসেছিলে তাই বলো। ব্যাপার কি !'

'আর ব্যাপার কি ! ঐ ত ক্ষুদ্র পৃথিবী, আর তার ঐটুকু-টুকু প্রাণী, তারই দাপট্ কি কম ? আপনার ভক্ত নারদের দফা শেষ করে দিয়েছিল আর কি !'

ভগবানও কৌতূহলী হইয়া উঠেন, 'কি রকম, কি রকম ? কী করেছে ওরা ?'

নারদ তখন আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ইতিহাসটা খুলিয়া বলেন। আকাশের বিদ্যুৎ তরঙ্গে গোলযোগ বাধার ফলে কী পর্যন্ত জব্দ হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা শেষ করিয়া কহিলেন, 'কিন্তু এটা বলতেও আমি আসিনি প্রভু। আমি এসেছিলাম একটা মজার কথা বলতে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ বলে একটা দেশ আছে, খুব প্রাচীন দেশ – মানে পৃথিবীতে যতদিন মানুষ জন্মেছে ততদিন থেকেই ওখানে তাদের একদল থাকে। ওখানেই আপনার বিভূতি অবতীর্ণ হয়েছে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী বার।—'

ঈশ্বর বাধা দিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে আছে আমার। বলো—'

নারদ কহিলেন, 'দেশটির মাটি এমন যে ওখানে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার ভাবটা একটু বেশী। ঈশ্বরকে ওরা সবাই মানে, পূজা-আশ্রাও করে। কিন্তু সেইটে কি ভাবে হবে এই নিয়ে ঐ দেশের লোকের মধ্যেই দুটো দল হয়ে গেছে আর তারা তাই নিয়ে অহোরাত্র ঝগড়া বিবাদ করছে।'

'তাই নাকি ?' শ্রীভগবান একটু কৌতুক বোধ করেন, 'আরে তার সঙ্গে ওদের ব্যাবহারিক বা পার্থিব জীবনের সম্পর্ক কি ?'

'তাই কে বলে ! বিবাদ বিসম্বাদ চলছে অনেক দিন ধরেই, সম্প্রতি একেবারে রক্তগঙ্গা বওয়া শুরু হয়েছে। খুন-জখম, অগ্নিকাণ্ড, নারীহরণ, নারীর অপমান—এমন কোন পাপ নেই, ধর্মের নামে যা তারা করছে না।'

'এ কাজগুলো অবশ্য মানুষ আজ নতুন করছে না, ধর্মের নামে খুন-জখমও তারা শুরু করেছে অনেক দিন থেকেই—কিন্তু নারীহরণ-টরণগুলো ঠিক বোধ হয় এতদিন ছিল না। বিশেষ করে ধর্মের নামে—এটা একটু নতুন বটে।'

'সে ভীষণ ব্যাপার ঠাকুর! দেশটা বুঝি যায়। আপনি একটু মন দিন এবারে!'

'তাইত নারদ, ভাবিয়ে তুললে যে! আমার বিশ্বাস ছিল যে ধর্ম এবং ঈশ্বরবাদ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হতে বসেছে ক্রমে—এখনও এই নিয়ে এত কাণ্ড! বলো কি!'

'বলি কি সাধে প্রভু। সব দেশেই ওটা কমেছে ঠিক, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় হয়েছে কাল। সব জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়েছে বোধ হয় ভারতবর্ষেই। ...প্রভু, আপনি একবার যান—আপনি ভক্তবৎসল সবাই জানে, অথচ আপনাকে ডেকে ডেকেই তারা অমন বেঘোরে মরছে, আপনি একটা উপায় করুন!'

ঈশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও—দেখি কি করতে পারি।'

নারদ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মার এক নিমেষে চার যুগ কাটিয়া যায়—ঈশ্বরের এক নিমেষে অমন বহু ব্রহ্মার জীবনান্ত হয়। কিন্তু ভক্তবৎসল ঈশ্বর নারদের সুবিধার জন্য পার্থিব সময়ের হিসাবেই দেখা দেন। সেই অবস্থাতেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন ব্যাপারটা।

হ্যাঁ—দায়িত্ব তাহার একটা আছে বৈ কি! বেচারী মানুষগুলি তাঁহার জন্যই কষ্ট পাইতেছে। তাঁহার বিভূতি পৃথিবীর নানা দেশে স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিয়া নানারূপে প্রকাশ পায়, নানা ভাবে মানুষকে জীবনধর্ম শিক্ষা দেয়। মানুষের পক্ষে কি সম্ভব তাহার মূলটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঈশ্বরের আসল অস্তিত্ব অনুভব করা?

মানুষের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। মানুষের স্বভাব-ধর্ম কৌতূহলও তাঁহাকে পাইয়া বসিল। মন্দ কি, ব্যাপারটা দেখিয়া আসাই যাক না।

সব চেয়ে কৌতূহল হইল তাঁহার সেই মন্দিরগুলি দেখিবার—ভক্ত ভারত-বাসী যেখানে তাঁহাকে পূজা করে, ভক্তি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হয়।

যে কথা সেই কাজ।

ঈশ্বর মানুষেরই দেহ ধারণ করিয়া ভারতবর্ষের একটি বড় শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানুষের দেহ বটে—তবু ইচ্ছামাত্রই তিনি এখানে আসিতে পারিলেন। দেহ ধারণ করিতে হইল এইজন্য যে নহিলে এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার তেজোময় দেহকে সংহত করিয়া আনা অসম্ভব!

ভগবান যেখানে উপস্থিত হইলেন সেটা একটা বড় মন্দির। ঠিক কোন্ সম্প্রদায়ের তাহা বুঝিতে না পারিলেও ভীষণ ভীড় দেখিয়া বুঝিলেন সেটা একটা বড় মন্দির, লোকের কথাবার্তার ভাবে বোঝা গেল যে ভিতরে মূর্তি আছে। মন্দিরের প্রবেশপথে সারি সারি দোকান—কোনটায় বা পূজার ফুল বিক্রী করিতেছে, কোনটায় বা সিঁদুর—বেশীর ভাগই মিষ্টান্নের। রাস্তায় পাণ্ডার দল যাত্রীদের যেন ছিঁড়িয়া খাইতেছে আর তেমনি কি ভিখারীরও উপদ্রব! কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভগবান গলদঘর্ম হইয়া উঠিলেন।

কৌতূহলী হইয়া তিনি একটা দোকানের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। দূর হইতে যেগুলিকে সন্দেশ বলিয়া ভুল হইয়াছিল সেগুলি কাছে আসিতে দেখা গেল, শর্করার ডেলা। ভগবান একটু হাসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ ভাই—এ কি খাবার সব? এদেশে ত শুনেছি ভাল খাবার তৈরি হয়। তবে এমন দশা কেন সন্দেশের?'

দোকানদার বিস্মিত হইয়া তাকাইল, 'ও, আপনি নতুন বুঝি? বাইরের দোকান ভাল খাবার করে তার মানে ওসব যে বাবুরা খায়। এ পূজোর জিনিষ এমনিই হয়। এখানে যা দেব যাত্রীরা তাই নেবে। আর ঠাকুর ত কথা বলে না! হিঃ-হিঃ—'

সিঁন্দুর যাহারা বিক্রয় করিতেছে তাহারা নাকি গাওয়া ঘিতে সিঁদুর গুলিয়া

গিয়েছে। ভগবান একটা খুরি তুলিয়া লইয়াই বুঝিলেন যে গোমাতা এ ঘিয়ের কাছ দিয়াও যান নাই! তূলার বীজ প্রভৃতি হইতে যে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়—এ সেই জিনিসই।

শেষ পর্যন্ত ফুলের মালার দোকান। একগাছি সরু মালা চার আনা। এক জন যাত্রী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'বাজারে যে এর সিকি দর—হ্যাঁ হে? কী বলছ?'

'এটা ত বাজার নয়—' ফুলওয়ালা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, 'মন্দিরে পূজো দিতে এসেছেন এখানে দরদস্তুর কী?'

মালাও কেনা হইল না, ভগবান শুধু হাতেই ভিতরে ঢুকিলেন। একজন পাণ্ডা তাঁহার পিছনে লাগিয়াই আছে, কোনমতেই তাহার হাত এড়াইতে পারেন নাই।

ভিতরে পেষাপেষি ভীড় দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, যাক—আর কিছু না থাক্ অন্তত ভক্তিটা আছে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিল। ভিতরে যাহারা আছে—পূজারীর দল—তাহাদের ভক্তির লেশ মাত্র নাই—তাহারা বোধ হয় ধরিয়াই লইয়াছে যে ভিতরের প্রতিমা এক টুক্‌রা পাথরই শুধু, এটা অর্থ উপার্জনের স্থান ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ভাবেই দেবী মূর্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রীদের কাছ হইতে নানা কৌশলে অর্থ অপহরণ করিতে ব্যস্ত। আর যাহারা আসিয়াছে এত কষ্ট করিয়া, এত প্রতারিত হইয়া পূজা দিতে, তাহাদেরই বা সে ভক্তি, সে প্রীতি কৈ? প্রায় সবাই আসিয়াছে কিছু না কিছু প্রার্থনা করিতে। লোভের চেহারা তাহাদের সকলেরই চোখে মুখে প্রকট। ভগবান বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। যে পাণ্ডাটি সঙ্গে আসিয়াছিল সে ব্যাকুল হইয়া ভীড়ের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল—যাত্রীকে আর দেখিতে পাইল না।

ভগবানকে দেখিবার উপায়ও ছিল না, কারণ তিনি এবার অশরীরী মূর্তি ধারণ করিয়া ছিলেন; পাণ্ডাদের এত টানা-হ্যাঁচ্‌ড়া তাঁহার সহ্য হইবে না।

যাক—সেখান হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আর একটা মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িলেন। এটা আগের মন্দির হইতে কিছু পৃথক ধরনের। ভিতরে দেব-দেবীর মূর্তি নাই। শুধু দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া যাত্রীরা পাশাপাশি বসিয়া উপাসনা করে। যাক্—এটা অন্তত ভক্তির স্থান বটে, ভগবান মনে মনে ভাবিলেন। বাহিরে সে ব্যবসা বা পাণ্ডাদের কচকচি নাই—একটিই মাত্র ফুল ও ধূপের দোকান।

কিন্তু ভিতরে পা দিতেই তিনি অবাক হইয়া গেলেন। মন্দিরের মধ্যে লোক আছে বিস্তর, তবে, মোট তিনটি লোক আছে উপাসনার স্থানে, বাকী সবাই অন্যত্র ব্যস্ত। এক পাশে স্তূপাকার আছে কতকগুলি লাঠি ও লৌহ শিরস্ত্রাণ—যেন যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত। লোকগুলি একস্থানে জড়ো হইয়া দ্রুত অথচ নিম্নকণ্ঠে কি আলোচনা করিতেছে—আর একটু কাছে আসিতে বুঝিলেন রাজনৈতিক আলোচনা। কতকগুলি পুরোহিত শ্রেণীর লোককে তালিম দেওয়া হইতেছে ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে কেমন করিয়া সাধারণ অশিক্ষিত লোককে ক্ষেপাইয়া তুলিতে হইবে। এ সমস্তরই লক্ষ্য অপর সম্প্রদায়ের লোককে জব্দ করা। তাহারা নাকি বহুদিন হইতে ভাল চাকরী, ভাল জমি, ভাল ভাল ব্যবসাগুলি দখল করিয়া বসিয়া আছে—যেমন করিয়াই হউক তাহাদের উচ্ছেদ করিতে হইবে। পুরোহিতদেরও খুব উৎসাহ, যে সব লুঠপাট এবং নারীহরণের চিত্র কল্পনায় অঙ্কিত হইতেছিল তাহাতে তাহাদের দৃষ্টি লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে! লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যেসব উপায় আলোচিত হইতেছে তাহার দুই একটি কথা শুনিয়াই ভগবান শিহরিয়া উঠিলেন। সেখান হইতে তাড়াতাড়ি গিয়া দাঁড়াইলেন উপাসনারত ভক্তদের কাছে—এখানে তবু কিছুটা নিষ্ঠা আছে ত।

কিন্তু সেখানে গিয়াও হতাশ হইলেন। প্রত্যেকেরই তাড়া আছে, মন্ত্রগুলি পড়িয়া লইতেছে দ্রুত কোনমতে কাজ সারিবার জন্য। একজনের কান পড়িয়া আছে পিছনের ষড়যন্ত্রের দিকে, সে সেখানে যাইতে পারিতেছে না বলিয়া

বিরক্ত। আর একজন ভাবিতেছে তাহার কন্যার বিবাহের কথা, তাহার ঠোঁটই নড়িতেছে শুধু, মন্ত্রের দিকে মন নাই আদৌ। টাকা চাই যেমন করিয়াই হউক—ঈশ্বর কি দিবেন? ঈশ্বরকে ডাকিয়া কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। আসলে তাহাকেই যোগাড় করিতে হইবে।...তৃতীয় ভক্তটি নিতান্তই অল্পবয়সী। তাহার ঠোঁটও নড়িতেছে না। সে শুধু অপর দুইজনকে ভাবভঙ্গীতে নকল করিয়া যাইতেছে। আসল কথা, তাহার একটা সরকারী চাকুরী চাই—যিনি চাকুরী দিবার মালিক অর্থাৎ যাঁহাকে সে মুরুব্বি ধরিয়াছে, তিনি রোজ এখানে আসেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকেও এখানে আসিতে হয়।

মুহূর্ত-কয়েক দাঁড়াইয়া ভগবান সেখান হইতেও বাহির হইয়া পড়িলেন। আরও খানিকটা হাঁটিবার পর একটা গলির মোড়ে হৈ-চৈ শুনিয়া তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলেন। কাছে গিয়া দেখিলেন আর কিছু নয়—কী একটা বায়োয়ারী পূজা হইতেছে। স্থানাভাবে রাস্তারই খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া পূজা মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। গলির সমস্ত নোংরা জল যেখান দিয়া যায় এবং পথিকের যেখানে প্রাকৃতিক কার্য সারে সেই নর্দমার উপরেই আলপনা দেওয়া চৌকী পাতিয়া প্রতিমা বসান হইয়াছে। রাস্তার উপয়েই পুরোহিত বসিয়াছেন পূজা করিতে, নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণও সেইখানেই সাজাইতে হইয়াছে। প্রতিমা কী একটা দেবী মূর্তির—পূজাটাও আকস্মিক। কোন একটা রোগ উপলক্ষ্যেই ভয়ে ভয়ে পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। বোধ হয় সেইজন্যই চাঁদা উঠে নাই—উপকরণ ও আয়োজন সামান্য। কোনমতে অল্পদামের কিছু ফল আসিয়াছে, মিষ্টান্নের বদলে বাতাসা। তা হোক্—ভগবান মনে মনে ভাবিলেন, আন্তরিক ইচ্ছাটাই বড় কথা, টাকা ওঠে নাই, বেচারীরা কী করিবে?

কিন্তু একটু পরেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। কর্তারা যেখানে বলিয়া আলোচনা করিতেছেন সেখানে গিয়া দাঁড়াইতে শুনিলেন যে, মণ্ডপসজ্জাতেই কয়েক শত

টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। যাত্রাগানের বায়না দেওয়া হইয়াছে সেটা আজ, কাল পাড়ার ছেলেরা থিয়েটার করিবে; তাহাতেও মোটামুটি খরচা আছে ছাড়া কোন্ এক পল্লীর ব্যায়ামাগারকে টাকা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কসরৎ দেখাইয়া যাইবে—ধর্মকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে শরীর-চর্চার প্রয়োজন। পাড়ার ছেলেদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই ও ব্যবস্থাটা করা হইয়াছে। তা ছাড়া—গত দাঙ্গাতে যে বকাটে ছেলেগুলির জন্য পাড়া বাঁচিয়াছে, যাহারা বেশী শত্রু হত্যা করিয়াছে তাহাদের ভাল করিয়া খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেটা কাল হওয়া চাই, কারণ মদ এবং মাংসের আয়োজন আছে তাহাদের জন্য।

এই সব আলোচনা হইতেছে, একটি ছেলে আসিয়া বলিল, 'ঠাকুর মশাই বলছিলেন যে, তিনখানা কাপড় দরকার তার জায়গায় একখানাও আসেনি, গামছা এসেছে মোটে একটি—কী করে হবে?'

একজন মাতব্বর ধমক্ দিয়া বলিলেন, 'ঐতেই চালিয়ে নিতে বলো। অত আর পেরে উঠছি না। এদিকে কত খরচ এখন মাথার উপর তার খেয়াল আছে? ওঁদের আর কি, খালি আদায়ের ফিকির—'

হতাশ হইয়া ভগবান সে গলি হইতেও বাহির হইয়া পড়িলেন। আরও খানিকটা চলিবার পর দেখিলেন একটা বড় রাস্তার ধারে ভীষণ ভীড়। গাড়ী-ঘোড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কৌতূহলী হইয়া একটু উর্ধ্বে উঠিতেই দেখিলেন যে একটি সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। শোভাযাত্রাটি ধর্মের সহিত জড়িত। বহুদিন পূর্বে তাঁহারই এক বিভূতি কোন্ সুদূর মরুভূমে আবির্ভূত হইয়াছিল নররূপে—তারপর সেই মহামানবেরই সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে যেন যুদ্ধে মারা যায়, তাহারই শোকের স্মৃতিতে এই শোভাযাত্রা। যে ধর্মমত ইহারা মানিয়া চলে, যাহার মহিমা প্রচারে ইহাদের আগ্রহের অন্ত নাই—সে ধর্ম পৌত্তলিক নয়—নিরাকার পরম ব্রহ্মকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়া মনে

করে, সেইজন্য পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর ইহাদের প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ, অথচ কবেকার একটি স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ঘটনাটার অভিনয় হইতে থাকে প্রতিবৎসর, মায় একটা নকল শবাধার পর্যন্ত ইহারা সঙ্গে রাখে। কোন প্রতীক্ উপলক্ষ্য করিয়া ধর্মের অনুষ্ঠানে এত আপত্তি, অথচ কয়েক শতাব্দী পূর্বের সমস্ত প্রতীকগুলিকে ধরিয়া আছে আজও—

শোভাযাত্রাটা শোকের, কিন্তু ভগবান দেখিলেন যাহারা আসিতেছে তাহাদের মধ্যে শোকের চিহ্ন মাত্র নাই। আছে যেটা সেটা একটা বিদ্বেষের। এই উপলক্ষ্যে একশ্রেণীর লোক জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে অপর সম্প্রদায়ের লোকের বিরুদ্ধে। চোখে চোখে জিঘাংসা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে হিংসা। ইহারই মধ্যে কে কাহাকে ইঁট ছুঁড়িবে, কে কাহার পিঠে ছুরি বসাইয়া পুণ্য অর্জন করিবে এবং ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিবে সেই সুযোগ খুঁজিতেছে। তাহারও পিছনে লোভের চেহারাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই লোকগুলি চলিয়া গেলে তাহারা যত প্রকার পার্থিব সুবিধা পাইবে তাহারই কল্পনা এই সদ্যজাগ্রত ধর্মবুদ্ধি ও ঈশ্বরপ্রীতিতে ইন্ধন যোগাইতেছে।

ব্যথিত ঈশ্বর একবার সারা দেশটার উপর তাঁহার দিব্যদৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। সর্বত্রই এই এক ছবি। মানুষ মানুষকে হত্যা করিবার চক্রান্ত করিতেছে তাঁহারই নাম লইয়া। এক সম্প্রদায়ের নেতারা অপর সম্প্রদায়কে শাসাইতেছে ঈশ্বরের দয়ার ভরসায়। কেহ মন্দিরের মধ্যে দেব বিগ্রহের সামনে শপথ করিতেছে অপর ধর্মমতাবলম্বীদের বধ করিবার—কোথাও বা পুরোহিতের দল ধর্মগ্রন্থের উপর হাত রাখিয়া শপথ করাইয়া লইতেছে সেই একই কাজের জন্য। হত্যা, নারীহরণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ—ঘুষ দেওয়া, প্রতারণা করা, যত-কিছু নীচু কাজ সবই চলিতেছে কিন্তু প্রত্যেকটার মধ্যেই তাঁহার নাম আছে। বিচারক ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায় করিতেছেন—বিবেককে সান্ত্বনা দিতেছেন এই বলিয়া যে, তিনি তাঁহার ধর্মের জন্যই এই সব করিতেছেন। শাসকরা তাঁহাদের কর্তব্য ভুলিয়া সিংহাসনে বসিয়াই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন যে তাঁহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই

করিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর বাহির হইতে চাহে না, অন্তিম আকুতি প্রাণপণ চেষ্টায় বাহির হইয়া আসে, 'ভগবান—তুমি কি নেই প্রভু? আর যে পারি না।'

ঈশ্বরের অশরীরী দেহ নিঃশব্দে আবার মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। মেয়েটিকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন—সে আর কেহ নয় চল্লিশকোটি সন্তানের জননী ভারতমাতা!

ভগবান বোধ হয় লজ্জাতেই তাহার কাছে পরিচয় দিলেন না!

# আদিম

তিনটি ছেলেই মারা গেছে, বড় নাতি কজনও নেই—ছিল শুধু শিবরাত্রির সলতে, পৌত্র বলতে এই অম্বরনাথ। চৌদ্দদিন টাইফয়েডে ভুগে সে-ও গেল।

রূপে গুণে—নাতির মত নাতি। এই অম্বরনাথ যখন প্রথম হয় রমাসুন্দরী এক দণ্ডও বুক থেকে নামাতেন না। ছেলেবেলা থেকে বরাবর সব পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আইন পাস করে আইনের কলেজের প্রোফেসর হয়েছিলেন—ওকালতিতেও যথেষ্ট নাম। এ-হেন অম্বরনাথ মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন!

কিন্তু আশ্চর্য এই, রমাসুন্দরী তা বুঝতেও পারলেন না। কান্নার শব্দ যখন প্রবল হয়ে উঠল—বাড়ী থেকে বার করার সময়—বুড়ীর একবার চেতনা এসেছিল আঁধারে—ওরে কে আছিস্ রে ছেলেমেয়েরা, যেন কান্নার শব্দ পাচ্ছি না? কী হয়েছে রে, কাদের বাড়ীতে কাঁদছে?'

বুড়ীর চোখ এবং কান দুই-ই ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

ঝি-চাকরেরা সুদ্ধ কেঁদে আকুল, উত্তর দেবে কে?

কে যেন একটি পাড়ার ছেলে কানের কাছে হেঁকে বললে, 'ও কত্তামা, অম্বরবাবু মারা গেলেন যে, আপনার অম্বরনাথ! বুঝতে পারছেন না?'

বুড়ী অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে শূন্য পানে, তারপর বললে, 'ও, তা হবে।'

অপেক্ষাকৃত নতুন ঝি মঙ্গলা চোখ মুছে বললে আপন মনেই, 'মুখে আগুন! একটার পর একটাকে খাচ্ছেন আর নিজে বসে আছেন অখণ্ড পেরমাই নিয়ে, আকন্দর ডাল মুড়ী দিয়ে। যমেরও অরুচি গো!'

রমাসুন্দরীর যে কত বয়স হয়েছে তা কেউ জানে না। এক শ কিংবা তার বেশি। অন্তত খুব কম নয়। তিন ছেলেই পরিণত বয়সে মারা গেছেন।

নাতিরাও খুব অল্পবয়সে কেউ যায়নি। বিধবা হয়েছেন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি; ভাল ক'রে চলতে পারেন না, ঝুঁকে-পড়ে ভুঁয়ে-মুয়ে হয়ে চলেন মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়ে। চোখে খুব পুরু লেন্সের চশমা দিয়েও দেখতে পান না ভাল, কানে কম শোনেন। স্মৃতি-শক্তি কবেই চলে গেছে—ধারণা বোধশক্তিও গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবু মৃত্যু নেই—বেঁচে আছেন ঠিক, বছরের পর বছর।

তিন ছেলে, সাত পৌত্র, চব্বিশটি প্রপৌত্র—জাজ্বল্যমান সংসার; বিরাট বাড়ী—ঝি-চাকরে আত্মীয়-স্বজনে গম্ গম করছে। রমাসুন্দরী তাদের সবাইকে চেনেনও না—চিনতে চেষ্টাও করেন না। আজ বলে নয়—অনেকদিন থেকেই দোতালায় সিঁড়ির পাশের ঘরটি আগলে, পুরোনো আমলের একটা লোহার সিন্দুকে ঠেস দিয়ে বসে বসে দন্তহীন মাড়ি দুটো পাক্‌লান আপন মনেই। কারুর পায়ের শব্দ পেলে শুধু মুখ তুলে দৃষ্টিহীন চোখ দুটো যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে বলেন, 'হ্যাঁরে—এই, কে যাচ্ছিস্, রে? ছোট বৌ?' (একুশ বছর আগে সে মারা গেছে)…'হ্যাঁরে আজ ভাত দিলিনি আমাকে? খেতে দিবি কখন লো?…কেউ আমাকে খেতে দেয় না! আমার কথা কারুর খেয়ালই থাকে না!'

খাওয়ার পরমুহূর্তেই ভুলে যান—এবং অনুযোগ করেন যে কেউ খেতে দিচ্ছে না। তবে অনুযোগটা খুব প্রবল হয় না। সত্যি সত্যিই কোন দিন ভাত দিতে দেরি হ'লে গুণ গুণ ক'রে কাঁদেন আপন মনে, 'ওগো তুমি কোথায় গেলে গো, তোমার ছেলেদের হাতে পড়ে আমার কী হাল হচ্ছে গো! একটিবার দেখে যাও গো! আমাকে এরা দু পায়ে থ্যাত্‌লাচ্ছে—' ইত্যাদি।

কেউ হয়ত ঘরে ঢুক্‌ল—দমকা হাওয়ার মত, কোন ছেলেমেয়ে। বিশেষ ক'রে বিজয়ার দিন সবাই একবার ক'রে আসে মাথা ঠুক্‌তে। পায়ে হাত দিলেই খপ্ ক'রে তার হাতটা ধরে ফেলে প্রশ্ন করেন, 'ওরে এই, তুই কে রে? কার ছেলে রে?'

'ও কর্তা-মা—আমি, আমি তোমার হীরুর ছেলে!'

'হীরু ? কে হীরু রে ? কাদের হীরু ?'

"এই মরেছে ! হীরু, হীরু—তোমার নাতি হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার।'

'ও, হীরু। হীরু আমার নাতি, না ? তুই তার ছেলে ? বেশ বেশ। ওরে, তুই কে রে ?'

'আমি দীপু, তোমার বেবির মেয়ে। তোমার নাৎনী নলিনীর মেয়ে বেবি !'

'ও, তা হবে। অত মনে থাকে না। তোর মা বেঁচে আছে ?'

'ওমা, সে কি অলুক্ষুণে কথা। বেঁচে থাকবে না কেন ?'

'তা কৈ, সে এল না ?'

'এই ত এসেছিল—এইমাত্র।'

'কে জানে বাপু, মনে থাকে না।'

বুড়ী আবার বসে বসে মাড়ি পাকলায় আর ঝিমোয়।

এই ভাবেই দিনরাত্রি কাটে বুড়ীর—সব দিনই সমান ওর কাছে।

অম্বরনাথের মৃত্যুসংবাদটা ঠিক বুঝতে না পারলেও রমাসুন্দরী তাঁর শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। শ্রাদ্ধের আগের দিন ভিয়ান বসতেই তিনি যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন, 'হ্যাঁ রে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসছে কাদের বাড়ী থেকে লা ? হ্যাঁ রে অ ছোটবৌ…এই ছেলেমেয়েরা ?'

কেউ সাড়া দেয় না। বুড়ীর ঘরে সাধারণত কেউ ঢোকেও না—কথার উত্তরও দেয় না।

রমাসুন্দরী উঠে দোর গোড়ায় আসেন, হেঁট হয়ে লাঠি ধরে ধরে, 'ওরে অ খুকী, কে যাচ্ছিস্ রে—'

'কেন কত্তা-মা ?' বছর দশেক বয়সের একটি ফুটফুটে খুকী এসে কাছে দাঁড়ায়।

'পান্তুয়া ভাজা হচ্ছে কাদের বাড়ী লা ?'

'আমাদের বাড়ী—আবার কাদের বাড়ী।'

'আমাদের বাড়ী ? কেন রে ?'

'লোকজন খাবে।'

'অ—তা আমাকে দিলি না তোরা ?'

'দাঁড়াও—সবে ত তৈরী হচ্ছে ! লোকজন কাল খাবে।'

মঙ্গলা নিচে থেকেই শুনতে পেয়ে যেন দাঁত কিড়মিড় করে।

'হ্যাঁ, তা খাবে না ! মুখে আগুন তোমার। নাতির ছেরাদ্দের মিষ্টি খাবার জন্যে নোলা সক্‌সক্ করছে একেবারে !'

রমাসুন্দরী আপনমনেই বিড় বিড় ক'রে কি বকেন।

আরও খানিকটা পরে আবার ডাকেন, 'ক্ষুদী অ ক্ষুদী—ক্ষুদী কোথা গেলি রে ?'

'ঐ লাও !' পুরানো চাকর রঘু বলে ওঠে, 'হাসব কি কাঁদব, ভেবে পাই না। এখানে ওর ক্ষুদী কোথায় বলো ত, সে শ্বশুরবাড়ী বসে বিষম খাবে।'

ক্ষুদী হ'ল আসলে অম্বরনাথেরই বোন। পাতিয়ালায় থাকে সে। তার আসা সম্ভব হয়নি। এসেছে তার বড় ছেলে রাঘব।

'ও রাঘব, যাও না বুড়ীর কাছে—তোমার মাকেই ডাকছে।'

কুড়ি একুশ বছরের পাতলা ছিপ্‌ছিপে ছেলে রাঘব সিঁড়ি বেয়ে তর তর ক'রে ওপরে উঠে আসে, 'কী হয়েছে, ও বুড়ী ?'

'তুই কে রে ? কার ছেলে ?'

'আমি ক্ষুদীর ছেলে।'

'আ মরণ ! ক্ষুদীর আবার ছেলে হ'ল কবে ?'

বুড়ী আবারও বিড় বিড় করে, 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা ! চালাকি !'

বিরক্ত হয়ে রাঘব চলে যায়। বুড়ী কাঁদে গুণ গুণ ক'রে।

অনেক রাত্রে কার বুঝি দয়া হয়। বলে, 'আহা দাও, দাও, দিয়ে এস। ওরই ত সব—ছেলেপুলে নাতিনাতনী, ওরই ত সংসার। দিয়ে এসো দুটো মিষ্টি—'

পূর্ণিমা—অম্বরনাথেরই ভাইঝি, একটা পাতায় ক'রে ছুটো পান্তুয়া, ছুটো দরবেশ আর একটা সন্দেশ এনে সামনে দিয়ে বলে, 'এই নাও বুড়ী, আর ঘ্যান ঘ্যান্ করতে হবে না। খাও।'

বুড়ী হাৎড়ে হাৎড়ে মিষ্টিগুলো অনুভব করে, 'হ্যাঁ রে; এত মিষ্টি কোথা থেকে এল রে ?…'

অর্থাৎ ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে সব ব্যাপারটা।

'অত খোঁজে দরকার কি। পেয়েছ, গেলো।…আবার হিসেবটুকু চাই ষোল আনা।'

অনেক রাত অবধি বুড়ী মিষ্টিগুলো খায় পাক্‌লে পাক্‌লে।

পরের দিন আবার সচেতন হয়ে ওঠে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। হালুই-করদের রান্নার গন্ধে একটা বিশেষত্ব আছে—সে স্মৃতি বুড়ীর মাথা থেকে মুছে যায়নি একেবারে। বাতাস সোঁকে আর বলে—'হ্যাঁ রে কিসের যজ্ঞি রে তোদের বাড়ী ? অ মেজ বৌ, কার বিয়ে ? হ্যাঁরে অ ছেলেমেয়েরা, শোন্‌না, এদিকে—'

ওদিকে শ্রাদ্ধ শুরু হয়েছে, কোন্ বিখ্যাত কীর্তনিয়ায় দল এসেছে গাইতে। এদিকে রান্না চলছে দ্রুত, দুপুর থেকেই কিছু কিছু লোক খাবে। সবাই ব্যস্ত। বুড়ীর সঙ্গে বকবে কে ?

কেউই যখন উত্তর দিলে না তখন বুড়ী নিজেই হাৎড়ে হাৎড়ে সিঁড়ির কাছে এল, পা দিয়ে দিয়ে সিঁড়ির ধাপ অনুভব ক'রে বসে বসে নামতে লাগল, এক ধাপ এক ধাপ ক'রে—

প্রায় যখন মাঝামাঝি এসে পৌঁচেছে তখন কে যেন দেখতে পেলে, 'এই ছাখো, মরেছে! বুড়ী কোথা চলল। হাঁ-হাঁ, করো কি, অ কত্তা-মা। কোথা যাচ্ছ ?'

'কিসের যজ্ঞি হচ্ছে তাই দেখতে যাচ্ছি। আমাকে কেউ কিছু বলে

না, জানায় না।······আমি কি এ বাড়ীর কেউ নই? আমাকে এত অচ্ছেদ্দা কেন?'

বুড়ী রাগে পরিশ্রমে কাঁপে থর থর ক'রে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমাকে দেবে খেতে, খাবার তৈরি হ'লেই। তুমি চলো এখন ওপরে। পড়ে মরবে যে! বুড়ো বয়সে হাত পা ভাঙলে কে তোমাকে দেখবে।'

'কিসের যজ্জি আগে বল্।'

'শ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধ!···হ'লো?'

'কার শ্রাদ্ধ?'

'তোমার নাতি অমু বাবুর।'

'আমার নাতি? আমার নাতিরা সব মরে গেছে।' সহজকণ্ঠেই বলে বুড়ী।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাইত। মরে গেছে বলেই ত শ্রাদ্ধ। তুমি এখন ওপরে চলো।'

কোনমতে ধরে ধরে ওপরে নিয়ে আসে—একরকম জোর করেই।

বুড়ীর পাশের ঘরটাই অপেক্ষাকৃত খালি ছিল, সেই ঘরে মিষ্টির ভাঁড়ার করা হয়েছিল। সন্দেশ দরবেশ পান্তুয়া ছানার জিলিপী আর খাস্তার কচুরী ভাজিয়ে এইখানে রাখা হয়েছিল। তরকারী লুচি সব নিচে। সুতরাং এ ঘরে লোকজনের আনাগোনা কম।

বুড়ী হাৎড়ে হাৎড়ে দোরের কাছে এসে ডাকে, 'ওখানে বসে কে রে?'

'তার বেলা ত চোখ খুব সাফ!' এবাড়ীর এক নাত্‌জামাই দেবেশবাবুকে দেওয়া হয়েছিল এ ঘরের ভাঁড়ার আগ্‌লাবার ভার, তিনি গল্প করার লোকাভাবে একটা হাল্‌কা চেয়ার টেনে বারান্দায় বসে বসে সিগারেট টানছিলেন, এখন তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে কাছে এলেন, 'অ কত্তা-মা, কী বলছিলেন?'

'কে রে তুই?'

'আমি দেবেশ। নলিনীর বর।'

দেবেশের আব্ছা সাদা মূর্তিটার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে খানিকটা চেয়ে থেকে বুড়ী বললে, 'অ। তা এখানে কি?'

'এই যে ভাঁড়ার আগ্লাচ্ছি।'

'কিসের ভাঁড়ার?'

'মিষ্টির ভাঁড়ার। পান্তুয়া সন্দেশ খাস্তার কচুরী সব আছে এখানে। খাবেন দু'টো?'

দৃষ্টিহীন চক্ষুই যেন জ্বলে ওঠে লুব্ধ আগ্রহে, 'দে না দুটো রে। খাস্তার কচুরী দু-খানা দে।'

দেবেশবাবুর করুণা হয়। খান-দুই কচুরী এনে দেন হাতে।

'আর দুখানা দে বাবা। দে দে, তোর ভাল হবে।'

'কত খাবে, বুড়ী? মরবে যে!' তবু আর দুখানা দেন তিনি।

আঁচলে ক'রে কচুরীগুলো নিয়ে গিয়ে বুড়ী কোথায় রেখে আসে।

'হ্যাঁ গো অ ছেলে, আছ ওখানে?'

দেবেশবাবুর সাদা ঝাপ্সা মূর্তিটা আর দেখা যায় না। দেবেশবাবু তখন পান খাবার অছিলায় নিচে নেমে গেছেন। ভবানীপুর থেকে সম্পর্কে তাঁর মাস্তুতো শালীর দল এসেছে—রূপসী ও বিদুষী, তাদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে করতে খেয়ালই ছিল না তাঁর ভাঁড়ারের কথা। অনেকক্ষণ পরে কে একজন এসে মনে করিয়ে দিতে তিনি তাড়াতাড়ি ওপরে এসে দেখেন বুড়ী বারান্দায় বসে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে—

'কী হ'ল, কী হ'ল—অ কত্তা-মা?'

অপরাধী কাছেই ছিল, ততক্ষণে আরও জন-কতক এসে জড়ো হয়েছে। ছেলেরা পরিবেশন করার জন্য ওপর নিচে করছে দ্রুত, সেই সময়ে বুঝি বুড়ী সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, একটি ছেলে নেমে আসতে গিয়ে হঠাৎ সামনে পড়ায় নিজেকে সামলাতে পারে নি, ধাক্কা লেগে বুড়ী ছিট্‌কে পড়ে গেছে।

'কোথাও লেগেছে নাকি ?' দেবেশবাবু প্রশ্ন করেন চেঁচিয়ে।

'লেগেছে না ছাই ! ওর রাগটাই বেশি।' একটি ছোক্‌রা বলে উঠল।

'আঁমাকেঁ খুঁন্ ক'রে ফেঁলেছে এঁকেবারে !' বুড়ী নাকে কাঁদতে কাঁদতে বলে।

'আচ্ছা, আচ্ছা আমি ওকে শাসন করে দিচ্ছি, আপনি এখন ঘরে চলুন।'

দেবেশবাবু একরকম পাঁজাকোলা ক'রে তুলে ঘরে দিয়ে আসেন বুড়ীকে।

হয়ত সত্যিই কোথাও লেগেছিল। কারণ বুড়ী সারারাত গ্যাঙালে। কিন্তু সেদিন আর তার দিকে মন দেবে কে ? পরের দিন কে একজন দেখে বললে, 'কর্তা-মার জ্বর হয়েছে যে।'

'মরুকগে ! বুড়ীদের জ্বর হয়ই।'

দুপুরবেলা ঠাকুর খাবার দিতে এসে দেখলে জ্বরে অচৈতন্য। তখন কর্তাদের কানে গেল। বিকেল নাগাদ ডাক্তারও এল। ডাক্তার বললেন, 'হাড়টাড় ভেঙেছে বলে ত বুঝতে পারছি না—তেমন ত কোথাও ফুলে নেই। এক্স-রে করলে—তাই বা কোথায় করব ?'

এমনি সাধারণ ওষুধ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

পরের দিন থেকে পেট ছাড়ল। অর্থাৎ বোঝা গেল যে এইবার সময় আসন্ন। তারও পরের দিন শ্বাস ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর জ্ঞান ফিরে এল, ঘোলা চোখ মেলে যেন কাকে খুঁজে অতিকষ্টে বললে, 'অমু, অম্বরনাথ !'

'কাকে ডাকছেন কত্তা-মা ?' একটি বধূ মুখ নামিয়ে প্রশ্ন করলে।

'আমার নাতি অমু, সে কোথা গেল ?'

'তিনি যে মারা গেছেন কত্তা-মা, তাঁরই শ্রাদ্ধ হয়ে গেল যে !'

'মারা গেছে ? তোরা ত আমাকে বলিস্ নি ! আহা !'

একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুড়ী ক্লান্তিতে চোখ বুজল আবার।

'কত্তা-মা, অ কত্তা-মা !'

সবাই ডাকাডাকি করতে লাগল। রমাসুন্দরী কিন্তু আর চোখ খুললেন না। শুধু দুই চোখের কোল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে ঠোঁট দুটো নড়তে সবাই কান পেতে শুনলে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেন তিনি, 'কচুরী।'

'কিসের কচুরী কত্তা-মা? কচুরী খাবেন?'

আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। একটু পরে শেষ একবার ঠোঁট নড়ল, 'নাম শোনা।'

গঙ্গাজলও কে একজন দিলে। কানের কাছে জোরে জোরে নাম শোনাতে লাগল। তারই মধ্যে একসময়ে মুখটা ফাঁক হয়ে গেল, গলার কাছে শ্বাসটা ধুক্ ধুক্ করছিল, সেটা গেল বন্ধ হয়ে।

এতদিনে ছুটি হ'ল বুড়ীর।

বুড়ী মরবার পর রঘু ঘর ধুতে এসে আবিষ্কার করলে সিন্দুকের নিচে, ঠাকুরের ছবি-রাখা চৌকীর তলায় একরাশ খাস্তার কচুরী। দু খানা নয়, চার খানা নয়,—অন্তত ত্রিশ বত্রিশ খানা। অর্থাৎ দেবেশবাবু যখন নিচে ছিলেন তখন বুড়ী চুরি ক'রে ক'রে এনে রেখেছে। সেই সময়েই, বোধ হয় কেউ এসে পড়বে কিনা তারই খোঁজ করতে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে ছেলেটির সঙ্গে।

'মরণ! বুড়ো বয়স অব্দি নোলা ছ্যাখো দিকি!'

'বলিস্নি রঘু! বুড়ো হ'লে বোধ হয় তোরও অমনি হবে।' কে একজন ধমক দিয়ে উঠল।

# মহাপ্রয়াণ

ঘটনাটা খুবই শোকাবহ, তাতে সন্দেহ নেই। রায় বাহাদুর কৃষ্ণকালী বসুর বড় ছেলে মণি হঠাৎ দিন-পাঁচেকের বাতজ্বরে মারা গেল।

ছেলের মত ছেলে মণি। দেখতে ত খুবই সুপুরুষ, এই মাত্র বছর দুই আগে ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে পাশ করে মোটা মাইনের সরকারী চাকরীতে ঢুকেছে। এমন ছেলে অথচ একটু অহঙ্কার নেই, তাকে নিয়ে তার বাপ-মায়ের অহঙ্কারের অবধি ছিল না, কিন্তু মণি নিজে সকলের সঙ্গে সহজে মিশত। তার মুখের মিষ্টি হাসি যে একবার দেখেছে, আর কখনও ভুলবে না। মণির নিজের বিশেষ বিদ্যা ছাড়াও পড়াশুনো ছিল সব দিকেই—সেজন্য অধ্যাপক থেকে শুরু করে অনেক বিশিষ্ট লোকই তাকে সমীহ করতেন। পাড়ার ছেলেদের কাছে ত সে দেবতা, সব ব্যাপারেই ওকে তারা দলপতি করে কাজ করত, ও ছিল তাদের পাণ্ডা। মণিদাকে নিয়ে তাদের গর্বের শেষ ছিল না; আর এত রকম প্রতিষ্ঠানও মণি গড়েছিল! এত খাটতেও পারত! ওর মা প্রায়ই লোকের কাছে বলতেন, 'একটা ত মোটে মাথা, এতগুলো কথা মণি মনে রাখে কি করে তাই ভাবি।'

শুধু ঘরের কোণে বসে পড়াশুনোই করেনি। খেলাধুলো ব্যায়ামেও সে কম যেত না কারুর চেয়ে। সেজন্য তার দেহটিও ছিল সুন্দর—লোকের ঈর্ষা করার মত। সেই মণির এমন অকস্মাৎ মৃত্যু হবে, তা কে ভেবেছিল। তাও বাতজ্বরে!

কথাটা অবিশ্বাস্য। বড় বড় ডাক্তার ডাকবারও অবসর পাওয়া গেল না। শোকের প্রথম বিহ্বলতা কাটলে রায় বাহাদুর বার বার সেই কথা বলেই কাঁদতে লাগলেন, 'ওরা আমাকে বললে না কেন একবার যে, রোগটা এত সীরিয়স্‌...... আমি বিধান রায়কে ডাকতে পারতুম, ডেনহাম হোয়াইট্‌ আমার পার্সোনাল ফ্রেণ্ড, তাকে টেলিগ্রাম করতুম যে এয়ারে এসে দেখে যেত দার্জিলিং থেকে।

আমি বড় হোমিওপ্যাথও কাউকে ডাকতে পারতুম। আমার আবার ডাক্তারের অভাব! আমার নাম শুনলে যাকে ডাকা হ'ত সেই আস্‌ত।......এ যে আমি কিছু বুঝতেই পারলুম না। হায়, হায়—ছেলেটাকে বেঘোরে হারালুম!...... এ আমার কী হল!... ...আমায় কেবল ওরা বুঝোলো যে ও কিছু নয়, সেরে যাবে!'......

রায় বাহাদুরের ভাই চুণীবাবুও বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'হয়ত বাছা বাঁচত না, পরমায়ু ছিল না, যেতই—তবে এতটা আফসোস ত থাকত না। বোম্বের সমস্ত বড় বড় ডাক্তার আমার ফ্রেণ্ড—আমি সব ক'জনকে এনে হাজির করতে পারতুম।... . এ তোমরা কী করলে দাদা?'

সত্যিই চুণীবাবু বোম্বের মস্ত বড় ব্যবসায়ী, তাঁর প্রতিপত্তি কত। এই ছেলেটি ছিল তাঁরও নয়নের মণি। আর রায় বাহাদুরের ত কথাই নেই। গভর্ণমেণ্টের অত বড় পদস্থ কর্মচারী—মিনিস্টাররা পর্যন্ত তাঁকে খাতির করেন। সমস্ত বাঙলা দেশটা বলতে গেলে ওঁর হাতের মুঠোয়। তাঁরই একমাত্র ছেলে মারা গেল মাত্র দুজন সাধারণ এম-বি ডাক্তারের হাতে—এর চেয়ে অদৃষ্টের পরিহাস আর কী হতে পারে!

পাড়ার লোক বলতে লাগল, 'উচিত কিরণ ডাক্তারকে জেলে দেওয়া!'

'ওদের দফা সারা হয়ে গেল—চিরদিনের মত।' একজন বললেন।

কিন্তু তাতে কি আর মণি ফিরবে?

মণি মারা গেল রাত নটার সময়। কথাটা বিশ্বাস করতে এবং শোকের প্রচণ্ডতা কাটতে কাটতে রাত বারোটা বাজল। এবার আসল কথাটা না পাড়লেই নয়। পাড়ার লোকেরা উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। শেষে প্রবীণ গোছের একজন এগিয়ে গিয়ে মণির বড়মামা হিতেনবাবুকে ধরলেন, 'হিতেনবাবু...... শোক যতই হোক্‌—এধারেও কর্তব্যের ত্রুটি হতে দেওয়া ত চলতে পারে না। যদি অনুমতি করেন ত—'

মাথায় হাত দিয়ে একপাশে বজ্রাহতের মত বসে ছিলেন হিতেনবাবু, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন মুখ তুলে।

'য়্যাঁ?'

'বলছি, তাহলে এবার উয্যুগ, আয়োজন ত করতে হয়—'

হিতেনবাবু অসহায়ভাবে ভগ্নীপতির মুখের দিকে চেয়ে ডাকলেন, 'কেষ্ট—'

কান্নায়-ভাঙা গলায় রায় বাহাদুর বললেন, 'কি বলছ হিতু?'

'এঁরা বলছিলেন—'

'হ্যাঁ—এঁরা কী বলছিলেন?' আচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন করেন রায় বাহাদুর।

'এঁরা বলছিলেন যে, এবার তাহ'লে—মানে—যদি ···এদিকেও ত প্রস্তুত হতে হয়।'

'না না', আকুলভাবে যেন আর্তনাদ করে ওঠেন রায় বাহাদুর, 'ওরে বাপ্ রে এই অন্ধকার রাত্রে বাবাকে আমার কোথায় পাঠাবো!···না না হিতু, মণি আমার ভয় পাবে যে! সকাল হোক্।'

তারপর একটু কান্নার বেগ কমলে আবার বল্লেন, 'তা ছাড়া, খোকা ছিল, এ পাড়ার রাজা, আন্‌ক্রাউন্‌ড্ কিং, রাজার যোগ্য সমারোহে ওকে পাঠাতে হবে ভাই!'

অগত্যা সবাই চুপ করে গেলেন। স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে রায় বাহাদুর ডাকলেন 'মন্মথ!—ওরে কে আছিস রে?'

রোরুদ্যমান দু তিনটি চাকর এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। দাদাবাবুকে তারা ভালবাসত।

'ওরে এসেছিস্, মন্মথ, আমার সিগারেটের কৌটোটা ছ্যাখ্ ত—আর দেশলাইটা।'

মন্মথ সিগারেটের কৌটোটা এনে হাতে দিতে রায় বাহাদুর অদ্ভুত একটা হাসি হাসলেন, পাগলের মত।

'কাঁদছিস তোরা? কাঁদ্ কাঁদ্। ছ্যাখ্ যদি তোদের কান্নায় তোদের

দাদাবাবু ফেরে আবার। নিষ্ঠুর সে, বাপ-মায়ের কান্নায় তার মন ভিজল না। ওহো, বাপ্‌রে!'

সিগারেট ধরাতে হাত কাঁপে থর্ থর্ করে। তবু সিগারেট ধরিয়েই একটু যেন সুস্থ হ'লেন রায় বাহাদুর। কাকে যেন কৌটো আর দেশলাইটা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন হিতেনবাবুর কাছে দিতে—

রাত্রে নিয়ে যাওয়া হবে না শুনে একে একে পাড়ার লোকেরা অনেকেই বাড়ী চলে গেল। দু একজন, যারা রায় বাহাদুরের একটু বেশি অনুগত, তারা এদিক ওদিক মুড়িসুড়ি দিয়ে বসল। কেউ লাইব্রেরীতে, কেউ বারান্দায়, দু একজন মৃতের ঘরের পাশের ঘরটায়—যে যেখানে পারলে আশ্রয় নিলে। আত্মীয়রাও অনেকে এসে পড়েছেন। মেয়েরা এই দুঃসহ শোকের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াতে বাধ্য হয়েছেন—তবে শোবার জায়গা দেওয়া যায় নি। যেখানে-সেখানে পড়ে আছে।

ক্রমশ আরও রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দ স্তিমিত হয়ে এল। শুধু মণির মায়ের একটানা গোঙানির মত শব্দ শোনা যেতে লাগল। মণির বৌ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তার জ্ঞান হয়েছে বটে কিন্তু সে কাঁদেনি—স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে বসে আছে। সবে বেচারীর এক বছর বিয়ে হয়েছে, তায় অন্তঃসত্ত্বা।

একে একে ঘুমিয়েও পড়ল দু-একজন করে।

সিঁড়ির মুখে কোণের রেলিংটাতে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন হিতেনবাবু। অসহ শোকের ক্লান্তির মধ্যে একটু ঢুলুনি শুরু হয়েছে তাঁর। মধ্যে মধ্যে চম্‌কে তন্দ্রা ভেঙে গিয়ে কথাটা যখনই মনে পড়ছে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন—'ওরে বাপ্‌রে!'

শুধু ঘুম নেই রায় বাহাদুরের। কত কী কথা মনে পড়ছে তাঁর। ছোট বড় কত কি স্মৃতি। শৈশব থেকে এতকাল পর্যন্ত মণির বড় হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস। তাঁর পক্ষে ঘুমোনো সম্ভব নয়।

মণির মায়ের গোঙানি থেমে এসেছে। শুধু ওরই মধ্যে এক একবার নতুন করে কেঁদে উঠছেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—তারই শব্দে ঘরের অন্য আত্মীয়দের তন্দ্রার আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে সম্বিৎ ফিরে আসছে। তারা সশব্দে একবার করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

পাশের ঘরে কার নাক-ডাকার শব্দ শুরু হ'ল।

চুণীবাবু বোধ হয়। কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বল্‌তে-গেলে-মৃতের-ঘরেই নাক ডাকার শব্দটা অনেকেরই অশোভন লাগ্‌ল—কিন্তু পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সকলে চুপ করে গেল। কারণ কে ওঁকে গিয়ে ডাকবে? কীই বা বলবে? প্রত্যেকেই আশা করতে লাগল অপর কেউ গিয়ে কর্তব্যটা সমাধা করবে—ফলে কারুর দ্বারাই হয়ে উঠল না।

চুণীবাবুর ঘুম গাঢ়তর হয়ে উঠল।

শেষরাত্রে আবার দু-একজন করে পাড়ার লোক এসে জড়ো হ'ল। দূরস্থিত আত্মীয়রাও আসতে লাগলেন এক এক করে। আবার নতুন করে কান্নার রোল উঠল। নিয়ে যাবার সময় আসন্ন বুঝে মা আছাড়িপিছাড়ি করতে লাগলেন। বৌমার ফিট্ শুরু হ'ল মুহুর্মুহু।

চুণীবাবু গাঢ় নিদ্রা থেকে উঠে এসে সামনেই প্রথম দেখলেন ওঁর এক ভাগ্নী-জামাইকে, অকস্মাৎ তার গলাটা জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন, 'এ তোরা কী করলি ভাই সুরেন? তোরা থাকতে বাবা আমার বেঘোরে মারা গেল!'

সুরেন মুখখানাকে যথেষ্ট করুণ করবার চেষ্টা করে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এ সময়ে চোখে জলটা আসা উচিত ছিল কি-না, অন্তত তার কাছে কেউ আশা করে কি না, ঠিক বুঝতে না পেরে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

পুরানো ঠাকুর বৃন্দাবন বড়লোকের বাড়ী দীর্ঘদিন আছে—ইতোপূর্বে আরও বড়লোকের বাড়ী নাকি ছিল সে—একটা বিজলী উনুন জেলে জল চড়িয়ে দিলে।

শশী ঝি অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলে, 'এই সাত-সকালে গরম জল কি হবে ঠাকুরদা? ছেলেমেয়েদের ত এখনও ঘুমই ভাঙেনি।'

ঠাকুর গম্ভীর মুখে শুধু জবাব দিলে, 'চা হবে, চা।'

'চা?' শশী অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

চা তৈরি হ'লে মন্মথ একটা বড় ট্রেতে করে আট দশটা ধূমায়িত কাপ সাজিয়ে সামনে এনে ধরলে।

চা!—!

সবাই বিস্মিত হ'ল। বোধ হয়, একটু অপ্রতিভও।

চা খাওয়া উচিত হবে কি এ সময়ে? এই মুহূর্তে?

এই প্রশ্নটাই জাগে সকলের মনে। কিন্তু সেটা তখন এত প্রয়োজন, এত লোভনীয় যে কেউই একেবারে অস্বীকার করতে পারলে না। সকলেই ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিতে লাগল অপরকে, 'ওঁকে আগে দাও।'

অর্থাৎ দু চারজন আগে নিক—নইলে চা খাওয়া এ সময়ে শোভন হবে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেউই কিন্তু এ কথা বলে না যে 'আমি খাবো না।' প্রত্যেকেরই ঐ কথাটা উহ্য রইল—আগে ওঁর হোক তারপর আমাকে দিও।

মন্মথও বহুদিনের খানসামা। সে বার তিন চার ঘুরে আর কাউকেই ট্রে থেকে কাপ তুলে নিতে বললে না—নিজেই এক এক কাপ প্রত্যেকের সামনে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। কেউই প্রতিবাদ করলে না। শুধু অপেক্ষা করতে লাগল, একজন আগে তুলে নিলেই নেওয়াটা সহজ ও শোভন হয়।

প্রথমে নিলেন চুণীবাবু। তারপর হিতুবাবু। তারপর সকলেই। পাড়ার বৃদ্ধ দ্বিজুবাবু একবার যেন অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'এখনও অবশ্য ছুঁৎ লাগেনি। তা ছাড়া—তা ছাড়া পানকে বোধ হয় দোষ নেই—' তিনিও তুলে নিলেন চায়ের কাপ।

রায় বাহাদুর নিজেও।

চায়ের পর্ব শেষ হতে হতে রোদ উঠে গেল। রায় বাহাদুরের আশ্রিত মামাতো ভাই অজিত ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসেছে। সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে কখন বাইরে গিয়েছিল—এখন এক রিক্সা করে সাধারণ একটা দড়ির খাটিয়া এনে হাজির।

রায় বাহাদুর তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে বসে ছিলেন একটা ঈজি চেয়ারে—সোজা হয়ে। খাটিয়া রাখার শব্দে চোখ খুলে দেখেই যেন জ্বলে উঠলেন, 'একি !······এ কে আনলে ? অজিত ?······দূর হয়ে যাও, এখুনি, এই মুহূর্তে। যাও, বেরিয়ে যাও বলছি !'

'আহা কেষ্ট, অত অধীর হয়ো না, ছিঃ !'

সামনে এগিয়ে এলেন হিতুবাবু, 'অজিত, তোমার বুদ্ধির দোষেই চিরকাল তুমি বকুনি খাও। খেটেও মরো অথচ কারুর কাছে তোমার আদর নেই—শুধু এই জন্যে !······এই খাটিয়া তুমি এনেছ মণির জন্য !'

রায় বাহাদুর স্থরেনের দিকে ফিরে বললেন, 'বাবা স্থরেন, যাও ত, একটা ভাল বোম্বাই খাট······উহু-হু, বাবা আমার রে !'

কথা শেষ করতে পারলেন না রায় বাহাদুর, আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলেন।

স্থরেন তৎক্ষণাৎ বললে, 'হ্যাঁ এই যে মামাবাবু, দোকান খুলুক, এই ত সবে সাতটা।'

তারপর একটুখানি মাথা চুল্‌কে হিতুবাবুকে বললে, 'আচ্ছা, তার চেয়ে যে খাটখানাতে মণি বিয়ের আগে শুত······মানে এখন যেটা ঐ ঘরে আছে, ঐটেই—'

হিতুবাবু একটু যেন বিপন্ন হয়ে মুখ তুলে রায় বাহাদুরের দিকে তাকালেন রায় বাহাদুর ঈষৎ ইতস্তত করে বললেন, 'ওটা আসল বার্মা টিকের খাট····অর্ডার দিয়ে করানো······তা ছাড়া খুলে বার করা সেও ত একটা হাঙ্গামা।'

চুণীবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'তা ছাড়া, ও ত ভারী হবে—দু'চার জনে নিতে পারবে না।'

'তার জন্যে কিছু ক্ষতি নেই। আমার মণিকে নিয়ে যাবার লোকের অভাব হবে না।...কিন্তু'—বাধা দিয়ে বলে ওঠেন রায় বাহাদুর, 'এতকাল মণি শুয়েছে ও খাটে, ওটাতে তার কত স্পর্শ লেগে আছে ...না হিতু, ও খাট প্রাণ ধরে দিতে পারব না। তা ছাড়া, বৌমাই বা কি মনে করবেন?......সুরেন, তুমি অন্য খাট আনিয়ে নাও।'

খাট পৌঁছবার পর বুকফাটা কান্না এবং আকুলতার মধ্যে অতি কষ্টে দেহ বার করে এনে বাইরে শোওয়ানো হ'ল।

'ওরে, কে আছিস্, মণি..... মণিকে আমার সাজিয়ে দে তোরা—'

'হ্যাঁ মামাবাবু, সে ব্যবস্থা হয়েছে।' সুরেনের স্ত্রী রত্না তাড়াতাড়ি চন্দনের বাটি হাতে এগিয়ে এল। একটা লবঙ্গ দিয়ে সযত্নে সে চন্দন পরিয়ে দিলে মণির কপালে। তারপর একটা নতুন দেশী ধুতি পরিয়ে দামী শাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল বুক থেকে পা পর্যন্ত।

এইবার ফুল।

এঁরাও ফুল এনেছিলেন যথেষ্ট কিন্তু তার বোধ করি প্রয়োজন ছিল না। পাড়ার বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল মনি, কোনটার সেক্রেটারী, কোনটার ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট। তারা সকলেই ফুল কিনে এনেছে। এ বাজারে ফুল শেষ হতে, কেউ ছুটেছে নিউ মার্কেটে—কেউ বা বৌবাজারে।

প্রথমেই এলেন পাড়ার শিশু-মিলনীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিসেস্ চৌধুরী।

অকস্মাৎ শোকার্ত বাড়ীর আব্‌হাওয়াকে চমকে দিয়ে বাইরে থেকে আওয়াজ এল, 'য়্যাবাউট্ টার্ন', ফর্ম টু, ঠিক আছে, মালতী তুমি এগিয়ে এস, রেবা মালতীর জায়গায় যাও। নাউ, মার্চ স্লো। মনে থাকে যেন অত্যন্ত

করুণ তোমাদের কর্তব্য আজ, কেউ কথা কইবে না, কেউ অন্য কোন দিকে চাইবে না—দুজন দুজন করে এগিয়ে যাও।'

মার্চ করে এল মেয়েরা, উঠান ভরে দালান সুদ্ধ লাইন দিয়ে দাঁড়াল। মুখ তাদের পাথরের মত ভাবলেশহীন, কেউ কোন দিকে চাইছে না। সত্যিই বাহাদুরী আছে মিসেস চৌধুরীর—ঐটুকু ছেলেমেয়েদের তিনি মিলিটারী ড্রিলের লৌহ-স্বভাব দিতে পেরেছেন। প্রথম দুজন মেয়ের হাতে ছিল দুটি 'রিদ্', তারা ইঙ্গিত পেয়ে এগিয়ে এসে মৃতদেহের ওপর সযত্নে ও সসম্ভ্রমে সে দুটি রেখে দিলে।

তারপর মিসেস্ চৌধুরী মৃতদেহের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করলেন······'হে ঈশ্বর, অত্যন্ত অসময়ে তুমি আমাদের কাছ থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতিকে কেড়ে নিলে। জানি না এতে তোমার কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। নিশ্চয়ই কোন মঙ্গলের জন্যই এ কাজ করেছ। তাই আজ আমরা বৃথা শোক করব না। শুধু তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁর আত্মা শান্তি পায়, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার সান্ত্বনা লাভ করতে পারে।'

ওঁর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা অস্ফুট কণ্ঠে সেই প্রার্থনা আউড়ে গেল। তারপর মিসেস চৌধুরীর ইঙ্গিতে ওরা আবার য়্যাবাউট টার্ন নিয়ে মার্চ করে বেরিয়ে গেল। মিসেস চৌধুরী নিজে আর একটু রইলেন। এবার তিনি একটা সাদা রুমাল বুকের কাছ থেকে বার করে দুই চোখের কোণ অত্যন্ত সন্তর্পণে স্পর্শ করলেন।

রায় ব্যহাদুর অভিভূত ক্লান্ত কণ্ঠে একবার 'ও হো হো' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁরে কেউ মধুবাবুকে খবর দিয়েছে? তিনি না আমাদের আবার দোষারোপ করেন—'

মধুবাবু এক বিখ্যাত দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টার।

চুণীবাবু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ দাদা, আমি সব ফোন করে দিয়েছি। এ-পি-আইকেও একটা ফোন করে দিয়েছি যদি ওরা কোন রিপোর্টার পাঠাতে চায়।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'এ পাড়ায় কালান্তরের কে একজন রিপোর্টার আছেন না?'

'তিনি বাড়ী নেই। বড় মুশকিল হয়ে পড়েছে। দু বার লোক পাঠিয়েছি—'

'থাক্। থাক্। অত ব্যস্ত হবার কি আছে। আমাদের শুধু কর্তব্য পালন করা। বরং ভাল বোঝ একটা চিঠি লিখে কাউকে পাঠিয়ে দাও, বাড়িতে এলেই যাতে চিঠিটা পায়—'

'আচ্ছা দাদা, এখনই পাঠাচ্ছি।'

ইতিমধ্যে মৃতদেহকে নিয়ে সামান্য একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পাড়ার 'আর-ডবলু-এ-সি'র ছেলেরা কোথা থেকে কয়েকটি বড় পদ্মফুল এনেছিল। সেগুলি ওর মাথার বালিশের ওপর দিয়ে, মাথা ঘিরে দুই কাঁধ পর্যন্ত সযত্নে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে ফুটন্ত পদ্মের মাঝখানে সেরা পদ্মটি নিমীলিত হয়ে রয়েছে। এ ঘটনা কিছুক্ষণ পূর্বের। এখন মণির সম্বন্ধীরা দুটি উৎকৃষ্ট রজনীগন্ধার গোড়ে মালা এনেছে, তারা চায় মাথার ওপর দিয়ে মালাটা বুক পর্যন্ত লম্বা করে দিতে—সব ফুলের ওপর।

ছেলেরা বলছে, 'দেখুন, পদ্মফুলগুলোর ভাল এফেক্ট হয়েছে, ওর ওপর দিয়ে মালা দুটো দিলে সব ফুল ঢেকে যাবে। তার চেয়ে দুটো মালা বুকের ওপর পাশাপাশি মেলে সাজিয়ে দিন।'

বড় সম্বন্ধী বঙ্কিম একটু উষ্ণভাবেই বললে, 'তাই কখনও সম্ভব! মালা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে না দিলে মালা দেওয়ার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া দেখুন, ও আমাদের ভগ্নীপতি, আমাদের এই মালা দেওয়ার একটা বিশেষ সিগ্‌নিফিকেন্‌স্ রয়েছে যে!'

'উনি আপনাদের আত্মীয় হতে পারেন, কিন্তু উনি ছিলেন আমাদের

প্রতিষ্ঠানের প্রাণ; আমরা ছিলুম ওঁর দিন-রাতের সহচর। আমাদের দাবী কারুর চেয়ে কম, এ আমরা মানব না।' একটি ছেলে বলে উঠল।

এগিয়ে এলেন মিসেস্ চৌধুরী। তিনি মধুর করুণ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, ছেলেরা কিন্তু ঠিকই বলেছে! পদ্মফুলের একটা বিশেষ এফেক্ট হয়েছে, সেটা নষ্ট করা কি ঠিক হবে? তার চেয়ে মাথার ওপর দিয়ে যদি দিতেই চান ত বরং মালা দিয়ে তার ওপর পদ্মফুলগুলো আবার রি-য়্যারেঞ্জ করতে হয়।'

'না না, তাহলে মালা দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা। আচ্ছা, আমরা মালা খুলে গলায় দুপাশ দিয়ে গুঁজে দিচ্ছি, যাতে মনে হয় গলায় পরা আছে।'

খুশী হয়ে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'তাই করুন। হ্যাঁ, পদ্ম, রিদ্ এগুলোর এফেক্ট আলাদা কিনা। দেখুন, কাইগুলি মালা দেওয়া হলে আর একটা কাজ যদি করেন—ঐ রিদ্ দুটো চাপা পড়ে গেছে, যদি তুলে আবার পায়ের কাছে সাজিয়ে দেন!···হ্যাঁ—ঐ, ঠিক হয়েছে। রিদ্‌ই এখানে বিশেষ উপযোগী কিনা। ওটার—'

রায় বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, 'কৈ মধুবাবু ত এলেন না? সুরেন, বাবা, এমনি জনা-দুই ফটোগ্রাফার ডেকে আনো। আমাদের কর্তব্য ত করতে হবে। গোটাকতক ব্লক করিয়ে কাগজে কাগজে—। এর পর না আমাদের কেউ দোষে।'

সুরেন বললে, 'এখানে অনেকেরই ক্যামেরা রয়েছে মামাবাবু, সাজানো কমপ্লিট্ হলেই ওরা ছবি নেবে।

'তা হোক। সে ওঁরা নিতে চান নিন। কিন্তু প্রোফেশন্যাল দু-একজন আনা দরকার। যদি এঁদের ছবি শেষ অবধি না ওঠে। হাজার হোক্, এমেচার ত! উই কান্‌ট্ টেক্ দি রিস্ক্।'

প্রোফেশন্যাল ফটোগ্রাফার এলেন, আরও অনেকে ছবি নিলেন। ইতিমধ্যে মধুবাবুও এসে হাজির। সকলে সসম্ভ্রমে সম্বর্ধনা করে নিয়ে এলেন তাঁকে। চুণীবাবু তাঁকে দেখেই 'মধু ভাই, কী দেখতে এলি আর—সব শেষ যে ভাই' বলে

কেঁদে উঠলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার ফটোগ্রাফার আনোনি ?'

একটু ইতস্তত করে মধুবাবু চুপি চুপি বললেন, 'না।—আজকাল ওরা যেখানে সেখানে ফটোগ্রাফার পাঠাতে চায় না দাদা। কাগজে স্পেস্ কম।'

চুণীবাবু রেগে আগুন হয়ে বললেন, 'এটা যেখানে-সেখানে হ'ল! জানো, অন্তত সাতটা প্রতিষ্ঠানের ও এগজিকিউটিভ বডির মেম্বার ছিল ?'

'ঠিক আছে দাদা, ছবি ত উঠেছে······আমি সে ব্যবস্থা করে দেব—'

একজন ফটোগ্রাফার বললেন, চুণীবাবু, যদি কিছু মনে না করেন······ বৌমাকে একবার এনে পায়ের কাছে বসিয়ে দিলে—'

কে একজন বলে উঠলেন, 'আ ছি ছি! তাঁকে কেন আবার এমন নাটকীয় ভাবে টানাটানি কর; বেচারা একে কাতর—'

'না না। তাতে কি হয়েছে। তিনি ত আসবেনই। ঠিক বলেছেন আপনি। শেষ ফটোগ্রাফ দুজনে···ওরে ও রত্না—' চুণীবাবু ব্যস্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

বৌমাকে কোনমতে ধরে এনে বসানো হ'ল। সে বেচারী কিন্তু এসে মৃতদেহ দেখেই আছড়ে পড়ল, মণির দু'পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে উঠতে লাগল।

ফটোগ্রাফার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'কৈ, ছবি নিলেন না ?'

'এখন—মানে, এভাবে ত ছবি হয় না। একটু সামলে নিন্—মুখ তুলে না বসলে এফেক্টটা ভাল হবে না যে! উনি মুখ ঢেকে থাকলে আর কী হ'ল!'

রায় বাহাদুর নিজেই এগিয়ে এলেন, 'ওমা—মাগো, একবার তোর মুখখানি তোল্ ত মা, ওদের কাজটা ওরা করুক। মা রে—'

বিহ্বলের মত সে বেচারী মুখ তুললে।

হিতুবাবু কাকে যেন ডেকে বললেন, 'রত্নাকে বল, ওর মুখখানা একটু মণির

মুখের দিকে ফিরিয়ে দিক। যেন একদৃষ্টে ও মণির মুখের দিকে চেয়ে আছে—বুঝতে পারলে না ?'

ছবি তোলার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বঙ্কিম ছুটে এসে বোনের মুখের ওপর থেকে এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিলে।

'আহা হা, সরালেন কেন, এফেক্টটা ত ওতে ভালই হচ্ছিল !' মধুবাবু বললেন।

'উহুঁ, সে রকম এলোমেলো এখনও আছে। ওটা যা সরিয়ে দিলুম, ওতে একেবারে মুখ ঢেকে যাচ্ছিল যে !'

ছবি তোলার পর মহাযাত্রার পালা।

আর একপ্রস্থ কান্না ও আকুলতা।

এরই মধ্যে এক বৃদ্ধ এসে বললেন, 'একটু প্রার্থনা করব হিতুবাবু। ইচ্ছে হচ্ছে একটু করি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ ত !'

সে ভদ্রলোক ব্রাহ্ম ! তিনি নিজের মত প্রার্থনা করতে শুরু করলেন ; কিন্তু দু-এক লাইন বলবার পরই দেখা গেল, তিনি ঠিক প্রার্থনা করছেন না—ছোটখাটো বক্তৃতা দিচ্ছেন। তার মধ্যে মণি তাঁকে কি রকম ভালবাসত এবং মান্য করত, সেই কথাই বেশি।

রায় বাহাদুর হিতুবাবুকে ডেকে বললেন, 'আমাদের মহামহোপাধ্যায়কে ডেকে আনবে নাকি, একটু স্বস্তিবাচন করতেন ?'

'ঠিক। এখনই যাচ্ছি।'

মহামহোপাধ্যায় এলেন কিছু বিলম্বে। তাঁর স্বস্তিবাচন শেষ হ'তে হ'তে বেলা এগারটা বাজল।

হিতুবাবু বললেন, 'এই পাড়াটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে ত ?'

রায় বাহাদুর বললেন, 'হ্যাঁ—আর যদি সম্ভব হয় ত ত্রিকোণ পার্কের দিক দিয়ে ঘুরে—ওরা সবাই ত ভালবাসত ওকে !'

ছেলেরা একটু মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে একজন বললে, 'তার আর দরকার কি হবে জ্যেঠামশাই, দু'পাড়া ত ভেঙে পড়েছে। সবাই ত উপস্থিত।'

'তা বটে! যা তোমরা ভাল বোঝ বাবা।'

বঙ্কিম এগিয়ে এসে চুপি চুপি চুণীবাবুকে বললে, 'হাতে হীরের আংটিটা রইল কিন্তু কাকাবাবু, মিনে-করাটা না হয় থাক্—'তারপরই যেন একটু অপ্রতিভ ভাবে ম্লান হেসে বললে, 'এখনও এ সব কথা চিন্তা করতে হচ্ছে এইটেই সবচেয়ে দুঃখের কথা; কিন্তু এসব ত এখন—শিখুর পেটে যেটা আছে তার—নাবালকের জিনিসের জন্যে জবাবদিহি ত করতে হবে আমাদের—'

চুণীবাবু শেষের কথাটায় একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'ঘ্যাখো, তোমরা ত যাচ্ছো—শ্মশানে গিয়ে খুলে নিয়ো না হয়—এখানে এখন ওসব করতে গেলে বিশ্রী দেখাবে না?'

'তা ত বটেই। না, তাই বলছিলুম। কর্তব্যে ত্রুটি হ'লে ত চলবে না!'

ততক্ষণ মৃতদেহ গলিতে বেরিয়েছে, মিসেস্ চৌধুরী শোভাযাত্রা ঠিক করে সাজিয়ে দিচ্ছেন। আগে পাড়ার ব্যাণ্ডপার্টি যাবে, তারপর ওঁর শিশু-মিলনীর ছেলেমেয়েরা (তারা এতক্ষণ ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে ছিল সার বেঁধে—সুতরাং ওদের দাবী অগ্রগণ্য), তারপর 'আর-ডবলিউ-এ-সি'র দল, তারপর মৃতদেহ, তারপর অন্যান্য ক্লাব, সব শেষে আত্মীয়রা এবং তারও পিছনে কীর্তনের দল।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

শোভাযাত্রার ব্যাগপাইপের সুর এবং কীর্তনের ধ্বনি ক্রমশ মিলিয়ে গেল—দূর থেকে দূরান্তরে। বাড়ীর কান্নার আওয়াজও একটু একটু করে স্তিমিত হয়ে এল। শুধু মা'র একটা একটানা গোঙানি এবং শিখরিণীর অব্যক্ত অস্ফুট একটা কাতর শব্দ শোনা যেতে লাগল শোকাহত বাড়িটার ক্লান্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

# একটি গল্প

আমাদের পাশের দোতালা বড বাড়ীটা যে কোন কালে ভাড়া হবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, প্রথমত বাড়ীটা প্রকাণ্ড—দ্বিতীয়ত, যেমন অন্ধকার তেমনি হাওয়া-বাতাসহীন। যিনি প্ল্যান করেছিলেন তাঁর ঘরের সংখ্যার দিকেই দৃষ্টি ছিল, আলো বাতাস নিয়ে তত মাথা ঘামাননি।

সুতরাং অকস্মাৎ বাড়ীটায় মিস্ত্রী লাগতে দেখে কৌতূহল হল—দু পা এগিয়ে গিয়ে দেখি পাড়ার ডাক্তার ভূপতি রায় স্বয়ং দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটাচ্ছেন।

'ব্যাপার কি ডাক্তার বাবু, বাড়ীটা কিনলেন নাকি?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি। খোঁচাও ছিল একটু। ভূপতি বাবু যদিচ অনেক দিন বসেছেন এখানে —খুব পশার জমেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

'না ভাই—সে বরাত কি করেছি। ভাড়া নিলুম।'

'ভাড়া? এত বড বাড়ী—?'

'হ্যাঁ! শ্বশুর মশাই এসেছেন যে বর্মা থেকে। ভাগ্যিস্ উনি আগেই জাহাজ পেয়েছিলেন, এখন ত বোমার হিড়িক বুঝতেই পারছেন—আসা সম্ভব হ'ত না। উনি যেন আগে থাকতে জান্‌তে পেরেই রিটায়ার করেছিলেন।'

'তাহ'লে ত কিছু দিন হ'ল এসেছেন। এত দিন ছিলেন কোথায়?'

'ছিলেন প্রথম একটা হোটেলে—তখনও মালপত্র সব এসে পৌঁছয়নি। একরাশ টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে হোটেলে রইলেন সাত মাস, তার পর সাহেব পাড়ায় বাড়ী নিয়েছিলেন, এখন কলকাতাতেও যা ঘন ঘন সাইরেন বাজছে, আর থাকতে সাহস হচ্ছে না, এইবার নজর পড়েছে সহরতলীর দিকে। বুঝলেন না?'

বুঝলুম বৈ কি! ওঁর শ্বশুর প্রকাণ্ড বড়লোক, রায় বাহাদুর খেতাব আছে। ওখানে তিন চারটে বিলাতী ফার্মের ডাক্তার ছিলেন—সব জড়িয়ে মাইনে পেতেন প্রায় আড়াই হাজার টাকা। এ ছাড়া একটা ডিস্‌পেনসারীও ছিল—

তাতে ওষুধ বেচেও অনেক টাকা পেতেন। কাঠের কারবারও নাকি ছিল কিছু। এ সব কথা আমরা ডাক্তার বাবুর কাছে বহু বার শুনেছি, যেটা ওঁর মুখে শুনিনি, অন্যত্র অর্থাৎ মেয়ে-মহলে শুনেছি, সেটা হচ্ছে এই যে ভদ্রলোকের দুটি পরিবার—একটি বার্মিজ গৃহিণী ছিল, তাঁরই সাহায্যে ওখানে অত কাজ-কারবার জমাতে পেরেছিলেন। তাঁর জন্য বাংলা দেশে ফেরবার ইচ্ছা থাকলেও এতদিন আসতে পারেননি। এখন সৌভাগ্যক্রমে তিনি ঠিক সময় বুঝে গত হয়েছেন, ফলে যুদ্ধের হিড়িক আসবার আগেই কারবার সব বিক্রী করে জাল গুটিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে এখানে ফিরতে পেরেছেন এবং এখানেও কী একটা তুটো বিলিতী ফার্মে রেঙ্গুনের নজীর দেখিয়ে কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন।

'এত বড় বাড়ী তাঁর লাগবে?', একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করি।

'না। মানে আমিও এসে থাকব কি না।···রায় বাহাদুরের বড় ইচ্ছা। বিশেষ ক'রে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বিষম জেদ করছেন।'

'ঘরজামাই?' একটু হেসে প্রশ্ন করি।

'বাই নো মিন্স্। আমি আমার সেপারেট এষ্টাব্লিশমেন্ট্ মেন্‌টেন করব। শুধু একত্র থাকা, এই যা—এত বড় বাড়ী, ঘরের ত অভাব নেই। তবে হয়ত বাড়ীভাড়াটা লাগবে না আমার।'

আরও অনেক কিছুই লাগবে না তা জানি। তবুও বলি, 'আপনার বাবা? তিনিও কি এখানে—'

'ন্‌না। তিনি আপাতত আমার ছোট ভায়ের ওখানে থাকবেন—সোদপুরে—'

এই পর্যন্ত। দিন সাতেক পরে ভূপতি বাবুই আগে এসে উঠলেন এ-বাড়ী, তার পর দেখি এক দিন মহা হৈ-চৈ ক'রে রায় বাহাদুর এসে পড়লেন। সাত-আটখানা লরী ক'রে শুধু মালই এল—খাট-আলমারী-আয়না-ডেস্ক-চেয়ার-

টেবিল-লোহার সিন্দুক, আরও কত কি! তার পর এলেন মানুষ। যেমন রায় বাহাদুর তেমনি তাঁর স্ত্রী। যেমন মোটা তেমনি লম্বা—দশাসই মানুষ। রায় বাহাদুরের রংটা তবু চলনসই, গৃহিণী একেবারে আবলুস কাঠ। ভূপতি বাবুর স্ত্রী মা'র রংই পেয়েছেন বোঝা গেল! ঐ রংয়ের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল ভূপতি বাবুকে দশটি হাজার টাকা। ভদ্রমহিলাকে বাধ্য হয়েই বামিজ্ঞ সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়েছিল। উপায় কি? ঐ চেহারায় বলবার কিছু নেই।

সে যাই হোক্—দিন কতক আমাদের পাড়াসুদ্ধ লোকের খোরাক জুটল। যে যখনই সময় পায় রাস্তা থেকে হোক্ নিজেদের বাড়ী থেকে হোক্ ঐদিকে তাকিয়ে থাকে, আর সন্ধ্যার পর আমাদেরই রকে একত্র হয়ে কত দূর কি লক্ষ্য করলে, তারই হিসাব মেলায়। দেখা গেল ভদ্রলোকের আরও একটি মেয়ে আছে—সেও মা'র ধাঁচে গেছে, অমনি আবলুস কাঠ। সে মেয়েটিও সধবা, তবে তার স্বামী বোধ হয় ঘর করে না কিম্বা কোন বিদেশে আছে—মানে জামাইয়ের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। তবে বোধ হয় তার অবস্থা ভাল—শাড়ী ও গহনার বাহার ভূপতি বাবুর স্ত্রীর চেয়ে তার ঢের বেশি।

রায় বাহাদুরের সন্তান বলতে এই দুটি মেয়ে, এরাই এক দিন সব সম্পত্তির মালিক হবে। সে জন্য আদরও বেশি! তবে ভূপতি বাবুর স্ত্রী প্রিয়বালা এত কাল চোখের আড়ালে ছিল বলে অতটা আদায় করতে পারেনি, যতটা তার দিদি রাজবালা করেছে। এর জন্য, মেয়ে মহলে শুনেছি প্রিয়বালার মনোভাব দিদি ও মা সম্বন্ধে খুব প্রসন্ন নয়। এখানে চোখের সামনে আসাতে আর একটি জিনিস যা লক্ষ্য করলুম তা হচ্ছে এই—রাজবালার তিনটি ছেলে-মেয়েও আদর-আবদার ঢের বেশি পেয়েছে দিদিমা'র কাছে, তাদের যা সব পোষাক, তার যে কোন একটির দামে আমাদের বাড়ীসুদ্ধ ছেলেমেয়ের ব্যবস্থা হয়।

প্রিয়বালার ছেলে-মেয়েরা প্রথম প্রথম ঈর্ষিত নেত্রে তাকাত তাদের দিকে

—দিন কতক পরে দেখলুম দিদিমা'র টন্‌ক নড়েছে—তাদের জন্যও নতুন নতুন পোষাক আমদানী হ'তে লাগল।

ভূপতি বাবু বেচারা বাঁচলেন এবার। সেই কথাই আমরা আলোচনা করি, যা পশার ওঁর, তাতে সংসার চালানো কষ্টকরই ছিল! বলা বাহুল্য, ওঁর 'সেপারেট এষ্টাব্লিশমেন্টের' কোন চিহ্নও কোথাও দেখতে পেলাম না।

রায় বাহাদুরের ঐশ্বর্যের চমক্‌টা আমাদের এই শহরতলীর কেরাণীপ্রধান পাড়ায় বেশ একটু আলোড়নের সৃষ্টি করলে। ঝি চাকর ঠাকুর আয়া—বড়লোকের যেগুলি অবশ্য পালনীয় সেগুলি সবই আছে। বাজারের সেরা মাছ যায় ওঁদের বাড়ী। গ্যারেজের অভাবে নাকি গাড়ী কিনতে পারছেন না, তবে যখনই উনি বেরোন না কেন ট্যাক্সী ছাড়া এক পা-ও নড়েন না। প্রত্যহ চাকরী করতে যান সে জন্য একটা ট্যাক্সীর সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত করা আছে। জমি ও বাড়ীর দালালরাও হাঁটাহাঁটি করছে, কিন্তু এই যুদ্ধের ফলাফলটা না দেখে উনি নাকি মনস্থির করতে পারছেন না!

তা হোক্—রায় বাহাদুরের যে সম্পদ আমাদের মনে সব চেয়ে ঈর্ষার সৃষ্টি করলে তা কিন্তু ওঁর পুরানো চাকর হারান। এমন বিশ্বাসী এবং কর্মঠ ভৃত্য যে এ বাজারে পাওয়া যায়, তা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। বহু দিনের চাকর নিশ্চয়ই, কারণ এক কর্তা এবং গিন্নীই তাকে নাম ধরে ডাকে আর সবাই বলে হারানদা। ডাক্তার বাবুও বলেন হারানদা, ছেলে-মেয়েরাও বলে হারানদা। অনেক দিনের চাকরকে লোকে দাদাই বলে—এঁরা যে এখনও সে ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন তা দেখে আমাদের ভালই লাগত।

ক্ষয়া-ঘষা এক রত্তি মানুষ। রং এককালে ফর্সাই ছিল, এখন সেটা পুড়ে তামাটে হয়ে উঠেছে। বয়স কত তা অনুমান করবার উপায় নেই। মাথার চুল পাকেনি বটে তবে এত পাৎলা হয়ে গেছে যে হারানদা কোথাও বেরোবার আগে জলে ভিজিয়ে সযত্নে সেগুলি পেটো পেড়ে আঁচড়ে নেয়; তবু মাথার চামড়া

সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে না! গায়ের চামড়া শিথিল হয়নি কিন্তু এমন কুঁচকে গেছে—কতকটা পার্চমেণ্ট কাগজের মত প্রাণহীন ও শুকনো মনে হয়। আধ-ময়লা খাটো কাপড়, আর ছেঁড়া গেঞ্জি—এখানে যতদিন এসেছে তত দিনই দেখছি ঐ এক বেশ—কেবল সাড়ে দশটায় যখন পোষ্টাফিসে যায় ডাক আনতে কিংবা ভূপতি বাবুর কোন প্রয়োজন থাকলে ওঁর বালিগঞ্জের চেম্বারে ভাত পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়, তখন সেই ময়লা কাপড়েরই কোঁচাটা কোমর থেকে খুলে কোঁচা দেয় এবং একটা ছিটের সার্ট কোথা থেকে বার ক'রে পরে। অর্থাৎ বেশ সেজেগুজেই যায়। তবে জুতোর বালাই নেই—না রাজবেশে না রাখালবেশে।

কিন্তু খাটুনিটা কি সাধারণ খাটে!

আমাদের পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে ওদের বাড়ীর অনেকখানিই দেখা যেত এবং যেহেতু সেই ঘরটিই আমার, সেই হেতু অনেক সময় অনিচ্ছাতেও অনেক কিছু দেখতে হ'ত। দেখতুম—ভোরবেলা কেউ চোখ খোলবার আগেই হারানকে উঠে উনুনে আঁচ দিতে হ'ত। অন্য যে চাকরটি ছিল তাকে ডেকে তুলতে গেলে মিনিট দশেক কসরৎ করতে হয়—কাজেই উনুনে আঁচ দেবার ফাঁকে ফাঁকে তাকে ডাকা চলত। তার পর সে যেত দুধ আনতে, হারান তখন ঠাকুরের দোরে গিয়ে ঘা দেবে। ঠাকুর উঠে প্রাতঃকৃত্য করতে যাবেন—ততক্ষণে হাওয়া দিয়ে উনুন ধরাবার কাজও হারানের। উনুন ধরলে চায়ের জল বসানো—কর্তা, গিন্নী, দুই মেয়ে, জামাই—এঁদের চাই 'বেড-টি', সে চা ক'রে ওকেই দিয়ে আসতে হ'ত ঘরে ঘরে। এইবার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতেন ঠাকুর মশাই। তিনি যতক্ষণে দুধ চাপিয়ে ছেলেদের দুধ গরম করতেন ততক্ষণে হারানকে পাঁউরুটি কেটে, বিস্কুটের টিন খুলে মাখন সংগ্রহ করে রাখতে হবে। ছেলে-মেয়েদের টোষ্ট বিস্কুট সন্দেশ দুধ খাওয়ানো সে এক পর্ব। সে ভারটি সম্পূর্ণ হারানের। কাউকে ধমক দিয়ে, কাউকে বাপু-বাছা ক'রে, কাউকে বাঁশী কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে। অমন ক'রে নাকি হারানের মত কেউ খাওয়াতে পারে না—ওদের মায়েরাও না। তাই সে কাজ শুধু ওরই।

এর পর—যেদিন ঝি এসে জুটল সেদিন সে-ই জলখাবারের জোগাড় দিলে ঠাকুরকে, নইলে সেটাও হারানের ডিউটি। কোন দিন লুচি-আলুভাজা, কোন দিন হালুয়া-বেগুনি, কোন দিন বা সিঙ্গাড়া-পুডিং। এই সব পর্ব চুকলে এক পেয়ালা চা অদৃষ্টে জুটল ত ভালই ( সেটা জুটলে অবশ্য হারানের পেয়ালায় সানায় না, কলাইয়ের প্রকাণ্ড মগ আছে—সেই মগে ক'রে চাই ওর)—নইলে সে মায়াও ত্যাগ ক'রে বাজারে ছুটতে হয়। এই বাজার যাবার পথে চণ্টুর দোকানে বসে একটা বিড়ি খাওয়া—এইটুক্ ছিল ওর বিলাস বলুন, অবসর বলুন সব। চণ্টু ঐ বিড়িটি বিনামূল্যে দিত—বড় খদ্দেরের চাকর বলে, নইলে নাকি বাড়ীতে বিড়ি খাবার হুকুম নেই, গিন্নীর মাথা ধরে।

বাজার—তাও ফরমাস বিশেষে একবার কি দু'বার যেতে হবে। দু'হাতে দু'থলি নিয়ে এলেই যেদিন কাজ চলত, সেদিন ঐ একবারেই বেচারার পরিত্রাণ, নইলে আবার ছুটতে হ'ত একবার। বাজার গেল ত মুদিখানার প্রয়োজন। তারপর এটা-ওটা ফাইফরমাশ। 'হারান একবার এইটে টেলিফোনে বলে এস ত।' 'হারান একবার ধোপার বাড়ী যাও দিকি, কী করলে মাগি দশ দিন কাপড় নিয়ে গিয়ে—দেখে এসো দিকি।' কিংবা ভূপতিবাবুর 'হারানদা কাল ডাইং ক্লিনিং থেকে আমার পোষাকটা এনে রাখোনি ? যাও, যাও—এখুনি বেরোতে হবে।' নয় ত 'হারানদা, দর্জি কি বললে কাল ? যাওনি ?···একটা কাজ যদি মনে ক'রে করবে। যাও খোঁজ নাও গে—' এ ছাড়া ছেলেরা ত আছেই— 'হারানদা পেন্সিল ?' 'হারানদা আমার কাগজ ?'···এই সব করতে করতেই ন'টা বাজবে। তখন ছেলেমেয়েদের স্নান করানো ভাত খাওয়ানোর পালা। ওরা কেউই নাকি হারানদা ছাড়া কারুর হাতে বাগ মানে না।

সে পর্ব শেষ করতে করতে দশটা বাজে তখন যেতে হয় ডাকঘরে। সেখান থেকে ফিরে কর্তার খুচরো ফরমাস থাকে! বালিগঞ্জ-কসবা—ছুটোছুটি। কয়লা ঘুটে প্রভৃতি সংসারের বাজে ব্যাপারে নজর রাখারও তাঁর এই অবসর।

একেবারে বারোটা নাগাদ কর্তা বেরিয়ে গেলে ঠাকুরের মনে পড়ে যায় হারানকে জলখাবার দেওয়া প্রয়োজন—'ও হারানদা, আজ কি জলখাবার খেতে হবে না?'

ভোরের সেই ঠাণ্ডা লুচি কিংবা হালুয়া। কোন দিন তাও থাকে না—হারান মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে এসে নিজেই প্রশ্ন করে, 'আজ কিছু রাখোনি? ঠাকুর মশাই?'

'না হারানদা। আজ সব ফুরিয়ে গেছে।' কিম্বা হয়ত বলে, 'একদম ভুলে গিয়েছি।'

'তা এক কাজ করো। খানকতক আলুভাজা দাও দিকি, আর এক বাটি মুড়ি।'

রান্নাঘরেই উবু হয়ে বসে সেই জলখাবার খাওয়া হয়। তারপর কর্তা-গিন্নী সকলের খাওয়া হয়ে গেলে ওর স্নানের ছুটি মেলে। স্নান শেষ ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢাকা খুলে ভাত খেতে হয়। এর পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম অবশ্য মেলে। সেই সময়টা হারান এসে বসে কোনদিন আমাদের রকে—নয় ত চণ্টুর দোকানে একটা বিড়ি খেতে খেতে ঝিমোয় একটু—

তারপর গিন্নীর বাজার করার দরকার থাকলে সঙ্গে কলকাতা ভবানীপুর যেতে হয়। তারপর ছেলেমেয়েরা আসে ইস্কুল থেকে। তাদের জলখাবার খাওয়া হ'লে তাদের নিয়ে বেড়াতে যেতে হয়—আরও হাজারো কাজ এসে পড়ে সন্ধ্যার সময়। একেবারে ছুটী মেলে রাত বারোটায়। ঝি, ঠাকুর, চাকর সবাই একসঙ্গে খেতে বসে—হারানদাও। এই সময় ওর মুখে হাসি ফোটে—গল্পগুজব করার সময় পায় বেচারী।...

এমন চাকর দেখে হিংসে করব না ত কিসের হিংসে করব বলুন? ফটিক বাবু সম্প্রতি বড়বাবু হয়েছেন সেকশ্যানের, তিনি সব শুনে বলেন, 'কত মাইনে পায়? দু'চার টাকা বেশি দিলে আসে না?'

মণীশবাবু বলেন, 'পাগল! কত দিনের পুরোনো লোক দেখছ না, মায়ায় পড়ে গেছে যে। নইলে কি আর ঐ গাধার খাটুনি খাটে?'

এখানে আসার পাঁচ সপ্তাহ্ পরে রায় বাহাদুরের স্ত্রী কনিষ্ঠা কন্যাকে নিয়ে ্কে বলে 'সোস্যাল কল' দিতে এলেন। আমার বৌদি ত বিষম ব্যস্ত। ছুটোছুটি ্রে আসন ইত্যাদি দিলেন। চা খাবেন কিনা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করতে উত্তর ্র 'চা ভাই আমি খুব খাই।... তবে যা-তা চা মুখে রোচে না। করো একটু— ্ট কথা বলতে কি ভাই, তোমাদের ঘর-দোরের ছিরি দেখে মনে হচ্ছে তোমরা ্ও-দাও ভালো। না রে পিও?...ও আমরা দেখেই ধরে নিতে পারি।'

বৌদি ত অবাক্। তবু তাঁকে আতিথ্যের আয়োজন করতে হয়।

এ-কথা সে-কথার পর—বর্মায় তাঁরা কি রাজার হালে ছিলেন, জজ ম্যাজেষ্টার ্কে ছোট লাট পর্যন্ত ওনাকে কি রকম খাতির করত, তাঁর নাতি-নাতনিরা ্যন্ত কী রকম আরামে ও বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে—এরই অজস্র গল্প এক- ্ফা করে যাওয়ার পর, বোধ হয় একটু নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামতেই বৌদি ্ক সময় হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা, আপনার বড় জামাইটি কোথায়? ্কে ত দেখি না। তিনি বিদেশে থাকেন বুঝি?'

এ প্রশ্নের যে ফল হ'ল একেবারে অদ্ভুত।

প্রিয়বালা মাথা হেঁট করে একখানা মাসিক কাগজের পাতা ওল্টাতে ্গলেন আর গৃহিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাতাবী লেবু গাছটার ্কে চেয়ে রইলেন!

বৌদি ত অপ্রস্তুতের একশেষ। আমি আমার ঘর থেকে সবই দেখতে ্চ্ছিলুম, আমারও লজ্জার শেষ রইল না। হয়ত অত্যন্ত দুঃখের কোন ব্যাপার, ্ত মারাই গেছেন—কি পালিয়ে গেছেন কোথাও? কিংবা আর কিছু— ্সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি না দূর থেকে ত অত বোঝা যায় না—

গৃহিণী অনেকক্ষণ পরে কথা কইলেন, 'না বললে তোমরা বুঝতে পারতে না ্ছা, কিন্তু কী জানো, মিছে কথা আমি মোটে বলতে পারি না। সে জন্যে রায় ্বাহাদুরের কাছে আর কত বকুনি খাই।...সে ভাই আমার পোড়া বরাত— ্লতেও লজ্জা করে!'

বৌদি বাধা দিয়ে বলতে গেলেন, 'থাক্ থাক্—না হয় নাই বললেন।'

'না বাছা। আজ হোক্ কাল হোক্ এক দিন শুন্তে পাবেই। মিছে মিছি চেপে গিয়েই বা লাভ কি।...আমার ত ভাই এই দু-টি মেয়ে বেটের—বড় আদরের। তাই শখ্ হয়েছিল ঘরজামাই রাখব। ও বর্মা মুলুকে ভাল ছেলে ত পাওয়া যায় না, স্বজাত স্বঘর একটি ছেলে পেলুম, দিব্যি ফুটফুটে দেখতে, তখন ইস্কুলে পড়ছে। মেয়েও আমার ছোট, সবে দশ বছরের। ছেলের বাপকে দশটি হাজার টাকা গুণে দিয়ে ছেলে নিয়ে এলুম ঘরে—যে ইস্কুলে পড়ত সে ইস্কুল ছাড়িয়ে ভাল ইস্কুলে দিলুম, ভাল মাষ্টার রাখলুম, ইচ্ছে ছিল ভাল করে পড়িয়ে ডাক্তার করব—ওনার জায়গায় বসবে। ভাই, এমন মন্দ অদেষ্ট শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর হ'ল। ম্যাট্রিক আর কিছুতেই পাস করতে পারলে না। ছ বছর চেষ্টা করে ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে বসল। তাই এমন, শ্বশুরের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখ্ একটু, কত কর্মচারী রয়েছে, মাইনে নিচ্ছে, তুই-ই না হয় সব বুঝেপড়ে নে—তা নয় এমন ছোটলোক-ঘেঁষা, কেবল ঝি-চাকরদের সঙ্গে মিশবে গল্প করবে আর যত ঘর-কন্নার কাজ দেখবে। উনিও ওকে কারবারে বসাতে চাইলেন না। বললেন, কী পরিচয় দেব? তারপর ত এই চলে এলুম—ব্যস্ হয়ে গেল কেমন যেন জবু থবু মত হয়ে গেছে—নইলে ভাই অত বয়স ওর নয় যা দেখায়। ছেলেও হয়েছে বিয়ের অনেক পরে! ঐ তিনটি।'

বৌদি তবুও বুঝতে পারলেন না। একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনার সে জামাই কি এখানে আছেন?'

'ওমা বুঝতে পারোনি? ঐ যে হারান, বাজার হাট-টাট করে।'

হারান? হারানদা? এঁদের জামাই? কী সর্বনাশ! আমি ত স্তম্ভিত। বৌদিও তদ্রূপ।

'কী আর করবে, না আছে একটা আত্মসম্মান জ্ঞান, না আছে এক পয়সা রোজগারের চেষ্টা। কর্তা বলেন, থাক্ ঐ বাজার-হাটই করুক। মনে করব সরকার রেখেছি। তাই ত উনি এবারে একেবারে জেদ্ করে বসলেন ডাক্তার

াত্তর দেখে তবে বিয়ে দেব। পিওর আমাদের ত এই সেদিন বিয়ে হ'ল লতে গেলে।'

বৌদি আর থাক্‌তে পারলেন না, বললেন, 'তবু ওঁর পোষাক-আষাকগুলো ; একটু দেখে শুনে—'

'পোড়া কপাল! ও কি সেই মানুষ?

অম্‌নি থাকতেই ভালবাসে।'

বৌদি এ'কথা সে'কথার পর আর একটি প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা ওঁর ছেলে-ময়েরাও কি ওঁকে হারানদা বলে?'

ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে গৃহিণী বলেন, 'হ্যাঁ—মানে ঐ শুনে বলে আর কি! যা চুরির বাপ—বাপ বলে না জানাই ভাল!'

এর পর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে হারানদা-র সঙ্গে ভাব জমে গেছে। কতকটা ইচ্ছে করেই ভাব করেছি। দু-পয়সার বিড়ি কিনে রেখে দিই, এসে রকে বসলেই একটা বিড়ি আর দেশলাই বার করে দিই। দেখতে দেখতে ওঁর কপালের পার্চমেণ্টের মত কোঁচকানো চামড়া যেন খুলে মসৃণ ও দৃত হয়ে যায়, মুখে হাসির মত একটা উজ্জ্বলতাও ফুটে ওঠে। নানান্ গল্প করেন হারানদা—বর্মা মুলুকের গল্প। ওর বাপের বাড়ীর গল্প, মা, ভাই, বোন!, পদ্মফুলের মত সুন্দরী একটি ছোট বোন ছিল—তার কী হ'ল কে জানে! বিয়ের পর এঁরা আর কোন খোঁজ-খবর রাখতে দেননি। বোমার হিড়িকে পালাতে পেরেছিল কি জাপানীদের হাতে রইল—কী মারাই গেল। ছেলেবেলা ওর একটি বার্মিজ মেয়ের সঙ্গেও ভাব হয়েছিল, খুব সুন্দরী সে। ওঁর বিয়ের খবর পেয়ে আর সে কথা কয়নি ওঁর সঙ্গে। আর কখনও না। এমনি নানান্ গল্প—টুকরো টুকরো অসংলগ্ন। আমার মনে হয়, এই জীবন যাপন ক'রে ক'রে ওঁর মাথাতেও একটা গোলমাল হয়েছে। বেশিক্ষণ একটা জিনিস ভাবতে পারেন না, গুছিয়ে কথা বলতেও পারেন না।

এক দিন সোজাসুজি জিজ্ঞাসা ক'রে বসি, 'আচ্ছা এমনটা কি ক'রে হ'ল হারানদা ?'

'কী হ'ল ভাই ?'

'এই যে বিনা মাইনের চাকরের স্তরে নেমে এলেন ?' সাহস করেই বলি জানি যে কারুর অপমানেই আর রুষ্ট হবার ক্ষমতা নেই ওঁর।

হারানদা কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'কেমন ক'রে যে হ'ল তা জানি না প্রথমটা খুব যত্ন করেছিলেন এঁরা, বড়মানুষীর চূড়োন্ত। তাতেও কতকটা যে অমানুষ হয়ে গেলুম, আর সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ে ক'রে সুখী হইনি—ম ভেঙ্গে গিয়েছিল, কেমন একটা মনে হ'ত যে লোভে এরা ষড়যন্ত্র ক'রে আমা এমন করলে সেই লোভে ঘা দেব—জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে। নই লেখাপড়ায় আমি খুব খারাপ ছিলুম না, সে খবর ওঁরা আমাকে কেনবার আ ভাল করেই নিয়েছিলেন।'

'তার পর ?

'তার পর আর কি! যখন সত্যিই অমানুষ হয়ে গেলুম এরা তাচ্ছিল্য আ অবহেলা শুরু করলে। যত করে তত যেন আরও অমানুষ হয়ে যাই। কতক জন্তুর মত আর কি, বোঝ না। পড়ে মার খায় অথচ নড়ে না—তেমনি জ হয়ে গেলুম। পালাবার ক্ষমতা চলে গিয়েছে। কোনও কাজ শিখিনি, কো বৃত্তি না—কোথায় যাবো কি করব কিছু জানি না। পাখী খাঁচায় ঢুকে উড় ভুলে গিয়েছে, এখন খোঁচা দিলে নিঃশব্দে খোঁচা খাই—ডানা ঝাপ্‌টাতে পারি না আর!'

এই পর্যন্ত বলে একটুখানি চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে 'দাও একটা বিড়ি দাও, সরে পড়ি। কর্তা আজ আবার সকাল করে আসবে হুকুম হয়েছে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে হবে। এ বেলা যেন কারা খাবে—'

নিঃশব্দে বসে আর একটি বিড়ি টেনে নির্বিকার প্রসন্ন মুখে উঠে চলে যান।

উনি ত নির্বিকার হয়েই থাকেন কিন্তু কে জানে কেন আমি স্থির থাকতে পারি না। ওঁর এই জানোয়ারের মত পড়ে মার খাওয়া আমার গায়ে যেন ছুঁচের মত বিঁধত। কোন মতে ওঁকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে পারলে আমি যেন বেঁচে যাই—এরা জব্দ হোক্। আমার রকম-সকম দেখে বৌদি হাসতেন, 'তুমি অমন গজরাচ্ছ কেন? বলে যার বিয়ে তার মন নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই—তোমার হয়েছে তাই।'

আবার নিজেই বলতেন, 'তাও বলি—মানুষটাকে নিজেরা বোঁটা ছিঁড়ে এনে ওর ভেতরের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে এখন অমন ক'রে থ্যাংলাবে কেন, তাইতে আমার আপত্তি। তা ছাড়া নিজেরা করেছে অমানুষ, এখন আবার অমানুষ বলে গাল দেয়।...আর ওর বৌটাই বা কি, এ ধারে ত শাড়ী গয়নার শেষ নেই কিন্তু যার জন্যে শাড়ী-গয়না পরা তাকেই এত হেনস্তা। ও মানুষটা না থাকলে কি করতে তাই শুনি?'

আমি অনেক ভেবে ভেবে এক দিন কথাটা পাড়ি হারানদা'র কাছে, 'হারানদা, এখান থেকে চলে যেতে চান?'

চম্‌কে ওঠেন হারানদা, 'এখান থেকে? চলে? সে কি? কোথায়?'

'যাবেন কোথাও?'

'খাবো কি ভাই?'

'চাকরী করবেন।'

'কী চাকরী করবো ভাই, আমাকে কে কাজ দেবে?'

'যদি দেয়। আমি যদি যোগাড় করে দিই?'

'লেখাপড়া যা শিখেছিলুম সব ত ভুলে গিয়েছি। কি কাজ করব?'

'লেখাপড়া না হলেও চলবে। সরকারী অফিসে বেয়ারার চাকরী—দেখুন। মাইনে কম বটে, কিন্তু যুদ্ধের দৌলতে য়্যালাউন্স নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ টাকা পাবেন। থাকবার জায়গাও করে দিচ্ছি। নিজে শান্তিতে নিরাপদে থাকতে পারবেন।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে হারানদা বললেন, 'হাজার হোক তবু এখানে শ্বশুরবাড়ীতে আছি, এ আশ্রয় ছেড়ে বেয়ারার চাক্‌রী করতে যাবো! লোকে কি বলবে?'

'একে কি আপনি শ্বশুরবাড়ী থাকা বলেন হারানদা? এই কি সম্মানের থাকা!' বোমার মত ফেটে পড়ি আমি, 'সরকারী অফিসের বেয়ারা, কত ম্যাট্রিক পাশ ছেলে মাথা কুটে মরছে ঐ চাকরীর জন্যে দেখুন গে যান। তাতে আপনার মান যাবে? কে দেখছে, কে আপনার পরিচয় পাবে? কলকাতায় চাকরী করবেন, ওখানেই থাকবেন। বলবার মত লোকটা পাচ্ছেন কোথায়?'

অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে বলেন, 'তা বটে, তবে কি জানিস্ ভাই বহুদিনের অভ্যাস, দেখি একটু ভেবে দেখি।'

এর পর থেকে আমার কাজ হ'ল দেখা পেলেই হারানদাকে তাতানো। এতে যেন একটা ষড়যন্ত্রের স্বাদ পেতাম, বিদ্রোহে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে ষড়যন্ত্রকারীরা যে উত্তেজনা পায় তার কতকটা অনুভব করতাম। কিন্তু হারানদাকে তাতানো যেন শিব-অসাধ্য কাজ। বড়ই দুর্ব্বল মানুষটা, শুধু দেহে নয়—মনেও। নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে যেন সাহসে কুলোয় না ওঁর কিছুতেই। সে ছবি মনে মনে আঁকতে গেলেই কপালে ঘাম দেখা দেয়—

অবশেষে এক দিন বললেন, 'হাজার হোক্ নিজের ছেলেপুলে ছেড়ে—'

'যে ছেলেপুলেরা আপনাকে বাবা বলে জানলেই না, তাদের কাছে থেকেই বা কি সুখ? বরং চলে যান, নিজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে চাই কি এক দিন ওরাই আপনার মূল্য বুঝবে। এক দিন ফিরিয়ে আন্‌তে চাইবে মাথায় করে। সসম্মানে ফিরতে পারবেন তখন। কিছু যে মনুষ্যত্ব এখনও আপনার আছে তা বুঝতে দিন।'

তবু হারানদা'র সেই এক কথা, 'তা বটে। দেখি একটু ভেবে দেখি।'

অবশেষে এক দিন সামান্য কি একটা বাজারের ছল ধরে রায় বাহাদুর কঠোর তিরস্কার করাতে কি মনে হ'ল ওঁর—আমার কাছে এসে বললেন,

'দুত্তোর! তুমি ভাই গ্যাখো—ব্যবস্থা করো যা হয় একটা। তবে বলে-কয়ে যেতে পারব না, সে সবাই মিলে এমন হৈ-হৈ করবে, এত কালের অভ্যাস, মুখের সামনে জব্দ হয়ে যাবো আবার। লুকিয়ে যেতে হবে।'

'দেখুন ঠিক ত? খাক্‌তাই হবো না লোকের কাছে বলে।'

'না, না, না,। তিন সত্যি করছি।'

তখন চাকরীর জন্য ভাবতে হয় না। নিজেই দরখাস্ত লিখে দিয়ে এক জায়গায় কাজ ঠিক করলুম। আমাদের অফিসের সঙ্গে লাগোয়া সে অফিস। একটা সস্তার বাসাও ঠিক করা হ'ল। কথা রইল নির্দিষ্ট দিনে ভোর বেলা হারানদা একটা কাপড়-জামা বগলে করে বেরিয়ে আসবেন—আমি নিয়ে গিয়ে সেই বাসায় রেখে আসব। বিছানা-মাদুরও চেয়ে-চিন্তে এক রকম জোগাড় করে রাখলুম। বাসায় যা আগাম দেবার কথা তাও নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিলাম। এক কথায় আমারই উৎসাহ সব চেয়ে বেশি। এ যেন আমার ব্যক্তিগত জয়লাভ!

নির্দিষ্ট দিনের আগের রাত্রে আমার ভাল ক'রে ঘুমই হ'ল না! রাত চারটে বাজতে না বাজতে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুত। কিন্তু হারানদা কৈ?

সাড়ে চারটে, পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছটা!

রান্নাঘরেও ত নেই! ঠাকুরই আজ আঁচ ধরাচ্ছে। ব্যাপার কি?

চাকর দুধ আন্‌তে এদিক দিয়েই যায়, তাকে ধরলুম, 'হারানদা'র খবর কি বেহারী?'

'হারানদার জ্বর হয়েছে কাল থেকে খুব!…'

'জ্বর হয়েছে। সে কি!'

'হবে না। এই বর্ষা, উনি শোবে একটা মাদুরে। খাট-বিছানা থাক্‌তে ঘরে যাবে না—বারান্দায় শোবে বারো মাস। তা কি হবে বলুন।'

সেদিন গেল, তার পরও দু'-তিন দিন আর পাত্তা পেলুম না। দিন চারেক পরে এক দিন দেখি মুড়ি-শুড়ি দিয়ে এসে হাজির।

হৈ হৈ করে উঠলুম, 'কি, ব্যাপার কি হারানদা। দিলেন ত সব কাঁচিয়ে! কী জ্বর হয়েছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জা ?'

একটু চুপ করে থেকে বললেন হারানদা, 'আসল কথা কি শুনবি ভাই, তোর ঐ মতলবের কথা ভেবে ভেবে ভয়ে আমার জ্বর এসে গেল!'

'সে কি!...তাহ'লে ? ও প্ল্যান একেবারে ছেড়ে দিলেন না কি ?'

'হ্যাঁ ভাই। আমাকে মাপ কর্। আসলে বড্ড মায়ায় পড়ে গেছি ওদের, কাটিয়ে যাবার আর সাধ্য নেই।'

'মায়ায় পড়ছেন ? কার, ছেলেমেয়েদের ?'

'শুধু ছেলেমেয়েই বা বলি কি করে ? বৌটাও, দেখে না দেখে না— সেদিন যেমন শুনলে জ্বর হয়েছে জোর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে—নিজের বিছানা থেকে তোষক বার করে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে বিছানা করিয়ে শোওয়ালে। এ ক'দিন ঘরেই শুতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। ভালও বোধ হয় বাসে একটু। এদের ছেড়ে যাই কি করে বল দেখি ?'

এই বলে কেমন এক রকম দুর্বল ভাবে হাসেন একটু। অপ্রতিভ ভাব, তাহলেও মুখে বেশ যেন তৃপ্তি ফুটে উঠেছে।

একটা বিড়ি খেয়েই উঠে পড়েন, 'দেখি একবার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যেতে হবে, প্রিয়বালার ভেঁটকি মাছের কাঁটা খাবার শখ্ হয়েছে। পোয়াতি কি না—ঐ সব উদ্ভট্ শখ! উঠি ভাই, কিছু মনে করিসনি।'

ব্যস্ত ভাবে চলে যান হারানদা। সেই আধ ময়লা কাপড়, ছিটের শার্ট ও খালি পা—অধিকন্তু একটা পুরানো খদ্দরের চাদর মুড়ি দেওয়া।

# মরণের পরেও

মৃত্যু-পথ-যাত্রিণীকে কে আর কটু কথা বলতে চায়? তবু যে অমরেশের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে গেল, সে অনেক দুঃখেই।

আজ ছ'মাস শুয়ে আছে সুহাসিনী, কঠিন রোগ—কিন্তু তাতেও কি স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? বিয়ের পর এই দীর্ঘ আটটা বছর অমরেশের কেটেছে যেন একটানা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিল অমরেশ, সে বয়সে রোম্যান্সের লোভে মানুষ ততটা বিয়ে করে না, যতটা করে গৃহে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং একটু সেবার লোভে। তবু ফুলশয্যার রাত্রে নবোঢ়া বধূর সঙ্গে প্রথম পরিচয়—মন কিছু স্বপ্ন দেখেছিল বৈ কি! কিন্তু সে স্বপ্ন ভাঙতেও বেশি দেরি হয়নি। সামান্য দু' একটা কথার পরই—অপরিচয়ের অন্তরাল দূর হওয়ামাত্র সুহাসিনী জানতে চেয়েছিল যে বিবাহের আগে অমরেশ কী পরিমাণ প্রেম করে বেড়িয়েছিল আর কতগুলি মেয়ের সঙ্গে?

সেই সূত্রপাত—কিন্তু শেষ নয়।

প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে সুহাসিনীর তৃপ্তি হয়নি—অর্থাৎ সংশয় যায়নি। অমরেশও ডাগর মেয়ে বিয়ে করেছিল—এ প্রশ্ন, এ সংশয় তার মনেও জাগতে পারে, সে কথাটা কিন্তু সুহাসিনী একবারও ভাবেনি। যেন তা অসম্ভব, সুহাসিনী সমস্ত সংশয়ের ঊর্ধ্বে—সিজারের পত্নীর মত। অথচ তারপর থেকে একদিনও অমরেশকে সে শান্তি দেয়নি। 'ওদিকে চেয়েছিলে কেন, ওদের বাড়ীর সেই ধিঙ্গি অসভ্য মেয়েটা বুঝি জানালায় ছিল?···অতই বা ঠাকুরঝির বাড়ী যাওয়া কেন? ওর ননদ বুড়ীকে দেখে বুঝি আর আশ মেটে না?··· এতক্ষণ কোথায় ছিলে? অফিসে ত তোমাদের ছুটি হয় পাঁচটায়—তুমি নটা পর্যন্ত অফিসে ছিলে? কাকে বোকা বোঝাও বল ত? আমি যেন কিছু বুঝি না। আজ আবার এত দেরী কেন? আজ ত অফিস নেই? বায়স্কোপে

গিয়েছিলে? তা ত যাবেই। আমাকে নিয়ে যেতেই তোমার সময় নষ্ট হয়!··· কী বললে? বন্ধুরা জোর করে নিয়ে গিয়েছিল? কে বন্ধু? সমর সেন নিশ্চয়? বেবিটা সঙ্গে ছিল ত? আর বলতে হবে না। সেইজন্যে এত দেরি। সাড়ে আটটায় শো ভাঙ্গে, বাড়ী ফিরলে রাত সাড়ে নটায়। তারপর? কতগুলি টাকা বেবির পেছনে খরচ হ'ল?···বাজারে গিয়েছ সেই কখন? একঘণ্টা ধরে বাজার? না অমনি যাবার পথে আরতিদের বাড়ী চা খেয়ে যাওয়া হ'ল?' ইত্যাদি। সহস্র প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি তুলে দিলুম। বেশি বলার প্রয়োজন নেই—পাঠকদের অনেকেরই এসব প্রশ্নের সঙ্গে পরিচয় আছে, নিজের 'মনের মাধুরী মিশায়ে' বাকীগুলো তৈরী ক'রে নেবেন।

তবে শুধু যদি প্রশ্ন হ'ত ত অত ভাববার ছিল না। ঝি চার মাসের বেশি রাখবার উপায় নেই। যেমন করেই হোক তাড়াবে সুহাসিনী। তা কে জানে যুবতী, কে জানে প্রৌঢ়া। ঘরের জানলা খোলা প্রায় বন্ধ করতে হয়েছিল, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। আর প্রতিবাদ করা বৃথা—মান-অভিমান কান্না-কাটি উপবাস—এসব অস্ত্র সুহাসিনীর তূণে যেন জোগানো। সুতরাং সব আশাই অমরেশ বিসর্জন দিয়েছিল। অশান্তির ভয়ে তার মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে বাস করবার মত একটা কুয়া পেলেও সে বেঁচে যেত!

তারপর এই অসুখ: এ আরও অসহ্য। কোন কাজ নেই, শুয়ে শুয়ে শুধু স্বামীকে সন্দেহ করা ছাড়া। সেবা করার জন্য যে কোন আত্মীয়াকেই আনায়, তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে সুহাসিনী। পথ্য না খাওয়া, ওষুধ না খাওয়া—এ ত অমোঘ অস্ত্র। শুধু পাগল হয়ে যেতে বাকী ছিল অমরেশের। ইদানীং সে সমস্ত মনে-প্রাণে প্রতীক্ষা করত স্ত্রীর মৃত্যুর—যদিও প্রার্থনা করতে তার সংস্কারে বাধত। মনের কাছে সে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইত না যে সে স্ত্রীর মৃত্যুই চাইছে।

সবচেয়ে মজা এই—ওর এ মনোভাব সুহাসিনী জানত। প্রায়ই বলত ওগো আর দেরি নেই—আমি মলে যে তোমার শান্তি হয় তা আমিও জানি।

আর কটা দিন? হয়ে এল। এতদিন পারলে আর কটা দিন ধৈর্য ধরে থাকো ...আমার শেষ হয়ে এসেছে—'

আবার পরক্ষণেই হয়ত বলত, 'আমার ত হয়ে এসেছে। যাই—তারপর যত খুশি মজা লুটো। তখন ত আর বলতে আসব না। এই ক-টা দিন আর সহ্য হচ্ছে না? এত তাড়া!' সেদিনও কথাটা উঠেছিল এই প্রসঙ্গেই। কেউ নেই সেবা করার, অমরেশেরও অফিস কামাই করা সম্ভব নয়—সে প্রস্তাব করেছিল একটা নার্স রাখার। স্থহাসিনী যেন জ্বলে উঠেছিল একেবারে—'হ্যাঁ—তার কম আর নেশা জমবে কেন। আমি এ ঘরে শুযব আর উনি পাশের ঘরে নার্সকে নিয়ে ফুর্তি করবেন! আর হয়ত বড় জোর মাস-খানেক আছি, তাও তোমার সহ্য হচ্ছে না? দগ্ধে দগ্ধে না মারলে আর চলছে না বুঝি? উঃ, কী পিশাচ তুমি, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে একটু মায়া হয় না?...মরবার পর যা করবে তুমি তা ত বুঝতেই পারছি—শেষ কটা দিন একটু শান্তিতে থাকতে দাও!'

এতটা বলার পরিশ্রমেই তার শ্বাস আটকে আসছিল। কোনমতে দম নিয়ে বলেছিল; 'তবে তাও বলে রাখছি, মনে করো না যে আমি মরে তোমাকে অব্যাহতি দেব! সারা জীবন জালিয়েছ মরে তার শোধ তুলব। আবার জন্মাব, তোমার কাছে-কাছেই জন্মাব—ছায়ার মত লেগে থাকব সঙ্গে—যা খুশি তাই করবে তা হ'তে দেব না!'

অতখানি স্বার্থত্যাগের পর এতটা অকৃতজ্ঞতা পেলে কার মাথার ঠিক থাকে? অমরেশও সামলাতে পারেনি—বলে ফেলেছিল, 'মরবার পর যদি জন্মাও ত মানুষ হয়ে আর জন্মাবে না—এটা ঠিক। কুকুর বেড়াল হয়েই জন্মাবে। কিংবা যে খল তুমি, সাপ হওয়াই বেশি সম্ভব!'

অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে স্থহাসিনী বলেছিল, 'বেশ ত, তাই না হয় জন্মাব। কিন্তু তাতেই কি রেহাই পাবে ভেবেছ? দেখে নিও!'

কিন্তু এসব ত কথার কথা। মনে করে রাখবার কথাও নয়, কেউ মনে ক'রে রাখেওনি।

কথাটা বলার দিন-আষ্টেকের মধ্যেই সুহাসিনীর মৃত্যু হয়েছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল অমরেশ ঠিকই—তবু একটু দুঃখও হয়েছিল স্ত্রীর জন্য। বেচারী!…ও-ই কি অশান্তি কম পেলে! চির-জীবন যে ঈর্ষার আগুন অমরেশকে ঘিরেছিল তা কি ওকেও দগ্ধ করেনি? জীবনে শান্তি যে কেমন তা ত অনুভবই করতে পারলে না কখনও। আর এই অসময়ে—যে স্বামীকে একটি দণ্ডও চোখের আড়ালে রেখে স্বস্তি পেত না—তাকেই চিরকালের মত ত্যাগ করে চলে যেতে হ'ল!

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিয়ের প্রস্তাবটা এনেছিলেন। সত্যিই—এমন কিছু বয়স হয়নি। চল্লিশ-একচল্লিশ বছরে আজকাল অনেকেই প্রথম বিয়ে করে। ঘরেও ত লোক চাই একটা—শুধু চাকর-বাকরের ভরসায় কিছু এখন থেকে থাকা যায় না। বলতে গেলে সারা জীবনটাই ত পড়ে আছে!

কিন্তু অমরেশ কারুর কোন কথাই শোনেনি। বাবা, আবার! অনেক কষ্টে রেহাই পেয়েছে সে—মুক্তির আনন্দে সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে। শুধু যখন খুশি এবং যত খুশি বাইরে ঘোরা, আর যত রাত্রে ইচ্ছা বাড়ী ফেরার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, কে জানত! একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার—আর দরকার নেই, ধন্যবাদ! খাওয়া-দাওয়া? তার জন্য হোটেল আছে। অসুখ-বিসুখ? হাসপাতালের অভাব কি? না হয় পেভ্‌মেণ্ট ত কেউ ঘোচায়নি? মরবার পরের কথা সে ভাবে না—যেখানে মরবে তারাই গন্ধ হবার ভয়ে যেমন ক'রে হোক সরাবার ব্যবস্থা করবে।

তবে এ ত প্রথম আনন্দের উন্মত্ততা! এ কেউ বিশ্বাস করেনি। শুধু এইটে বুঝেছিল যে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

বছর-খানেক পর পূজার সময় বেশি ছুটি নিয়ে রাজগীরে গেল অমরেশ। সেখানে ঠিক ওর পাশের বাংলোতে যিনি ভাড়া ছিলেন সেই শুভ্রাংশুবাবুর সঙ্গে

হঠাৎ খুব ভাব জমে গেল। ওরা একসঙ্গে কুণ্ডে স্নান করতে যায়—অত ভোরে এবং অত রাত্রে আর কেউ যেতে চায় না। দু'জনের রুচির সঙ্গে দুজনের মিল হওয়াতে ক্রমে অন্তরঙ্গতাটা বেড়ে গেল। শুভ্রাংশুবাবুর চব্বিশ পঁচিশ বছরের অনূঢ়া ভগ্নীটির সঙ্গেও পরিচয় হ'তে যে বিলম্ব হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য। এবং সেই ভগ্নীটি, রুচিরা তার নাম—শিগ্‌গিরই আবিষ্কার করলে যে একটি বাচ্ছা চাকরের ওপর অমরেশের গৃহস্থালীর ভার। সে রান্না করে অখাদ্য, চা করে জলের মত এবং কোন কাজটাই ভাল ক'রে করতে পারে না।

ফলে প্রত্যহই একটা দুটো ব্যঞ্জন ও-বাংলো থেকে এ-বাংলোতে এসে পৌছতে লাগল। সকালে দুপুরে বিকেলে এবং সন্ধ্যায়—চায়ের কাপ নিয়ে রুচিরা নিজেই আর্সত। একদিন দুদিন ছাড়া ও বাংলোতেই আহারের নিমন্ত্রণ হ'তে লাগল এবং কয়েকদিন পরে থেকেই অমরেশ দেখলে ওর ঘরকন্না ও শয্যার বিশৃঙ্খলা ঘুচে গেছে। কে যেন ওর অনুপস্থিতিতে এসে তার মায়া-হস্ত বুলিয়ে সব কিছু সুন্দর ক'রে গুছিয়ে রেখে যায়।

ঋষিরা একেই বোধ হয় মহামায়ার ফাঁদ বলেছেন! অমরেশের অত তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে আবার রুচিরাকে নিয়ে গৃহস্থালী পাতবার কথাটা ভাবতে লাগল। শুভ্রাংশু একদিন বলেও ফেললে কথাটা, 'এমন করে আর কতদিন চলবে অমরেশবাবু, আর একবার সংসার পাতুন। দেখুন বলেন ত—আমরা ত আপনাদেরই পাল্‌টি ঘর, রুচিরাও কিছু খারাপ মেয়ে নয়। লেখাপড়াও কিছু জানে, গৃহস্থালীর কাজ যেটা আপনার বেশি দরকার, সেটার সার্টিফিকেট ওকে বোধহয় আপনিই দিতে পারবেন—'

অমরেশ আর না বলতে পারলে না। বললে, 'সে দেখুন। আগে আপনার ভগ্নীর মত নিন—আমার মত প্রৌঢ়কে—অবিশ্যি একটা বাড়ীও আছে কলকাতায়, মোটা মাইনের চাকরীও করি—তবু আমাকে ওর পছন্দ হবে কি?'

'বিলক্ষণ! ঐ কি আর কচি খুকী?'

কথাটা রাত্রে কুণ্ড থেকে ফেরবার পথে হয়েছিল। অন্ধকার নির্জন রাস্তা

তার মোহ বিস্তার করেছিল রুচিরার চিন্তাকে ঘিরে। অমরেশ লঘু মনেই বাসায় ফিরল। ঘরে ফিরে দেখলে শয্যাটি পরিপাটি সাজানো। কাপড় জামা গুছিয়ে কিছু বাক্সয়, কিছু আলনায় তোলা হয়েছে। আলোটি পরিষ্কার ঝক্ঝক্ করছে। তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। তিক্ত অভিজ্ঞতার আশঙ্কা চলে গেল বহুদূরে। তার ওপর রাত্রে খাওয়ার আগে ও বাড়ী থেকে মাংস এবং মিষ্টান্ন এনে পৌছতে আরও ভাল লাগল। এমনি জীবন-সঙ্গিনীই ত মানুষের কাম্য—অমরেশও ত তাই চেয়েছিল।

কিন্তু খেতে বসে সবে এক গাল মাত্র রুটি মাংসের ঝোলে ডুবিয়ে মুখে পুরেছে অমরেশ—তার স্বাদ ও গন্ধ সমস্ত অনুভূতিকে অধিকতর লালায়িত করে তুলেছে মাত্র—এমন সময়ে অকস্মাৎ একটা প্রকাণ্ড বন বেড়াল ও পাশের জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল একেবারে মাংসের বাটিটার ওপর—বাটিটা উল্‌টে মাংসও যেমন পড়ে গেল, ফেরবার পথে মিষ্টান্নের প্লেটটাও ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল তার পায়ের আঘাতে।

হৈ-হৈ করে উঠল ওর চাকর রাজু, অমরেশ নিজেও। কিন্তু ততক্ষণে অনিষ্ট যা হবার তা হয়েই গেছে। চোখের নিমেষে যেন ঘটনাটা ঘটে গেল। চেঁচামেচিতে রুচিরা আর তার বৌদিও ছুটে এল ও বাড়ী থেকে—অমরেশের কোন নিষেধ না শুনে ওরা নতুন করে খাবার এনে দিলে—ব্যাপারটা তখনকার মত মিটেই গেল। রাজু বললে, 'বাপরে, বেড়ালটা যেন বাঘের মত, দেখেছেন বাবু? দেখলে ভয়ে করে।'

রুচিরা বললে, 'আজ কদিনই দেখছি আমাদের বাড়ীর আনাতে-কানাচে ঘুরছে। অবশ্য আমাদের অনেক লোক থাকে বলে ঘরে ঢুকতে পায়নি। কী সাহস দেখেছেন? পাত থেকে খেতে চায়—বেড়ালের এমন সাহস ত কখনও দেখি নি!'

রাত্রে শুয়ে কথাটা ভাবতে ভাবতেই অমরেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কী একটা শব্দে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাত্রির জ্যোৎস্না ঘরে এসে

পড়েছে, তারই অস্পষ্ট আলোতে অমরেশ দেখলে সেই বেড়ালটা ওরই বিছানায় এসে বসেছে এবং ওর দিকে চেয়ে গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে গর্জন করছে। ঝগড়া করার সময় যেমন শব্দ বার হয় ওদের গলায়—তেমনি।

দৃশ্যটা এমনি অচিন্তিতপূর্ব, এমন অবাস্তব যে দেখামাত্র ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল অমরেশ। সেই চীৎকারেই বোধ হয় ভয় পেয়ে বেড়ালটা পালাল। রাজু ঘুম ভেঙ্গে লাফিয়ে উঠল, 'কী কী বাবু, কি হয়েছে?'

কিন্তু সে উত্তর অমরেশকে আর দিতে হ'ল না—তার আগেই পাশের বাড়ীতে নারীকণ্ঠের একটা আর্ত চীৎকার। এরা ছুটে গিয়ে শুনলে, সেই বেড়ালটাই ঘুমের মধ্যে রুচিরাকে আঁচড়ে দিয়ে গেছে —

মৃত্যু-পথ-যাত্রিণীর এক অদ্ভুত দৃষ্টি ভেসে উঠল অমরেশের মানসপটে। কপাল ঘামে ভরে গেল। হাত দিয়ে সে ঘাম মুছতে গিয়ে দেখলে হাত কাঁপছে থর্ থর্ ক'রে।

অমরেশ আর একদিনও রাজগীরে রইল না। শুভ্রাংশুকে জানালে, জরুরী কাজ পড়েছে একটা—টেলিগ্রাম এসেছে। ওকে যেতেই হবে। এই সকাল এগারোটার গাড়ীতেই।

শুভ্রাংশু ব্যাকুল হয়ে বললে, 'কিন্তু এমন অকস্মাৎ—এমনভাবে—অনেক কথা রয়ে গেল যে অমরেশবাবু। এধারের—'

'গিয়েই চিঠি দেব আপনাকে। বিচলিত হবেন না। আবারও হয়ত ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু আজ আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত। আজ আর কিছু বলতে পারছি না। মাপ করবেন।'

শুভ্রাংশু আর কিছু বললে না। শুধু তার স্ত্রী বললে, 'আচ্ছা টেলিগ্রাম এল কখন? ভদ্রলোক বেড়ালের ভয়েই পালাচ্ছেন না কি?'

রুচিরা রাগ করে বললে, 'বৌদি যেন কি! আমরা কি সবাই পথের দিকে চেয়ে বসে আছি, যে কখন কার কি টেলিগ্রাম আসছে খবর রাখ্‌ব?'

বৌদি মুখ টিপে হেসে বললেন 'তা বটে ভাই—আমারই অন্যায় হয়েছে!'

ট্রেন যায় একেবারে ওদের বাংলোর সামনে দিয়ে। অমরেশ খুব নিরুৎসাহ বিষণ্ণমুখে রুমাল নাড়লে, রুচিরার ছলো-ছলো চোখ দূর থেকেও ওর দৃষ্টি এড়ায়নি। ট্রেনখানা চলে যেতে অপাঙ্গে ভগ্নীর মুখের দিকে চেয়ে শুভ্রাংশু বললে, 'এ আবার এক ফ্যাসাদ বাধল।'

কিন্তু কলকাতায় ফিরল না অমরেশ। গভীর রাত্রেই মধুপুরে নেমে পড়ল কালীপুর টাউনে ওর এক বন্ধুর বাড়ী আছে। বহুবার অমরেশ এসে থেকে গেছে, মালী ওকে ভাল করেই চেনে—থাকবার কোন অসুবিধা হবে না।

তাই বলে অত রাত্রে ত আর সেখানে যাওয়া যায় না। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে মালগুলো জড়ো ক'রে রেখে তাইতে ঠেস্ দিয়ে রাজু ঘুমোতে লাগল অমরেশের চোখে কিন্তু ঘুম এলো না। সে সেই নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্মেই পায়চারী করতে লাগল।

কত ট্রেন এল, কত ট্রেন গেল। যখন ট্রেন আসে যাত্রীদের গোলমাল কুলীদের বিবাদ—ভেণ্ডারদের উচ্চকণ্ঠ—সবটা মিলে যে কোলাহল হয়, স্টেশনে যে প্রাণলক্ষণ জাগে তাতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয় অমরেশ, আবার স্টেশনের আলো স্তিমিত হয়ে আসে এক সময়ে—কোলাহল যায় স্তব্ধ হয়ে, ওর মনও ফিরে আসে নিজের দুর্ভাগ্যে।

কথাটা ভাবছে অমরেশ। সারাদিন ধরেই ভাবছে।

এ কী হ'ল ওর! শুধু কি ওর ভাগ্যেই যত অঘটন ঘটে। আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও শান্তি দেয়নি সুহাসিনী, মরবার পরও নিষ্কৃতি দেবে না? এ কী বিদ্বেষ তার, কি অসম্ভব ঈর্ষা!

কিন্তু পূর্ব দিগন্তে উষার স্বর্ণাভাস জাগার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনের মধ্যে আশ্বাস পায় একটা! চিন্তাটা সেই শেষ রাত্রিতে প্রথম মাথায় এসেছিল—আর ওকে ত্যাগ করেনি। এতক্ষণ ধরে যা কিছু ভেবেছে, চিন্তাটাকে মনে মনে

মনে নিয়েই ভেবেছে। কিন্তু এখন এই প্রত্যূষে একটা সংশয়ও ক্রমে দেখা দিল —সবটাই কাকতালীয় নয়ত ? ওটা হয়ত সাধারণ বেড়াল একটা, বুনো বেড়াল। অমরেশের উত্তপ্ত কল্পনাই তাকে সুহাসিনীর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত করেছে!

না—কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে।

সামান্য একটা বুনো বেড়ালের ভয়ে চলে এল সে। এই আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ!

পায়চারী থামিয়ে জোর ক'রে যেন নিজের মনে বল আনে অমরেশ। রাজুকে ডেকে, 'এই রাজু ওঠ্, ছাখ দিকি, একটা এক্কা কিংবা রিক্সা! চল্ যাই!'

কালীপুর টাউনে যখন পৌছল তখন বেশ ফরসা হয়ে গেছে। মালী ওকে দেখে খুশি হয়েই সেলাম করলে, ফটক খুলে তাড়াতাড়ি মালটালগুলো নামিয়ে নিলে।

'বাবু সেই ঘরে থাকবেন ত? পূবদিকের ঘরটায়? ঐটে ত আপনার ভারি পছন্দ!'

'হ্যা—বাপু, ঐ ঘরটাই আমাকে খুলে দাও!'

বাগানে শিউলি ফুল ফুটে আছে অজস্র। তার সঙ্গে এখনও জড়িয়ে আছে অসংখ্য রজনীগন্ধার সুবাসের স্মৃতি। হিমেল ভোরাই হাওয়ার সঙ্গে সেই মিষ্ট গন্ধ মিশে রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত চিন্তাক্লিষ্ট অমরেশের সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

'আঃ।' আপনার মনেই বলে ওঠে ও।

মালী কোমর থেকে চাবির গোছাটা হাতে ক'রে এগিয়ে যায় দোর খুলতে। পিছনেই অমরেশ, তার পিছনে বিছানা ও স্যুটকেস নিয়ে রাজু। ঘরটা বন্ধ আছে—দোর জানলা সব বন্ধ। বোধহয় দীর্ঘকাল ধরেই বন্ধ রয়েছে এমনি, দোর জানলা খুলে দেবার পর খানিকটা বাইরের বাতাস ঢোকবার আগে আর ঘরের মধ্যে যাওয়া যাবে না—মনে মনে ভাবে অমরেশ। কিন্তু হঠাৎ ওর চমক ভঙ্গে যায় মালীর আতঙ্ক-কণ্টকিত অস্ফুট আর্তনাদে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, 'কী হ'ল মালি?'

সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে আসে খানিকটা।

ও কি ?

ওরও গলা থেকে একটা আর্তস্বর বেরোয়। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর—ঈষৎ শীর্ণ হয়ত, জিভ্ বার ক'রে হাঁপাচ্ছে এবং কেমন এক রকম জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে ওদের দিকে চেয়ে আছে!

খানিকটা চেয়ে থাকার পর ওদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল কুকুরটা

মালীর চোখ দুটো বিস্ফারিত, ভয়ে হাত-পা কাঁপছে!

'কোথা থেকে এল বাবু কুকুরটা ? দোর-জানলা সব বন্ধ !'

অমরেশেরও বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এসেছিল। কিন্তু তবু সেই কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললে, 'ঐ যে—নর্দমা !'

খোলা নর্দমা একটা আছে ঠিকই—তবে তার মধ্যে দিয়ে অতবড় কুকুর আসা কি সম্ভব ? মালী সংশয় প্রকাশ করে।

'কবে খুলেছিলে ঘরটা শেষ ? সেই সময় হয়ত ঢুকে বসেছিল।'

'খুলেছিলুম ? সে ত মাসখানেক আগে। তবে হ্যাঁ—পরশু দু'খানা কাগজের দরকার হয়েছিল তাই একবার খুলেছিলুম। ঐ যে তাকের ওপর পুরোনো কাগজগুলো আছে, সেই আপনি যখন ছিলেন সেই সময় থেকে কাগজগুলো পড়ে আছে ওখানে। কিন্তু সে ত এক মিনিট বাবু!'

'সেই সময়ই কখন ঢুকে পড়েছে হয়ত, আর বেরোতে পারেনি।'

'কিংবা নর্দমা দিয়েই ঢুকেছে। ঢোকে ওরা এক রকম ক'রে—বেরোতে পারে না আর।' বিজ্ঞভাবে বলে রাজু।

দুপুরে ক্লান্ত চোখ বুজে আসে, তবু ভাল ক'রে ঘুম হয় না। রুচিরার ছলোছলো দুটি চোখের স্মৃতি, তার সঙ্গে আলো-আঁধারিতে একটা বন বেড়ালের প্রকাণ্ড রুষ্ট মুখ, সুহাসিনীর ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টি—সবটা যেন স্বপ্নের মধ্যেও তালগোল পাকায়।

অবশেষে বিকেলবেলা বাগানে বসে চা খেতে খেতে মন স্থির ক'রে ফেলে অমরেশ।

ভাগ্যের সঙ্গে লড়েই দেখবে সে। সে ত কোন পাপ করেনি কোনদিন, তবে এ শাস্তি কেন তার? কেন সহ্য করবে সে এ পীড়ন? বিনা দোষে চরম কোন দণ্ড নিশ্চয়ই বিধাতা তাকে দেবেন না!

সে তখনই বসে শুভ্রাংশুকে একটা চিঠি লিখে দিলে, যদি ওঁদের কোন আপত্তি না থাকে, এবং রুচিরার মত হয় ত—এ বিবাহ সে সৌভাগ্য বলেই মনে করবে। আগামী অগ্রহায়ণেই তাহ'লে হ'তে পারবে শুভ কাজ। এখন এই কার্তিক মাসের কটা দিন অমরেশ মধুপুরে থাকবে। কলকাতার ঠিকানাও লিখে দিলে সে।

চিঠিখানা খামে এঁটে রাজুকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলে ওখানের ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একখানা বিলাতী নভেলে মন দিলে।

দিন তিনেক পরেই শুভ্রাংশুর চিঠি এল।

"আপনার পত্র পেয়ে সত্যিই খুশি হলুম কিন্তু এধারে এক বিভ্রাট। রাজগীরে থাকা আর হ'ল না। কাল সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফিরছি হঠাৎ অন্ধকারে রুচিরা বোধ ঘুমন্ত একটা কুকুরের গায়ে পা দেয়। সে উঠেই ওকে কামড়ে দিয়েছে। এখানে ত একটিই মাত্র ডাক্তার, তিনি অবশ্য যা করবার সবই করেছেন কিন্তু তবু মনে হয় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশ্যন্‌গুলো সেরে ফেলাই ভালো। কারণ কুকুরটার কোন হদিশ পাইনি। ক্ষ্যাপা কিনা কে জানে? মনে করছি কাল এখান থেকে বাস-এ গিয়ে টুয়েল্‌ভ্‌ ডাউন ধরব। কলকাতায় গিয়ে দেখা হবে। আপনি কবে আসবেন?"

দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল অমরেশের। ভয় হচ্ছে ঠিকই—অজ্ঞাত একটা আতঙ্ক। মনে হচ্ছে যে তার এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে রুচিরাকে জড়ানো হয়ত ঠিক হচ্ছে না। বিনা দোষে তার যদি কোন ক্ষতি হয়—সত্যি-সত্যিই? আবার সঙ্গে সঙ্গেই

মনে হচ্ছে সে-ও ত বিনা দোষেই সইছে এত নির্যাতন। তবে সে কেন রুচিরার জন্য চিন্তা করবে? স্বার্থপরই হবে সে। এত দুঃখের পর এতখানি সৌভাগ্যের সুযোগ যদি বা এসেছে হাতের কাছে এগিয়ে—কোনমতেই তাকে সে ছাড়বে না। প্রাণপণ করেই লড়বে অদৃষ্টের সঙ্গে—প্রয়োজন হ'লে পণ রাখবে তার এবং রুচিরার—দু'জনেরই প্রাণ। ক্ষতি কি?

গভীর রাত্রে টুয়েল্‌ভ্‌ ডাউন মধুপুর এল। তবু ওদের খুঁজে বার করতে কষ্ট হ'ল না। কোন অজ্ঞাত কারণে রুচিরার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল এখানে এসেই—মুখ বাড়িয়ে সে অন্ধকার মধুপুর শহরের দিকে চেয়েছিল।

অমরেশ আসাতে বাকী সকলেও জেগে উঠল। বৌদি হেসে বললেন, 'এত রাত্রে স্টেশনে এসেছেন ঠাকুরঝিকে দেখতে। একেই বলে টান।'

অপ্রতিভ হয়ে অমরেশ কতকগুলো জবাবদিহি করতে গেল—ফলে আরও অপ্রস্তুত হতে হ'ল। রুচিরাও হয়ে উঠল লাল। তবে সকলেই যে খুশি হ'ল তাতে সন্দেহ নেই।

শুভ্রাংশু বললে, 'উঠে পড়ুন না—একসঙ্গেই যাওয়া যাক।'

'না—না, মালপত্র রয়েছে, তা ছাড়া বাচ্ছা চাকর ভয় পাবে।'

গাড়ী চলে গেল। ছাড়ার আগে ওর ভেতরই এক ফাঁকে রুচিরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, অমরেশ সেই দুর্লভ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে চাপ দিয়েছে একটু। মনটা ভারি খুশি আছে। শীষ দিতে দিতে ফিরল অমরেশ।

রিক্সা থেকে নেমে মালীকে ডাকতেই সে দোর খুলে দিলে। রাজুকে ডেকে দিলে সে-ই। বাল্‌তিতে জল রাখা ছিল, বেশ করে হাত-পা ধুয়ে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল অমরেশ। রাজু আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, হ্যারিকেন জ্বলছে মিট্‌মিট্‌ ক'রে—খুব কমানো, তাতে আলোর একটা আভাস মাত্র পাওয়া যায়। রাজুর জন্যই এ আলোটা সারারাত জ্বলে, ওরও কেমন একটা ভয় হয়েছে, একেবারে অন্ধকারে মেঝেতে শুতে ভরসা করে না।

মাথা-মুখ তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বিছানায় এসে বসল অমরেশ। আর মাত্র ঘণ্টা-দুই রাত আছে। এখন শুলে ঘুম আসতেই ভোর হয়ে যাবে। শোবে ? না বই পড়বে। মনটা বহুদিন পরে বড় প্রফুল্ল—খুশির একটা জোয়ার এসেছে মনে। সেজন্য ঘুমের ইচ্ছা খুব নেই। রাত্রি জাগরণের কোন অবসাদও টের পাচ্ছে না।

ভাবতে ভাবতেই চোখটা পড়েছে ওর মাথার বালিশের দিকে।

আবছায়া আলো—তবু, তবু মনে হচ্ছে বালিশের খাঁজের ছায়াটা যেন একটু বেশি গাঢ় নয় ?

মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত চৈতন্য তীক্ষ্ণ, সজাগ হয়ে উঠেছে। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলে। তারপর আলোটা বাড়িয়ে লণ্ঠনটা এনে ধরলে। হ্যাঁ—ঐ ত! বালিশের খাঁজে ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে কালো রঙের সরু লিকলিকে একটি সাপ।

অসহ্য ক্রোধে অমরেশ যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল নিমেষের মধ্যে। সে ক্রোধ তার অদৃষ্টের ওপর, সে ক্রোধ সুহাসিনীর ওপর—

এদিক ওদিক চাইতেই নজরে পড়ল মোটা একটা বাঁশের লাঠি কোণে ঠেসানো রয়েছে। সে সেই লাঠিটা তুলে নিলে।

সাপটাও ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে।

লাঠি নিয়ে অমরেশ কাছে আসতেই বিছানা থেকে সড়াৎ করে লাফিয়ে নিচে পড়েছে সে। নিচেই বেচারী রাজু শুয়ে আছে। কিন্তু অমরেশ কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষিপ্র হ'তে পারে—এখনও। সে যেন বিদ্যুৎ বেগেই লাঠিটা বসিয়ে দিলে সাপের মাথায়।

ছোট সরু সাপ—লাঠিটাও বেশ মোটা।

সাপের মাথাটা থেঁতলে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছে সে, সমস্ত দেহটা অসহায় ভাবে একে বেঁকে যাচ্ছে।

রাজু লাঠির শব্দে উঠে ঐ দৃশ্য দেখে চীৎকার ক'রে উঠেছে। মালী এসেছে ছুটে। কিন্তু অমরেশের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কেমন যেন স্তম্ভিত

হয়ে দাঁড়িয়ে সেই সাপটার মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখছে। চোখ ফেরাতে পারছে না—এমনি একটা অমোঘ আকর্ষণে ওর দৃষ্টি তাতে নিবদ্ধ।

আনন্দ হয়েছে ওর! নিশ্চিন্ত হয়েছে!

কেন তা অমরেশও জানে না। ওর অনুভূতিও যেন জড় হয়ে গেছে। প্রথমের সেই অসহ্য ক্রোধ আর নেই, বরং এই জিঘাংসার জন্য যেন নিজের কাছেই সে লজ্জিত, তবু তাকিয়েই আছে সে।

সাপটা ছট্‌ফট্ করতে করতেই খানিকটা এগিয়েছে দোরের দিকে। রাজু আর এক ঘা মারতে যাচ্ছিল—অমরেশ ইঙ্গিতে নিষেধ করলে।

মুখ-হাত ধুয়ে যখন প্রথম ঘরের ভেতর পা দেয় অমরেশ তার তখনকার সেই পায়ের সজল ছাপটা এখনও শুকোয়নি, একটু বেশি জলই ছিল বোধহয় পায়ে—পরিপূর্ণ ছাপটা যথেষ্ট জল নিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে মেঝের ওপর।

মরণাহত সাপটা তার পিষ্ট দলিত মুখটাকে কোনমতে যেন বহন ক'রে এনে সেই জলের ছাপের ওপর এসে স্থির হয়ে গেল। এইবার বোধহয় মারাই গেল সে।...

হয়ত মৃত্যু-যন্ত্রণার অসহ্য তৃষ্ণাই তাকে টেনে এনেছিল এই সামান্য জল-রেখার দিকে। হয়ত সবটাই আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র কিন্তু অমরেশের যেন মনে হ'ল অন্তিম মুহূর্তে সরীসৃপটা তার পদচিহ্নে পৌঁছে সমস্ত অপরাধের জন্য চরম ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে গেল।

কে জানে কেন, আজ সে সুহাসিনীর জন্য দুঃখবোধ করলে।

বেচারী! সে নিজেও ত কখনও শান্তি পায়নি!

সবার অলক্ষ্যে চোখের কোণ দুটো মুছে অমরেশ আবার বিছানাতে গিয়েই বসল।

'বসবেন না, বসবেন না বাবু। ভাল ক'রে দেখে নিই আগে। আর কোথাও কিছু আছে কিনা।...এই হিমে যখন সাপ বেরিয়েছে—'

'নাঃ—আর ভয় নেই!' অমরেশ বেশ জোর দিয়েই বসে।

এ জোর সে কোথায় পায় কে জানে!

# রাণু মাসিমার অসুখ

কথাটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভাল ক'রে জ্ঞান হবার আগে থেকেই আমরা শুনছি—এখন ত বয়স প্রায় চল্লিশে পৌছল। কথাটা নিশ্চয় তার আগেও বহু লোক শুনেছে। সমস্ত আত্মীয়-পরিজন-পরিচিত মিলিয়ে যে জগৎ, তার আকাশ বাতাস ঐ কথাটিতে পূর্ণ হয়ে আছে বহুকাল থেকে। বহুবার শোনার ফলে তা নিশ্চিত বিশ্বাস, এমন কি, হয়ত বা সত্যেও দাঁড়িয়ে গেছে। অন্তত সংশয় করার কথা কারুর কল্পনাতেও ওঠেনি কোনদিন।

রাণু মাসিমার শরীর খারাপ। তিনি আর বেশি দিন নন্।

এ সংবাদ কবে প্রথম কে কাকে দিয়েছিল তা আমরা জানি না। বোধ হয় কেউই জানে না আজ আর। ওঁর বাবা মা জানতেন; তাঁরা সেইজন্য যত্ন করতেন এই সন্তানটিকেই সবচেয়ে। তটস্থ থাকতেন তাঁরা। ঐ বুঝি রাণুর আবার শরীর খারাপ হ'ল—এই আশঙ্কায় সবাই কণ্টকিত থাকতেন। তাঁদের আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম-কাজ-আনন্দ-অবসরবিনোদন প্রভৃতি দিন এবং রাত্রির সমস্ত কাজ ঐ একটি কথার ওপর আবর্তিত হ'ত। 'রাণুর শরীরটা বড্ড খারাপ দিদি।' 'রাণুটার জন্যই ভাবনা ভাই'—এছাড়া তাঁর মায়ের মুখে নাকি কোন কথা থাকত না।

কেউ হয়ত বললে, 'আজকাল খুব ভাল চিংড়ি আসছে বাজারে, কর্তা আনেন না?'

'না ভাই চিংড়ি ত বাড়ী ঢোকে না, রাণুর যে চিংড়ি মাছ মোটে সহ্য হয় না!'

রাণুর শরীর খারাপ ব'লে বাড়ীর যে সবচেয়ে ভাল গরুটি তার দুধ থাকত রাণুর জন্য। বাড়ীতে সর-জ্বাল-দেওয়া ঘি হ'ত সামান্যই—সেটা শুধু রাণুর খাবার করতে, তাঁকে ভাত-পাতে দিতে কিংবা তাঁর জলখাবারের চিঁড়ে ভাজতেই ব্যয় হ'ত। দুধের মোটা সরখানা তুলে রাখা হ'ত রাণুর জন্য।

আঙুর যখন দেড় টাকা বাক্স বিক্রী হ'ত, তখনও ওর বাবা কিনে আনতেন মেয়ের জন্য। ওর শরীরটা দেখতে হবে ত! পয়সাটা বড় কথা নয়।

এতটা উদ্বেগ অস্বাভাবিক ভাবছেন আপনারা? মোটেই তা নয়। যে জ্যোতিষী রাণু মাসিমার ঠিকুজী করেছিল সে বলেছিল রাণু মাসিমার পরমায়ু খুব অল্প। তার ওপর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাণু মাসিমার যখন সর্দি জ্বর কাশি এবং আলজিবের অসুখের মাত্রা বাড়তে লাগল তখন সবাই বুঝল যে জ্যোতিষীর কথাই ঠিক—মেয়েটি আর বেশি দিন নয়। বারো মাসই খ্যাঁত খ্যাঁত করত ওঁর শরীর, সুতরাং দিনরাত পুতু পুতু না করলে চলে না।...বাপ-মায়ের স্নেহটা অবশ্য এমনিতেই বেশী পড়ার কথা ওঁর ওপর, বাগানের সেরা ফল ঐটি, সবচেয়ে সুশ্রী সন্তান। রাণুর জন্যে বাপ মায়ের গর্বের শেষ ছিল না। রাণু কাঁকরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে তাঁদের বুকে ব্যথা বাজত।

রাণু মাসিমার বিয়েও হয়েছিল তাড়াতাড়ি—ঠিক চৌদ্দ বছর বয়সে। বাঁচবেই ত না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সাধ-আহ্লাদটা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল, সেদিন এই ছিল বোধ হয় তাঁদের চিন্তা। মস্ত বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'ল, ছেলেটি বি, এ পাশ ক'রে আইন পড়ছে। আইন পাশ করে উকীল হবে। বাপ বড় উকীল, পসারের অভাব হবে না। ফুটফুটে মেয়ে দেখে তাঁরা একেবারে বিনা পয়সাতেই নিয়ে গেলেন।

কথাটা কেমন ক'রে সেখানেও রটে গেল, 'রাণু বৌমার শরীরটা বড় খারাপ, ওকে একটু সাবধানে রাখা দরকার।'

ততদিনে কিন্তু তাঁর সেই পুরোনো উপসর্গগুলো চলে গেছে। সর্দিকাশি হয় কদাচিত, জ্বরজারি তো হয়ই না। পেটেরও কোন গোলমাল হ'তে বিশেষ দেখা যায় না।

তবে?

এই তবেটারই উত্তর আমাদের জিতেন মেসোমশাই অনেক ছুটোছুটি ক'রে সংগ্রহ করেছিলেন! তখনকার দিনের বড় ডাক্তার কেদার দাসের কাছে

যাওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'শরীর ত এর খাসা আছে। কৈ রোগ ত নেই!'

ডাক্তারের এই নিবুর্দ্ধিতায় রাণু মাসিমা এমন চটে গেলেন যে, তাইতে তাঁর রোগ আরও বেড়ে গেল। কে একজন পরামর্শ দিলে শিবপুরের দীন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। তিনি দেড়ঘণ্টা বসিয়ে রেখে পরীক্ষা করে প্রায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'একে এনেছ কেন? এর ব্যামোটা কি? খোদার খাসী!'

এতে এমন 'শক' লেগেছিল যে রাণু মাসিমা সাতদিন শয্যাগত ছিলেন।

শ্বশুরশাশুড়ী স্বামী সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দেখা যাচ্ছে শরীর খারাপ—অসুখ কেন ধরতে পারছে না ডাক্তাররা?

বড় ডাক্তার আর এল দত্ত অবশেষে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'নার্ভাস ডেবিলিটি। ম্যানিয়াও কতকটা বটে—মনে করে শরীর খারাপ, তাইতে আরও শরীর খারাপ হয়। কবিরাজ দেখাও প্রবীণ দেখে।'

প্রবীণ কবিরাজ একজন বললেন, 'হ্যাঁ, দত্তমশাই ঠিকই বলেছেন। স্নায়বিক দৌর্বল্যের সঙ্গে হৃদ্‌রোগ···দুধের সর আর মিশ্রির গুঁড়োর সঙ্গে মকরধ্বজ দেবে। একছটাক করে বেদানার রসের সঙ্গে পটলের সত্ত্ব দুবার। আর সুজির রুটির পথ্য—ডুমুরের ডালনা টালনা এমনি সব ঠাণ্ডা তরকারী খাবে।'···তখন পটলের সময় নয়, বলা বাহুল্য।

এঁরা নিশ্চিন্ত হলেন যেন। অসুখ যখন একটা নিশ্চিত জানা গেল তখন আর ভাবনা কি! তারপর যত্ন আর সেবার ঠাস্‌বুনোন চলল। জিতেন মেসোমশাই বছরে দুবার চেঞ্জে নিয়ে যেতেন নিয়মিত। নিজস্ব ঝি চাকর রাখা হ'ত। যে সময়ের যেটি দুর্লভ বস্তু সেটি খেলে মাসিমার শরীর ভাল থাকে। অর্থাৎ কপির সময় পটল এবং পটলের সময় কপি। তার জন্য নতুন বাজার এবং হগ্‌ মার্কেট চষে ফেলতেন মেসোমশাই।

কোন কোন মন্দ লোক হয়তো বলতে যে, 'বাবা, ঐ শরীর খারাপ!··· মোটা মানুষ একটুতেই বুক ধড়ফড় করবে তার আর আশ্চর্য কি! আর যা

খাচ্ছে ভাল মন্দ—পেটে গ্যাস হয়ে আরও বুকে লাগে। নইলে ওর অসুখটা কোথায় ?'

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীরা থামিয়ে দিতেন, 'মোটা হওয়াটাই ত রোগ। ওটা কি স্বাস্থ্যের চেহারা ভাবছ ? জল, জল শুধু। বুকের অসুখে অম্‌নি ফোলে।'

কিন্তু জ্যোতিষীর কথা ঠিক খাটল না। রাণু মাসিমা কুড়ি থেকে ত্রিশ, ত্রিশ থেকে চল্লিশে এসে পড়লেন।

তবু তিনি কিন্তু সর্বদাই সে কথাটা স্মরণ করতেন। স্বামী ঠিক ওঁর অনুজ্ঞামত কাজ না করলে বলতেন, 'আর ক-টা দিনই বা আছি ? এই কটা দিন একটু শান্তিতে থাকতে দাও। তারপর যা খুশি তাই ক'রো। একটি কথাও বলতে আসব না।'

খাওয়ার জন্যে কোন একটা মূল্যবান ফরমাস করেই বলতেন, 'আমের এখন বড্ড দাম ? তাই ত। তা অল্প করেই আনো। খেয়ে নিই, এই হয়ত শেষ খাওয়া ! আসছে বছর আমের সময় অবধি কি আর থাকবো ?'

ছেলেমেয়েরাও এই আব্‌হাওয়ায় মানুষ হয়ে উঠল। তারা জন্মাবধিই শুনছে মায়ের শরীর খারাপ, বেশি দিন আর বাঁচবার আশা নেই। সুতরাং যা কিছু ভাল পথ্য সব মা খাবেন, তাঁরই খাওয়া উচিত। পূর্ণ বিশ্রাম চাই তাঁর। তারা ছেলেবেলাতেও কেউ চীৎকার করে কাঁদতে পায়নি। তখন থেকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে—মায়ের শরীর খারাপ, সাবধান। দাপাদাপি করে বেড়ানো, অকারণে চীৎকার করা, পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করা, এ ত স্বপ্নের অতীত। তারা চলে পা টিপে টিপে, কথা কয় আস্তে, হাসে মুচ্‌কে মুচ্‌কে।

বছর ত্রিশেক বয়সের সময় থেকেই রাণু মাসিমার স্বতন্ত্র সংসার। সুতরাং বাড়ীতে আর কেউ যে চেঁচামেচি করবে কি দাপাদাপি করবে সে সুযোগ ছিল

না! চাকর বাকররা সবাই জানতো কর্ত্রীর ভীষণ শরীর খারাপ। তারাও সেইমত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত! বোকা ঝি-চাকর রাণু মাসিমা সইতে পারতেন না, তাদের সঙ্গে অত বক্‌বে কে? বেশি কথা কইলে বুকে লাগে।

তাঁর জন্য ঘরের মধ্যেই মুখ হাত ধোবার বেসিন থাকত, ঝি থাক্‌ত সঙ্গে সঙ্গে—অষ্টপ্রহর। ওঁর সুবিধার জন্য পৈত্রিক বাড়ী ত্যাগ করে এসে বালিগঞ্জে বাংলো প্যাটার্ণ বাড়ী করলেন মেসোমশাই—যাতে দোতলা একতলার হাঙ্গামা না থাকে। রোজ বিকালে ডাক্তারের পরামর্শ-মত গাড়ীতে চেপে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন, তাইতেই সবাই চিন্তিত থাক্‌ত। প্রথমত গাড়ীবারান্দার তিনটে ধাপ ভেঙ্গে নামা, দ্বিতীয়ত পথের গোলমাল ঝাঁকুনি এ সব ত আছেই।

রাণু মাসিমা আবার কষ্ট হ'লেও মুখ বুজে সইতেন, চট করে জানা যেত না—মেসোমশাইয়ের সেই এক দুর্ভাবনা। বেশি করে চোখ রাখতে হ'ত তাঁকেই।

এম্‌নি করে আঙ্গুর যেমন তুলোয় ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়, তেমনি ক'রে তাঁকে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখা হ'ত—বহু কষ্টে ও বহু চেষ্টায়।

তবু একসময়ে জিতেন মেসোমশাই-ই আগে মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর জন্য শোক করার অবকাশই পেলেন না। এই শক্‌ লেগে রাণু মাসিমার এমন বাড়াবাড়ি হ'ল যে তাঁকে নিয়েই সকলে অস্থির। যাকে বলে যমে-মানুষে টানাটানি। এমন কি তাঁর শ্রাদ্ধটাও সারা হ'ল কোন মতে নমোনমো ক'রে—পাছে আবার সে ধাক্কায় মাসিমা আরও কাতর হন।

মাসিমার হাতে পয়সার অভাব ছিল না। বাড়ী বিষয় সবই তাঁর নামে। তিনি অতিকষ্টে বার কতক চেঞ্জে গিয়ে নিজেকে সাম্‌লে নিলেন। ছেলে মেয়ের বিয়েও হ'ল। পুত্রবধূ এবং জামাতারাও এই আব্‌হাওয়ায় নিজেদের ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত করে নিলে। সবাই জানে যেটা ধ্রুবসত্য বলে, সেটাকে বিশ্বাস করতে, এমন কি মনের মধ্যে ধারণা করে নিতেও অসুবিধা হয় না।

কোনমতে বেঁচে আছেন উনি। আহা, কি কষ্ট! সত্যি, দিনরাত অক্ষম এবং পঙ্গু শরীর টেনে টেনে চলা—এর মত দুঃখ আর নেই! কি করেই যে হাসিমুখে সব সহ্য করেন বেচারী!···

জিতেন মেসোমশাই বেঁচে থাকতে একবার, বোধ হয় প্লেগ না কী একটা একটা হিড়িকে কলকাতা থেকে ঝি-চাকর সব অন্তর্দ্ধান হয়েছিল, হোটেল সুদ্ধ বন্ধ ছিল ক'দিন। সে সময়ে হিতু, ওদের বড় ছেলে সাত বছরের, সে বাসন মাজত, জিতেন মেসোমশাই নিজে রান্না করতেন, একদিন হাতই পুড়িয়ে ফেললেন বেচারী, তবু ওঁরা কেউ রাণু মাসিমাকে কাজ করতে দেন্‌নি। রাণু মাসিমার সে আর এক কষ্ট, কম ঝগড়া করেছেন? কিন্তু হিতু বলে, 'বাবা বলতেন এই বাজারে আবার তোমার রোগ বাড়লে ডাক্তার পাবো কোথায়? ওসব মতলব ক'রো না। ঐ ত শরীর, আবার কাজ করবার সখ!···হোটেল একটা খুলতে আমরা বেঁচে গেলাম। দুবেলা খেয়ে আসতাম আর মায়ের জন্য নিয়ে আসতাম।'

হিতু স্ত্রীর কাছে গল্প করে। স্ত্রী রমার চোখ ছল্‌ছল করে শাশুড়ীর জন্য, 'আহা বেচারী!'

রাণু মাসিমা ষাট পেরিয়ে সত্তরের কাছে গেলেন এমনি করেই। কি করে যে এমন দুর্দান্ত রোগকে এতকাল ধরে কলা দেখিয়ে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ করলেন তা জানি না। কিন্তু হিতুও একদিন মারা গেল হঠাৎ।

রাণু মাসিমা এত বড় শোকে পাথর হয়ে গেলেন। তাঁকে কেউ শোক করতে দিল না অবশ্য। সবাই জানত ত যে ওঁর কী ভয়ানক অবস্থা হবে এর ফলে। সবাই তাঁকে ঘিরে বসে রইল দিনরাত। রাণু মাসিমা সে আঘাতও সহ্য করলেন কোন রকমে।

রাণু মাসিমা আজও বেঁচে আছেন। এখন তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। ইতিমধ্যে দুটি জামাই মারা গেছে, একটি মেয়ে ও আর একটি ছেলে। সব শোকই সহ্য করেছেন এমনি ক'রে।

তবে সেদিন যখন শুনলাম হিতুদার ছেলে নিতুও মারা গেল তখন মনে মনে ভাবলাম যে এইবার বুড়ী মরবে। রোজই সে খবরটার আশা করি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে চার মাস হয়ে গেল তবুও সে খবর শুনলাম না। কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠাতে গত সপ্তাহে তাঁর কাছে গিয়ে হাজিরই হ'লাম।

একটা আরাম কেদারায় শুয়েছিলেন। অতি কষ্টে সোজা হয়ে বসলেন।

'শুনেছিস রমু, আমার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল ?'

'শুনলাম মাসিমা' নত মুখে উত্তর দিই, শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কচি বৌটা, ওর মুখের দিকে চাইতে পারছি না। আমি বসে রইলুম আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে—আর সব যে যার চলে গেল। তাই কি ছাই ভগবান দেহটাকেই ভাল রেখেছেন যে ওদের জড়িয়ে নিয়ে থাকব, এই শোকে সান্ত্বনা দেব ? উল্টে ওরা আমাকে নিয়েই অস্থির ! এমন দেহ রাখবারই বা কি উদ্দেশ্য ভগবানের তা জানি না।'

বেরিয়ে আসছি ওখান থেকে, ওঁর নাত্‌নী উমা প্রণাম করে বললে, 'কাকাবাবু কখন এসেছিলেন ? ঠাকুরমাকে দেখে এলেন ?…উঃ বুড়ী ঐ দেহ নিয়ে কি ক'রে এই সবগুলো সহ্য করছে বলুন ত! ভাঙ্গা দেহটা নিয়ে চালালেও ত কম দিন নয় ! ভাবতে অবাক লাগে, না ?'

আমি বললুম, 'আমার বিস্ময়টা সেখানে নয় উমা।'

'তবে ?' অবাক হয়ে বলে সে।

'ভাবছি ঐ বিপুল দেহ নিয়ে অনবরত বসে থেকেও অত দুধ-ঘি ছানা মাখন সহ্য করেন কি ক'রে ? এত যত্নেও যে বেঁচে আছেন সেইটে ভেবে অবাক হচ্ছি। ওঁর দেহ না জানি কী মজবুত ছিল উমা।'

উমা কথাটা বুঝতে পারল না। পারবার কথাও নয়। তিন পুরুষ ধরে ওদের অস্থি মজ্জাতে এই বিশ্বাস আছে যে রাণু মাসিমার শরীরে কিছু নেই, আগাগোড়া ফোঁপ্‌রা। কোনমতে বেঁচে আছেন তিনি, এবং কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা দরকার !

সে বিশ্বাস ভাঙ্গবার চেষ্টা ক'রে লাভই বা কি ?

আমি যেন একটা ঠাট্টা করেছি, এমনি ভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে এলাম।*

* গল্পটি খানিকটা লেখা হবার পর মম-এর একটি এই ধরনের গল্প চোখে পড়ল। মূল চরিত্রে খানিকটা মিল আছে। তবু অনেকটাই নেই—সেই ভরসায় ছাপলাম।

# মহাকালের নিঃশ্বাস

পারুলের সহিত হরিপদর পরিচয় পথে-পথেই। একই রাস্তা হইতে আসে তাহারা, একই পথে ফিরিতে হয়। পারুল আসে যাদবপুর হইতে আর হরিপদ থাকে—গড়িয়াহাট রোড যেখানে যাদবপুরের দিকে মোড় ফিরিয়াছে—সেইখানে, তাহার দাদার দোকানে। দোকান সামান্যই, একই চালার নীচে দুই-তিনটি ছোট ছোট চা-পান-বিড়ি-বিস্কুট-কলা-মুড়কীর দোকান—তাহারই একটির মালিক হরিপদর দাদা কার্তিক। এইটুকু দোকান হইতে দুইটি প্রাণীর সব খরচ চালানো এম্‌নিতেই দুষ্কর, তাহার উপর পঁয়ত্রিশ টাকা মণে চাল কেনা যায় না—সুতরাং যত কাজই থাক, হরিপদকে প্রত্যহ বালিগঞ্জে কণ্ট্রোলের দোকানে গিয়া দাঁড়াইতে হয় ভোর হইতে; ফেরে কোনদিন দশটায়, কোনদিন বা বেলা বারোটা-একটায়।

এই ফিরিবার পথেই একদিন পারুল যাচিয়া হরিপদর সহিত আলাপ করিল। সেদিনও বেলা একটু বেশী হইয়া গিয়াছে, গড়িয়াহাট রোডের উত্তপ্ত পিচগলা পথ জনহীন, ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে সেই দিনের আলোতেই। হরিপদ একটু হন্ হন্ করিয়াই হাঁটিতেছিল, দাদা জানে যে চাল পাওয়া তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তবু গজ-গজ করিবেই সে। তা ছাড়া, কাজও অনেক জমিয়া থাকে, সেগুলি তাহাকেই করিতে হইবে ত, সুতরাং চাল পাওয়া মাত্র সে জোরে পা হাঁকাইতে শুরু করিয়াছে, যত তাড়াতাড়ি পৌছানো যায়।

পারুল পথের ধারে একটা গাছতলায় বসিয়াছিল, হরিপদকে ডাকিয়া কহিল, একটু দাঁড়াও না, আমি তোমার সঙ্গে যাবো—'

বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া হরিপদ ফিরিয়া দেখিল, বছর তেরো-চৌদ্দ কী পনেরোর একটি রোগা মেয়ে, বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উঠিয়া কাছে আসিয়া দাড়াইয়াছে। সে ঈষৎ রুক্ষ স্বরেই জবাব দিল, 'আমার সাথে যেয়ে আর তোমার কি চারটে হাত বেরোবে? পথ ত খোলাই রয়েছে!'

পারুলও রীতিমত ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, 'আহা কী কথার ছিরি গো! পথ যে খোলা রয়েছে তা যেন আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। ঐ দোতলা বাড়ীতে যে পাঞ্জাবী সিপাইগুলো থাকে, আমাকে দেখতে পেলে বড্ড ঠাট্টা-তামাসা করে, কেমন ক'রে তাকায় যেন। আমার বড্ড ভয় করে একলা যেতে।'

অগত্যা হরিপদকে গতি একটু কমাইতে হইল, নহিলে পারুল তাহার সহিত চলিতে পারে না। চলিতে চলিতেই সে কহিল, 'কত ত মেয়েলোক আসে, তাদের সঙ্গে যেতে পারোনি!'

'তাইত আসি, আজ যে সব্বাই আগে চাল নিয়ে চলে গেছে, আমি পড়ে গেছি সকলের শেষে—'

এই হইল আলাপের সূত্রপাত। সে আলাপ আরও ঘনিষ্ঠ হইল তিনচার-দিন পরে। সে-ও এম্‌নি ফিরিবার পথে, দুপুর বেলাতেই। হরিপদ চাল লইয়া একাই ফিরিতেছিল, সহসা—পথটা যেখানে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া একটা গোল দ্বীপকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে, তাহারই কাছাকাছি আসিয়া দেখিল, একটা গাছতলায় হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া পারুল একদৃষ্টে কী দেখিতেছে। সে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া দূর হইতে প্রশ্ন করিল, 'কী দেখছ গা খুকী?'

তাহার কণ্ঠস্বরে পারুল সোজা হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই হরিপদ দেখিল তাহার দুই চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার এ কান্নার কারণও জানা গেল আর একটু কাছে আসিতেই, একটি কঙ্কালাবিশিষ্ট স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া আছে, আর তাহারই একটি বৎসর-খানেকের শিশু তখনও তাহার স্তন্য পান করিতেছে, আর একটি বছর আড়াই-এর মেয়ে দূরে বসিয়া আপন মনে খেলা করিতেছে।

হরিপদ যেন একটু হতাশ হইল, কহিল, 'এই!···আমি বলি আরও কি! মেয়েলোকটা না খেয়ে মরে গিয়েছে। এখন অমন হামেসাই হচ্ছে।'

পারুলের সেদিকে কান ছিল না। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'এদের কি হবে?'

বেশ নিশ্চিন্ত স্বরেই হরিপদ জবাব দিল, 'কি আর হবে। ওরাই কি বাঁচবে ?...আজ, নয় কাল।'

'ওদের, ওদের কেউ নিয়ে যাবে না ?—'

'কে নিয়ে যাবে! নিজেরাই খেতে পাচ্ছে না, আবার ঐ পাপ কে জড়াবে ?..তুমিই নিয়ে যাওনা খুকী—মানুষ করবে।'

বোধ করি এই প্রশ্নটাই বহুক্ষণ যাবৎ পারুলকে পীড়া দিতেছিল, সে বিদ্রূপটা ঝিতেও পারিল না। বেশ সহজ ভাবেই জবাব দিল, 'আমিও তাই ভাবছিলুম। কন্তু বাবা বড্ড রাগারাগি করবে। মোটে তেইশ টাকা মাইনে পান—একবেলা খয়ে থাকি আমরা। মা ত কিছু করতে পারে না!...না, সে বাবা রাখতেও দবে না—'

হরিপদ কহিল, 'তবে আর দয়াতে কাজ নেই, চলে এসো।'

প্রায় শিহরিয়া উঠিয়া পারুল কহিল, 'ওরা অম্‌নি পড়ে থাক্‌বে ?'

'হ্যাঁ, তা থাকবে বৈকি!...কে আর নেবে ?'

আরও একটু ইতস্তত করিয়া পারুল কহিল 'তুমি নিয়ে যেতে পারো না ?'

'হ্যাঁ—তাই না! তাহ'লে আমার দাদা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে!...এস, এস, তুমি চলে এস, আমাদেরই কবে ঐ দশা হয় তার নেই ঠিক—আমরা আবার দয়া করব—'

অগত্যা ফিরিতে হইল। কিন্তু পারুলের কান্না থামিল না, সে সমস্ত পথটাই চাখ মুছিতে মুছিতে এবং ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিল। হরিপদর সহিত আর কথা কহিল না কিংবা অন্য কোন বৃথা বিলাপও করিল না, শুধু তাহার কান্না দখিয়া মনে হইতে লাগিল যে তাহার বুকটা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—

পরের দিন রাত থাকিতেই, হরিপদ সবে উঠিয়া কণ্ট্রোলের দোকানে যাইবে লিয়া তৈরী হইতেছে, তাহাদের দোকান-ঘরের দরজায় ঘা পড়িল। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, পারুল।

'আরে তুমি ডাকছ ? আমি বলি এত ভোরে কে ঘা দেয় দোরে—'

'আজকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে কিনা, সব্বাই চলে গেছে আগেই—। একা আমার সেখান দিয়ে যেতে ভয় করবে, তাই—'

'বেশ ত, চলো—'

হরিপদ কাঁধে গামছাটা ফেলিয়া দাদার পিছন হইতে গোটা দুই বিড়ি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এইবার তাহাদের আলাপ দ্রুত জমিয়া উঠিল। পারুলদের যাদবপুরে বহুকালের বাস, খাজনার জমিতে নিজেদের ঘরও আছে। আগে তাহার বাবা কোন্ কারখানায় কাজ করিত, সেখানে বেশী মাহিনা ছিল, তা ছাড়া তাহার মা-ও অবসর সময়ে ঠোঙা তৈয়ারী করিয়া, দু'পয়সা রোজগার করিত—অবস্থা ছিল সচ্ছলই। সহসা আগের কারখানাটি উঠিয়া গেল, বাবারও উপার্জন কমিল, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মা পড়িল শয্যাশায়ী হইয়া ; তাহার উপর এই দিন-কাল —বাবার সামান্য উপার্জনে কিছুতেই চলে না। ষোল সের চাল আর তেইশটি টাকা বেতন এইমাত্র ভরসা। সে, তাহার তিনটি ভাই-বোন এবং বাবা-মা, একবেলাও তাহাতে চলে না। ছোট ভাই-বোনগুলি অনাহারে এমন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে আর চেনা যায় না। বাবা ত সকালে না খাইয়াই অফিসে চলিয়া যায় ; পারুল অত বেলায় গিয়া রান্না করে, ভাই-বোনদের খাওয়ায় আর বাবার ভাত জল দিয়া রাখে। সন্ধ্যা হইতেই ছোট ভাইবোনেদের ঘুম পাড়াইতে হয়, নয়ত তাহারা বাবার ভাত খাইবার সময় এমন বায়না করে! একেবারে ছোট যেটি, সেটিকে রাত্রে তুলিয়া আমানি খাওয়ানো হয়—ইত্যাদি!

হরিপদর ইতিহাসও বিশেষ সুবিধার নয়। দেশ তাহার মেদিনীপুর জেলায়, জমি-জমা বলিতে গেলে কিছুই নাই, জন-খাটিয়া খাইত। দেশ ছাড়িয়া ইতিপূর্বে কখনও বাহির হয় নাই, দাদা যখন দোকান দিতে এখানে আসে তখন সে বিদ্রূপই করিয়াছিল। কিন্তু এবারের ঝড়ে যখন বাড়ী-ঘর সব ভূমিসাৎ হইল তখন আর দেশে থাকা চলিল না। খাইবে কি, মজুরী দিবে কে? বৌ আর একটি মেয়ে মাত্র তাহার সংসারে—কিন্তু তবুও খরচা ত কম নয়। অগত্যা

তাহাদের লইয়া পদব্রজেই একদা দেশ ছাড়িতে লইয়াছিল। করগুলিতে তাহার শ্বশুরের কাছে তাহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া সে দাদার কাছে চলিয়া আসে কাজ-কর্মের চেষ্টায়। দাদার অবস্থাও বিশেষ সচ্ছল নয়, সুতরাং সে ভাইকে দেখিয়া খুশী হয় নাই। দাদার সংসার নাই সত্য কথা, বহুদিন আগে সে সব বালাই তাহার ঘুচিয়া গিয়াছে, তবু তাহার সামান্য কিছু নেশা-ভাং আছে—সেই সব খরচই চলেনা এই সামান্য দোকান হইতে। নিতান্ত ভাই বলিয়া ঠেলিতে পারে নাই, আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে কিন্তু ভূতের মত খাটাইয়া লয়। এখানে আসিয়া পর্যন্ত হরিপদর এমন অবসর হইল না যে কাজের চেষ্টা করে। সারাদিন দোকানে খাটিতে হয় আর সকালটা ত কাটে এই এক সের চালের জন্য।

পারুলের দৃষ্টি সমবেদনায় ছল্ ছল্ করিয়া ওঠে, 'আহা, কতদিন তোমার মেয়েকে দেখনি, না? মন কেমন করে খুব? কতবড় হবে সে এখন?'

'তা হবে', হরিপদ জবাব দেয় শেষ কথাটারই, 'ছ'সাত বছরের কম নয়।'

'আর ছেলেপুলে হয় নি?'

'হয়েছিল দুটো'—হরিপদ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'দুটোই বেটাছেলে। মোদ্দা বাঁচাতে পারলুম না। একটা আঁতুড়েই গেল, আর একটা এক বছরের হয়ে।'

ততক্ষণে তাহারা লাইনের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষের লাইন, একধারে পুরুষ আর এক ধারে স্ত্রীলোক। মেয়েছেলেই বেশী—ছেলেমেয়ে লইয়া রাস্তায়, ফুটপাথে সব সারি সারি বসিয়াছে, ছেঁড়া ময়লা ফালি জড়ানো, প্রায় উলঙ্গ—প্রেতমূর্তির মত বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছে। পুরুষদের লাইনে বৃদ্ধ আর শিশুর দলই বেশী, তাহাদেরও ঐ অবস্থা। যোয়ান যাহারা তাহারাও অনশনে আর অর্ধাশনে শীর্ণ, কুব্জ হইয়া গিয়াছে—বৃদ্ধের সহিত বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেদিকে চাহিলে সবটা জড়াইয়া যেন মনে হয় সমগ্র বাংলাদেশের আত্মা নগ্ন-বীভৎস মূর্তিতে লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া শুধু বলিতেছে, 'ম্যায় ভুখা হুঁ!'...

পারুল তাড়াতাড়ি একবার লাইন দুইটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, 'তোমাদের লাইন এখনও ছোট আছে। যদি আগে হয়ে যায় ত দাঁড়িও একটু ঐখানটায়।'

তাহার পর ছুটিয়া গিয়া নিজেদের লাইনে বসিয়া পড়ে

•

সত্যই সেদিন হরিপদ আগে চাল পাইয়া যায়। পারুলদের লাইন ছিল মস্ত বড়, পারুল পর্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই চাল গেল ফুরাইয়া। বেলাও হইল অত, চালও মিলিল না। পারুল শুষ্ক মুখে নিঃশব্দে হরিপদর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'চাল পেলে না মোটে? তবে কি হবে?'

'বাবার অফিসের দরুন দুটি এখনও পড়ে আছে কিন্তু কাল তাহলে আর এক দানাও থাকবে না। কাল আরও রাত থাকতে আসতে হবে।'

হরিপদ একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, 'ভারী রাতে আসতে ভয় করবে না? বাড়ী জানা থাকলে আমিই না হয় ডেকে নিতুম-

পারুল আশ্বাসের সুরে কহিল, 'তার দরকার হবে না। আগে যদি উঠতে পারি, পাড়ার কাউকে ডেকে নেব; সবাই ত আগে আসতে চায়—'

দুজনে নীরবে পথ চলিতে লাগিল। ভিড়টা ছাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন পথে পড়িয়া পারুল কহিল, 'বড্ড তেষ্টা পেয়ে গেছে, টিউব কলটা চালাবে একটু, জল খেয়ে নেব?'

হরিপদ একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল। ক্রমাগত অনাহারে মুখ এতই শুকাইয়া গিয়াছে যে নূতন করিয়া কোন শুষ্কতা চোখে পড়ে না। সে কহিল, 'একেবারে খালি পেটেই জল খাবে—?'

পারুল হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'তুমি ত আচ্ছা মজার লোক! আমি যেন তোমার কুটুম্ব! শুধু পেটে জল খাবোনা ত কোথায় কি পাবে?'

হরিপদ কহিল, 'একটা ডবল পয়সা আছে আমার কাছে, বাতাসা কিনে নেব?'

'না না, বাতাসা চাইনে। তুমি এমনি জল চালাও, আমার আর আগেকার মত যখন-তখন ক্ষিদেও পায় না।'

হরিপদ টিউব-ওয়েল পাম্প করিতে লাগিল, পারুল আকণ্ঠ জল পান করিয়া 'আঃ' বলিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'শরীরটা ঠাণ্ডা হ'ল! এইবার চলো। তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়ী পৌঁছতে হবে। বেলা হল ঢের।'

কিন্তু তাড়াতাড়ি তবু হয় না। কে একটা কঙ্কালসার শিশুকে গাছতলায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে—বয়স কত চেহারা দেখিয়া অনুমান করা শক্ত, তবে এক বৎসরের বেশী নয় কিছুতেই।

পারুল আগেকার মত ছুটিয়া কাছে গেল না, তবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, অসহায় আর্তদৃষ্টি মেলিয়া হরিপদের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'এখনও বেঁচে আছে যে!'

হরিপদ শুধু কহিল, 'হ্যাঁ, তাইত আছে দেখছি।'

'তবে? ওর মা ফেলে রেখে চলে গেছে?—কাছেই কোথাও গেছে, না? ফিরে আসবে বোধ হয় এখনই—কি বলো?'

তাহাকে আঘাত করিবার ইচ্ছা হরিপদর ছিল না, তবে কথাগুলি নিজের অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া যায়, 'ফিরেই যে আসবে তার ঠিক কি, হয়ত ফেলে দিয়েই গেছে। চোখের সামনে ছেলে মরার চেয়ে ফেলে দিয়ে যাওয়া ভাল—যা হয় চোখের আড়ালে হোক।'

শিহরিয়া উঠিয়া পারুল কহিল, 'তাই বলে জেনে শুনে, নিজের পেটের ছেলে—জ্যান্ত অবস্থায়?'

'জ্যান্ত কি আর থাকবে! ও আর কতক্ষণ। এম্‌নি না মরে, শ্যাল-কুকুরে খাবে।'

ছেলেটার কান্না মানুষের আওয়াজে আরও বাড়িয়া গেল, কিন্তু সে কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ মনে হয় পাখীর বাচ্চা কাঁদিতেছে। পারুল দুই পা গিয়াও আবার ফিরিয়া আসিল। হরিপদকে কহিল, 'আমার কাছে চালের পয়সা আছে তা' থেকে দু'পয়সা যদি দিই, একটু দুধ এনে খাওয়াতে পারো ?'

হরিপদ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, কহিল, 'লাভ কি তাতে ? ছেলেটাকে ত আর তুমি বাড়ী নিয়ে যেতে পারছ না, বারমাস পুষতেও পারবে না। খামকা দুটো পয়সাই তোমার যাবে। দু'ঘণ্টা আগে মরত না হয় দু'ঘণ্টা পরে মরবে, এইত !'

'তা বটে।' পারুল দাঁতে দাঁত চাপিয়া চলিতে শুরু করিল। ছেলেটার চিঁ-চিঁ কান্না যেন বহুদূর পর্যন্ত তাহার পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া চলিল।

দুপুর বেলা পথের ধারে ধারে হাঁড়ি চড়িয়াছে। রাশি রাশি বুনো কচুর শাক কেহ সিদ্ধ করিতে চাপাইয়াছে, কেহ হাঁড়িতে জল চাপাইয়া ভাঙ্গা বঁটির সাহায্যে খোসা ছাড়াইতেছে। অন্য কোন খাদ্য নাই। কিন্তু তাহারই জন্য লুব্ধ বুভুক্ষুর দল দূরে অপেক্ষা করিতেছে—তাহাদের কোটরগত চক্ষু হইতে স্তিমিত অথচ একাগ্রদৃষ্টি স্থির হইয়া আছে সেই কচু-সিদ্ধগুলির দিকে।

চলিতে চলিতে পারুল কহিল, 'মাঠে আমাদের কচু শাক সাবাড় হয়ে গেল এদের জন্যে। বাবা ত বকাবকি করে দেখতে পেলে, কিন্তু আমি কিছু বলি না। ঐগুলো খেয়ে ওদের জীবন-ধারণ হয় ত হোক্।'

পারুল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আরে আমার বৌদি যে।'

হরিপদ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'বৌদি ?'

'আমার খুড়তুতো দাদার বৌ। ঐ যে শিরীষ গাছে গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসে আছে—'

হরিপদ চাহিয়া দেখিল কুড়ি একুশ বছরের একটি মেয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বোধকরি ঘুমাইয়াই পড়িয়াছে। শতছিন্ন বস্ত্রে দেহের অধিকাংশই

অনাবৃত, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। অনাহারে আর ক্লান্তিতে কোন মতে কাপড়টা জড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পারুল কহিল, 'এসেছে ঐ দলের সঙ্গে। আজ ওরও বোধ হয় কচু ভরসা। তুমি একটু দাঁড়াও আমি কথা বলে আসি।'

হরিপদ তাহার একটা হাত ধরিয়া বাধা দিয়া কহিল, 'থাক—লজ্জা পাবে।'

পারুল কথাটা বুঝিল। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেদিক হইতে মুখটা ফিরাইয়া লইল।

হরিপদর দোকানের কাছাকাছি একটা গাছতলায় ততক্ষণে ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। হরিপদ একটু দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া দেখিল, একটি মেয়েছেলের ভিরমি লাগিয়াছে, তাহারই দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া অসহায়ভাবে কাঁদিতেছে, আর সবচেয়ে ছোট যেটি, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মাকে লাথি কিল—যথেচ্ছ মারিয়া চলিয়াছে।

'ও কিছু নয়' বলিয়া, হরিপদ পারুলকে লইয়া আগাইয়া গেল।

পরের দিন ভোর বেলা পারুল আসিয়া দেখিল, হরিপদ তখনই প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। অন্ধকারেই ঠাওর করিয়া কাছে আসিতে হরিপদ কহিল, 'দেখো ওধারে একটা মড়া আছে—'

'মড়া ?' পারুল শিহরিয়া উঠিয়া হরিপদর একেবারে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। সত্যই, সে এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই, হরিপদদের দোকানের পাশে একটা কী পড়িয়া আছে। 'এখানে মড়া কোথা থেকে এল ?'

'ও একটা মেয়েছেলে' কাল সন্ধ্যার দিকে এসে পড়ল ঐখানে। তারপর ঘণ্টা-দুই বোধ হয় খাবি খেয়েছিল—ব্যস্ ফক্কা!'

'কি হয়েছিল ?'

'হয়েছিল ? আচ্ছা মজার লোক ত তুমি। হবে আবার কি—না খেয়ে মারা গেল। ওত আজকাল হামেশাই হচ্ছে, নতুন আর কি! রেলে ইষ্টিশানে, পথে ঘাটে—হুদো হুদো লোক মরছে। কেন, তুমি কি দেখনি।'

কিসের যেন একটা অব্যক্ত ভয়ে পারুলের দেহ হিম হইয়া গিয়াছিল। সে শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, 'তা মেয়েছেলেটাকে তোমরা বাঁচাবার চেষ্টা করলেনা? কিছু দুধ-টুধ—'

হরিপদ হাসিয়া কহিল, 'তবে আর ছেলেমানুষ বলছে কেন!...ও যখন এসে পড়েছে তখন আর ওর কিছু খাবার ক্ষমতা আছে মনে করো!...কিছু দিতে গেলে সেইটেই নষ্ট হ'ত। দেখবে ওর চেহারাটা?'

সে ফস্ করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল। চেহারা দেখিয়া বোঝা যায় না পুরুষ কি স্ত্রীলোক, এমনি শুকাইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকত্বের কোন লক্ষণই নাই, শুধু জট-পাকানো বড় চুল ছাড়া। অতিশয় শুষ্ক পাতলা একটা চামড়া মাত্র অস্থির উপর জড়াইয়া আছে। আর সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার মত তাহার পেট—এতই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় সেখানটা শূন্য, কিছু নাই। পিঠের চামড়া আর পেটের চামড়া এক হইয়া গিয়াছে, মধ্যে যেন হাড় পর্যন্ত নাই।...

সেদিকে কয়েক মুহূর্ত মাত্র চাহিয়াই পারুলের মাথা ঘুরিতে লাগিল, ভাগ্যক্রমে কাঠিটাও তখন নিভিয়া গিয়াছে। হরিপদ পোড়া কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'চলো, ওসব আর দেখেনা। দেখলেই মন খারাপ।...কী ক'রে যে ঐ অবস্থায় ও হাঁটছিল এইতেই আশ্চয্যি হচ্ছি। অভ্যেসে শুধু হাঁটছিল যেন—এল, পড়ল, দুফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল কষ বেয়ে—ব্যস্, অক্কা!'

পারুল ভাবিতেছিল স্ত্রীলোকটির কথা। হয়ত তাহাদেরই মত গৃহস্থ ছিল। সে—স্বামী, পুত্র, কন্যা, ঘর-দ্বার সবই ছিল। কত পাল-পার্বণ পূজা-অর্চনা করিয়াছে এক কালে। আজ সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পথের ধারে পড়িয়া অনাহারে মারা গেল। আত্মীয়স্বজনও হয়ত সব এই ভাবেই গিয়াছে, কিংবা আজও আছে, কেহ জানিতেও পারিল না যে এইখানে ইহার জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল। হয়ত কল্যাকার সেই বধূটির মতই ইহারও কিছু সম্ভ্রম বোধ ছিল—তাই ভিক্ষা করিবার কৌশলটা আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

দুজনে নিঃশব্দে পথ চলিতেছিল। পারুলের দলের লোক উহাকে হরিপদর সঙ্গে গল্প করিতে দেখিয়া আগেই চলিয়া গিয়াছিল। সহসা পথের পাশে কী একটা শব্দ শুনিয়া দুজনেই সচকিত হইয়া উঠিল। একটুখানি ঠাওর করিয়া দেখিল, একটা ডাস্টবিনের পাশে দুটি-তিনটি নরনারী তখনই বসিয়া জঞ্জালের গাদা ঘাঁটিতেছে, যদি আগের দিনের গৃহস্থদের ভুক্তাবিশিষ্ট কিছু জঞ্জালের মধ্যে পড়িয়া থাকে এই আশায়। বেলা হইলে আরও ভাগীদার জুটিবে, সেইজন্য রাত থাকিতেও তাহারা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কাজ সারিতেছে। বোধ হয় বিশেষ কিছু ছিল না, একজন চিবানো ডাঁটার ছিব্‌ড়াগুলিই ক্ষুধার জ্বালায় পুনরায় চুষিতেছে, যদি কিছু রস তখনও তাহাতে থাকে।

পারুল আর দেখিতে পারিল না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'আর একজন কেউ থাকৃত ত তাকে কণ্ট্রোলে পাঠিয়ে আমি ঘরে বসে থাকতুম। আমি একলা হ'লে আসতুমও না—ঘরে পড়েই ঐ মেয়েছেলেটার মত না হয় শুকিয়ে মরে যেতুম একদিন।'

হরিপদ জবাব দিল না। সে দুর্ভিক্ষের মধ্য হইতেই আসিয়াছে, সে জানে এসব ব্যাপারে বিচলিত হইবার কিছু নাই।

কিন্তু অত ভোরে আসা সত্ত্বেও, সেদিনও পারুল চাল পাইল না। কারণটা কিছু বোঝা গেল না। কেহ বলিল, দোকানদারই কাল চাল কম পাইয়াছিল, কেহ বলিল, বদমাইসী। চাল আছে ঘরে, পিছন হইতে চড়া দামে বেচিবে।

হরিপদ তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'কী হবে তা' হলে তোমাদের?'

ম্লান হাসিয়া পারুল জবাব দিল, 'উপোস। আমাদের জন্যে ভাবি না। বাবা কারখানা থেকে এলে কি দেব তাই ভাব্‌ছি। আর বাচ্চা ভাইটা, খোকা যা চেঁচায়—উঃ। এমনিতেই পাগল করে দেয়।'

হরিপদর হাতে নিজের চালের ঠোঙাটা তাহাকে যেন বিঁধিতে লাগিল। চালটা তাহার নিজের হইলে সে এখনই পারুলকে দিয়া নিজে উপবাস করিত,

কিন্তু দাদার ক্রুদ্ধ মুখ স্মরণ করিয়া তাহার সাহসে কুলাইল না। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, 'তা ছ' আনা পয়সা ত আছে তোমার কাছে, তাইতেই যা হয় কিনে নিলে না কেন দোকান থেকে—'

পারুল সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'ওরে বাবা, সে আমি পারব না। সে বাবা বড্ড রাগারাগি করবে। আর একদিন আমি নিয়েছিলুম ঐ রকম, যা ঠেঙ্গানি দিয়েছিল !'

আবার কিছুক্ষণ তুজনে নিঃশব্দে চলিল। হরিপদ ইতিমধ্যে দোকান হইতে তুই একটি করিয়া পয়সা সরাইয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল সুদূর ভবিষ্যতে যখন স্ত্রী-কন্যার কাছে যাইবার সময় আসিবে, তখন স্ত্রীর জন্য একটা শাড়ী, ও কন্যার জন্য একটা জামা লইয়া যাইবে। তাহারই দরুন আনা-বারো পয়সা তাহার ট্যাঁকে গোঁজা ছিল। সেটা সে কিছুতেই, কোন কারণে খরচ করিবে না, এই ছিল তাহার সংকল্প।

কিন্তু আর একবার পারুলের শুষ্ক, ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছুতেই সে সংকল্প বজায় রাখিতে পারিল না। আরও কয়েক পা গিয়া সে ফিরিল। কহিল, 'চলো দেখি - '

'কোথায় ?' বিস্মিত হইয়া পারুল প্রশ্ন করিল।

'চলো না—বাজারেই যাবো।'

পারুল তখনও বুঝিতে পারে নাই কথাটা, একটু বিস্মিতভাবেই তাহার অনুসরণ করিল। বাজারের মধ্যে একটা হিন্দুস্থানীর দোকানে গিয়া হরিপদ চালের দর করিল। সে লোকটা বলিল, 'চৌদ্দ আনা সের।'

'কৈ দেখি তোমার পয়সাগুলো—'

তাহার পর একরকম জোর করিয়াই পারুলের আঁচল হইতে পয়সাগুলা খুলিয়া লইয়া নিজের ট্যাঁকের পয়সা হইতে আট আনা যোগ করিয়া দোকান-দারের হাতে দিল, 'দাও এক সের চাল।'

ফিরিবার পথে পারুল ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'এ কী করলে, তুমি পয়সা কোথা থেকে পেলে। দাদা রাগ করবে না ?'···

উপর্যুপরি প্রশ্নের পর হরিপদ শুধু বলিল, 'ওটা দাদার পয়সা নয়। ওটা আমি জমিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম দেশে যাবার সময় বৌ'র জন্য একটা শাড়ী নিয়ে যাবো—'

'তবে ?' পারুল আরও ব্যস্ত হইয়া উঠিল, 'দেখ দিকি বাপু কী অন্যায়—'

বাধা দিয়া হরিপদ জবাব দিল; 'অন্যায় আর কি। চার-পাঁচ টাকার কমে ত আর একটা কাপড় হবে না। সে টাকা যদি হয়ত আট আনার জন্যে আট্‌কাবে না।'

কথাটা আর বেশী দূর গেল না। একটা চাল বোঝাই গরুর গাড়ী বোধ হয় সেই পথে গিয়াছে, তাহারই কোন বস্তার সূক্ষ্মতম ফুটা হইতে দুই-একটি দানা পড়িতে পড়িতে গিয়াছে ; কতকগুলি কঙ্কালসার নর-নারী সেই চালগুলিই পথ হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে এবং তাহা লইয়া বিবাদও শুরু হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই—। সে দিকে চাহিয়া দুইজনেই যেন কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হইয়া গেল।···ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে রৌদ্র, রাস্তা প্রায় জনহীন। দূর গৃহস্থ বাড়ীর দরজায় বুভুক্ষু নর-নারী চীৎকার করিতেছে, 'মাগো, ওমা, একটু ফ্যান দে মা', 'বাচ্চাটা মরে যায় মা', 'এক মুঠো ভাত দে মা—'

খানিকটা চুপ করিয়া পারুল কহিল, 'এত সব লোক উপোস ক'রে রয়েছে, মরছে কত লোক—একদিন না হয় আমরাও উপোস করতুম !'

ক্লান্ত স্বরে হরিপদ জবাব দিল, 'তাই যদি হয় তা'হলে আমার বৌ-এর একটা কাপড়ই কি এত বড় হ'ল। তুমি আর বোকনি বাপু, চুপ করো।'

পরের দিন পারুল হরিপদকে আর ডাকে নাই, দলবলের সঙ্গেই হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। হরিপদ অথচ তাহার ভরসাতেই বসিয়া আছে। সে পারুলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কাছে আসিয়া বলিল, 'ডাক্‌লে না যে বড় আজ, ও খুকী !'

এতদিন পরে আজ তাহাকে পুনরায় খুকী বলিতে শুনিয়া পারুলের হাসি পাইল। তবু মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, 'তোমাকে দেখতে পাইনি, ভাবলুম তুমি চলে গিয়েছ—'

সেদিন আলাপ আর জমিল না। কে জানে কেন, পারুল কিছুতেই তাহার সঙ্গীদের দল ছাড়িল না। হরিপদ ব্যাপারটা বুঝিল না, তবে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল যে ফিরিবার পথে একটা বোঝা-পড়া করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু ফিরিবার পথে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও পারুলের দেখা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সে নির্লজ্জের মত মেয়েদের লাইনটা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিল—কোথাও পারুল নাই। যেন বাতাসে উবিয়া গিয়াছে। সে হতাশ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র মাথায় করিয়া একাই ফিরিল। পারুল রাগ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কেন যে রাগ করিয়াছে তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও ধারণা করিতে পারিল না।

দোকানে ফিরিয়া দেখিল তাহার নামে একখানি চিঠি আসিয়াছে। তাহার শ্বশুর লিখিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থাও খুব খারাপ হইয়াছে, এক বেলা আহারও সেখানে জুটিতেছে না। সকলকারই চেহারা যৎপরোনাস্তি খারাপ হইয়া গিয়াছে—এমন কি তাহার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিলে হরিপদ চিনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এই সব কারণে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, সিংভূম জেলার কোন্ জমিদার খোরাকী ও সামান্য বেতন দিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই নাকি কাজে লাগাইতেছে—সেইখানেই তাঁহারা কিছুদিনের জন্য খাটিতে যাইবেন। অতএব হরিপদ যেন অবিলম্বে তাহার স্ত্রীপুত্রকে লইয়া আসে। নহিলে, সেও যদি তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই চলিয়া যাইতে পারেন, ইত্যাদি—

চিঠি পাইয়া হরিপদ বসিয়া পড়িল। তাহার শ্বশুর মহাশয়রা সম্পন্ন চাষী—এমন কি আর একটু লেখাপড়ার চর্চা থাকিলে তাঁহাদের ভদ্রলোকই বলা চলিত। জমি-জমা, গরু-বাছুর, বাগান-পুকুর—অভাব কিছুরই ছিল না। তাঁহারা

যে কতখানি অভাব ও দৈহিক কষ্টে ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া আজ বিদেশে 'জন' খাটিতে যাইতেছেন তাহা অনুভব করিয়া হরিপদ স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার বৌ আর মেয়ে অন্তত দুইবেলা দুইমুঠা পাইবে—এ ভরসা তাহার খুবই ছিল। কিন্তু—

দাদা পরামর্শ দিল, যে সে যদি অতদূর বিদেশে স্ত্রী কন্যাকে লইয়া যাইতে রাজি না থাকে ত তাহাদের লইয়া চলিয়া আসুক এখানে। অনেক গৃহস্থ বাড়ীতে তাহার চেনাশুনা আছে, সে বলিয়া দিলে বৌমার কাজের অভাব হইবে না। সে তাহাদের লইয়া আসুক।

দাদা যে তাহাকে হাতছাড়া করিতে চাহে না, তাহা হরিপদ বুঝিল। ইখানে চিরকাল পেটভাতে খাটার প্রস্তাবটা তাহার মনে লাগিল না বটে কিন্তু মুখেও কিছু জানাইল না। দাদা যদি গাড়ীভাড়াটা দেয় ত দিক্। স্থির হইল আগামী পরশু দিনই দাদা টাকা যোগাড় করিয়া দিবে।

পরের দিন ভোর বেলা পারুলকে আবার দেখা গেল। 'তোমরা এগোও গো' বলিয়া একটা হাঁক দিয়া হরিপদর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভোরের সামান্য আলোতেই হরিপদ দেখিল পারুল যেন হাঁপাইতেছে, তাহার মুখও শুষ্ক।

'কাল কি হয়েছিল? কত খুঁজলাম।'

'কালও এখানে চাল পাইনি যে, তাই ওদিকে যে আর একটা কণ্ট্রোলের দোকান আছে, সেইখানে গিছলাম।'

'তারপর, চাল পেলে?'

'না।' বলিয়া পারুল হাসিল।

'তা হলে কালও কি উপোসে কাটল?'

'কাটল বৈকি! চাল কোথায়? বাবার চাল পেতে সেই কাল। আজও অদৃষ্টে হয়ত হরিমটর আছে।—অবিশ্যি বাবা বলে দিয়েছে চাল না পেলে ছাতু নিয়ে যেতে। আধসের ছাতু ছ' আনায় হবেত?'

একথা সেকথার পর হরিপদ কহিল, 'আর বোধ হয় দেখা হবেনা আমাদের।'

চমকিয়া উঠিয়া পারুল কহিল, 'কেন?'

হরিপদ সব খুলিয়া বলিল। পারুলের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, 'তা ব'লে সব্বাই সেই অতদূরে চলে যাবে? দেশভুঁই ছেড়ে?'

'কী করব, তবু সেখানে গেলে খেতে পাব ত। নইলে এম্‌নি করে একদিন মরতে হবে সবাইকে।'

পারুল আর কথা কহিল না, শুধু অনেকক্ষণ পরে একবার প্রশ্ন করিল, 'কাল কখন যাবে?'

হরিপদ জবাব দিল 'দশটায় গাড়ী—।'

পরের দিন হরিপদর আর কণ্ট্রোলে যাইবার কথা ছিল না, তবু সে ভোর বেলা উঠিয়া বসিয়া ছিল। পারুল যে আজ অন্ততঃ একবার শেষ দেখা দিতে আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। তা ছাড়া, এইত তাহার পথ।

একটু পরেই পারুলকে দেখা গেল তিন চারিটি স্ত্রীলোকের সহিত আসিতেছে। সহসা এক সময়ে দল ছাড়া হইয়া হরিপদর কাছে আসিয়া আঁচলের মধ্য হইতে একখানা ধোয়া শাড়ী বাহির করিয়া তাহার কোলে ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'এই শাড়ীখানা তোমার বৌকে দিও, আমার নাম ক'রে বলো আমি দিয়েছি। গত বছর পূজোয় বাবা কিনে দিয়েছিল, আমি তিনদিন না চারদিন পরেছি, তারপর কাচা বাক্সে তোলা ছিল।'

বলিয়াই সে আবার ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হরিপদ তাহাকে জোর করিয়া আটকাইয়া কহিল, 'কাপড় ত নিয়ে এলে, তারপর, বাবাকে কি বলবে?...এ তুমি নিয়ে যাও, মিছিমিছি—'

'না না, বাবা কিছু জানতে পারবে না। বাবার অত কাপড়-জামার হিসেব থাকে না।'

সে জোর করিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া এক দৌড়ে আবার নিজের দলকে ধরিয়া ফেলিল।

শাড়ীখানা হরিপদর কোলেই পড়িয়া রহিল।*

*এই গল্পের রচনা কাল শ্রাবণ—১৩৫০

# চোর! চোর!

অকস্মাৎ কোলাহলের একটা তপ্ত শলাকা যেন গলিটার শান্ত স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে চলে গেল—এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। আর্ত কোলাহল একটা।—সমবেত অনেকগুলো লোকের দ্রুত পদশব্দ, তার পর চোখের পলক ফেলবার আগেই সেটা গলির অপর প্রান্তে বড়রাস্তার দিকে বেরিয়ে চলে গেল।

'চোর! চোর!' 'ধর ধর' 'এই পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো' 'মশাই ল্যাং মারুন না!' এমনি টুক্‌রো টুক্‌রো দু একটা কথা কোলাহলের অস্পষ্টতার মধ্যে থেকে অতি কষ্টে উদ্ধার করা গেল।

দেখতে দেখতে দু পাশের দোকান থেকে সবাই বেরিয়ে পড়ল। জনতা যেন নিমেষে নিমেষে বহুগুণ হয়ে যাচ্ছে। আমরাও কৌতূহল দমন করতে না পেরে রাস্তায় নেমে পড়লুম। ব্যাপারটা কি? কি চুরি গেছে? কার চুরি গেছে?

ঐ ত! কোথায় পালাবে? এই সন্ধ্যা সাতটার সময়, চারটে রাস্তার মোড় থেকে পালান কি এতই সহজ! ধরা পড়েছে। শেষ অবধি একটা ট্রাম এসে পড়ায় নাকি লোকটাকে ধরা সম্ভব হয়েছিল, নইলে ছুট্‌তে পারে সে অসাধারণ। তাও ট্রাম আসাতে সে ট্রামেই ওঠবার চেষ্টা করেছিল, তবে ঐ যা এক মুহূর্তের বাধা, তাতেই তার হিসাবটা বোধ হয় গোলমাল হয়ে গেল। আর তা ছাড়া আমাদের অনিলও খুব চতুর, এটা মানতেই হবে—নইলে সেই সামান্য সূক্ষ্ম বাধাটুকুতে যে সময়টা পাওয়া গিয়েছিল তার ভেতরেই ওকে ধরে ফেলতে পারত না।

বাস্তবিকই, অনিল যেন এ পাড়াটার অভিভাবক দেবতা!

ঠিক মোড়টিতে সে ঠেলাগাড়ি করে মনোহারী জিনিস সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে। নিজে ব্যবসা করে, কিন্তু ওর নজর থাকে সর্বত্র। 'এই অল্প

ক-দিনের মধ্যে কত চোরই ধরলে সে। এ পাড়ায় পকেট-কাটা বা ছিঁচ্‌কে চোর এলে আর অব্যাহতি নেই। অনিল তাকে ধরবেই।

মন্দ লোক বলে অনিল নিজেও নাকি প্রথম বয়সে নাম-করা গুণ্ডা ছিল কিন্তু এখন সে সব ছেড়ে দিয়েছে। তবে সেই অভ্যাসটার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপই বোধ হয়, ও যেন চোর বা গুণ্ডাদের প্রতি বেশী মাত্রায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ওর চোখে ধরাও পড়ে সেই জন্য সহজে। সে যাই হোক্ আমরা ওর হুঁশিয়ারীর জন্য যে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি, এটাই আমাদের কাছে বড় কথা। ও দীর্ঘজীবী হোক্ আর এমনিভাবে আমাদের পাহারা দিতে থাক্, এটাই আমরা চাই।

আমরা ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে ততক্ষণ লোকটির চারিদিকে জনতার একটি চক্র তৈরি হয়ে গেছে, বেশ ঘন। কীল চড় লাথি যার যা খুশী অজস্র মেরে নিচ্ছে। সে যেন প্রহারের বর্ষণ। তার ভেতর থেকে লোকটাকে ভাল করে দেখাই যায় না। শুধু আর্তনাদ কানে আসছে, মর্মান্তিক আর্তনাদ, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গোঙাতে গোঙাতে বল্‌ছে লোকটা, 'ও বাবু আমাকে ছেড়ে দেন, ও বাবু আমার কথা শোনেন। ও বাবু আমি চুরি করিনি—'

'চুরি করনি! আবার চালাকি! আবার মিছে কথা!'

এটা অনিলের গলা, চিনতে পারলাম। প্রতি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি করে চড়। অনিলের কেঠো হাতের চড়ে শুনেছি কাবুলিওয়ালারাও জখম হয়।

অতিকষ্টে লোকটিকে দেখতে পেলুম—যাঁরা মারছেন তাঁদের শ্রান্তির অবসরে। মধ্যবয়সী একটি লোক, গায়ে গেঞ্জি খালি পা। মাথায় টাক্ আছে, দাঁড়ি গোঁফ মধ্যে মধ্যে কামান অভ্যাস আছে—এখন খোঁচা খোঁচা হয়ে রয়েছে। মারের চোটেই বোধ হয়, গেঞ্জিটার শতছিন্ন অবস্থা, ধুতিটাও কোথা যেন খসে পড়ে গিয়েছে; সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেহের বহুস্থান ইতিমধ্যেই ফুলে উঠেছে; কাটা ঠোঁট এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

একরকম জোর করেই থামিয়ে দেওয়া হল অনিলকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার কি চুরি করেছে ? কলম, না মনিব্যাগ ?'

ভবেশ বাবু এইবার সমবেত জনতার মনোযোগ তাঁর দিকে ফেরালেন, ারে ভাই, নেবে কি ? নেওয়া কি এতই সহজ ? আমি ভবেশ ঘোষাল, তেটি কাক মরে একটি ভবেশ জন্মেছি। তাইতেই ত ম'ল, গেছিস্ কিনা ামার পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলতে।'

'ও তুলতে পারেনি ! তুলতে যাচ্ছিল এটা ঠিক দেখেছেন ?'

'নয়ত কি মশাই, মিছে কথা বলছি ?' ভবেশবাবু চটে উঠলেন।

উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে কে বলে উঠল, 'মনিব্যাগটা ওঁর নেবার চেষ্টা রেনি কি না, তাই উনি অত সিম্প্যাথেটিক্। নিজের দশ আঙ্গুলে খাটা কড়ি বার চেষ্টা করলে বুঝতে পারতেন !'

চোরটা ইতিমধ্যে কোনমতে লোকের পায়ের তলা থেকে ধুতিটা উদ্ধার রে কোমরে জড়িয়েছে। সে আবারও মিনতি করে বল্‌তে গেল, 'বাবু আমি ইনি, সত্যি কথা বল্‌ছি, হাতটা ঠেকে গেল তাই—'

'হাত ঠেকে গেল ? আবার ন্যাকামি হচ্ছে।'

পুনরায় প্রচণ্ড একটি চড়। বলা বাহুল্য অনিলেরই।

কিন্তু সমস্ত প্রহারগুলো অনিল একচেটে করবে, ভীড়ের অনেকেই সেটা ছন্দ করলে না। ওধার থেকে বইয়ের দোকানের সলিল এবং ডাক্তারখানার মেশবাবু এগিয়ে এসে যথাক্রমে রদ্দা ও ঘুষি বর্ষণ শুরু করলেন। লোকটা ইবার বসে পড়ল।

হয়ত আমরা ঠিক থামাতে পারতুম না কিন্তু চোরটার সৌভাগ্যক্রমেই বোধ য়, কখন পদ্মরাজ সরকার তাঁর দামী নতুন ড্রমুখো গাড়ীখানা থামিয়েছেন পছনে এসে, আমরা টের পাইনি। তাঁর ভারী গলাটা শোনা গেল, 'কি হয়েছে ক, এখানে এত ঝামেলা কিসের ?'

পদ্মরাজ একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এ ছাড়া কটনমিল, চা বাগান, স্কুটের কারখানা এমনি নানাবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন।

প্রচণ্ড বড়লোক বলে সবাই তাঁকে সমীহ করে। তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে। তিনি সব শুনে বললেন, 'লোকটাকে ত লোফার ব'লেই মনে হচ্ছে। আশ্চর্য নয়—চুরি করার চেষ্টা করেছিল হয়ত ঠিকই। বাট্ সরি, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড্স্, আইন আপনারা নিজের হাতে নিতে পারেন না। ওকে পুলিশে দিতে পারতেন আপনারা, আর দেওয়াই উচিত ছিল। . এভাবে ওকে মারধর করাটা ঠিক হয়নি। এখন ও যদি পুলিশে যায় কি প্রমাণ আছে আপনাদের যে ও চুরি করতে গিয়েছিল? কিন্তু ওকে যে আপনারা মেরেছেন তার হাজারো সাক্ষী এখানে আছে।'

সবাই যেন একটু ঘাব্ড়ে গেল কথাটায়। কিন্তু সাতটি কাকের রূপান্তরিত মূর্তি ভবেশবাবু তাঁর ক্ষীণকণ্ঠে একবার বলবার চেষ্টা করলেন, 'আমি মশায় নিজে স্বচক্ষে ফীল করলাম, আমার ব্যাগে ওর হাতটা ঠেকল—'

'ওয়েল, ওয়েল, ছাট ইজ নো এভিডেন্স্। আপনি ফীল করলেন, তা আবার স্বচক্ষে! ও কথাটা আদালতে টিক্‌বে না।...দেখুন, সে আপনাদের কনসার্ন—পুলিশে দিতে চান নিয়ে যান থানায়, কিন্তু জাস্ট থিঙ্ক্ এ লিট্‌ল্—কন্‌সিকোয়েন্স্‌টা ভেবে দেখবেন।'

ভবেশবাবুর কণ্ঠস্বর এবার রীতিমত ক্ষীণ হয়ে এল, 'আমি মশাই আপিস থেকে বাড়ী ফিরছি, একগাদা বাজারপত্র সঙ্গে, আমি এখন থানায় যাবো কি করে?'

রমেশ সলিলের দল ইতিমধ্যে ভোজবাজীর মতই নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেছে। অনিল একা পড়ে যায় দেখে মৌখিক তম্বীটা বজায় রেখে বললে ' পুলিশে টুলিশে আর দিতে হবে না। আমার হাতই পুলিশ। পুলিশ ফুলিশের আমি ধার ধারি না।...যা মার ওকে দিয়েছি ঐ ওর ছমাস মনে থাক্‌বে। এই শোন্, কান মল ভাল করে—আর কখনও করবিনা ত?...আচ্ছা যা। মনে থাকে যেন?'

চোরটা ছাড়া পেয়ে অতিকষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। বোধ হয়

পায়েও লেগেছে খুব। হয়ত কেউ লাথি মেরেছে জুতোসুদ্ধ, কিম্বা লাঠি। কে জানে! দেখতে দেখতে জনতাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যারা পেছনে ছিল, মারতে পারলে না, তাদের কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে গেল, 'উঃ, চোরকে মারবে, তার আবার অত আইনকানুন। উনি বড়লোক কিনা, আইনকানুন দেখিয়ে গেলেন খুব—'

আমরাও যে যার স্বস্থানে ফিরে এসে বসলুম। গলির জীবনস্রোত পনেরো মিনিট আগেও যেমন মন্থর গতিতে বইছিল, তেমনি বইতে লাগল।

বসে বসে ভাবতে লাগলুম ঘটনাটার কথা। মনে মনে এটাকে কেন্দ্র করে কত কি গল্প রচিত হতে লাগল। কল্পনায় দেখলুম, ভবেশবাবু এতক্ষণে বাড়ী ফিরেছেন, আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাঁ-ধারে একটা সরু গলির মধ্যে ওঁর বাড়ী। পথে যেতে যেতে ভদ্রলোক বাজারের থলি হাতে ক'রেই যত লোককে পেয়েছেন গল্পটা শুনিয়েছেন। অন্য যে কোন লোক হলেই ব্যাগটা আজ যেত, শুধু নাকি চোরটা না জেনে ভবেশ ঘোষালের পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করাতেই এই বিপত্তি! ফলে বাড়ী ফিরতে যথেষ্ট রাত হয়েছে, স্ত্রী উদ্বিগ্নমুখে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, 'হ্যাগা, আজ এত রাত?'

'আর বলো কেন?' সোৎসাহে ভবেশবাবু বলেন, 'পথে একব্যাটা চোর যে পকেট মারছিল গো?'

'তারপর? গ্যালো?' স্ত্রীর কণ্ঠে প্রায় হতাশা।

'হুঁ! যাবে বল্লেই যাবে কি না! বাছাধন যে কার সঙ্গে চালাকি করতে গিয়েছিলেন তাত জানেন না! ধরে ফেললুম। তারপর সবাই মিলে দে মার দে মার ব্যাটাকে। খুব উত্তম মধ্যম দেওয়া হলো খানিক।...তাইতেই ত দেরি হয়ে গেল!'

'তারপর? পুলিশে দিলে লোকটাকে?'

'ন্-না। অনেকে বলেছিল বটে। তা আমি দেখলুম যা মার দেওয়া হল,

এখন তিন হপ্তা ওকে বিছানায় শুয়ে ঝোলভাত খেতে হবে! আমিই বললুম ছেড়ে দিতে—'

ইতিমধ্যে মেয়ে নন্দিতা হাত থেকে বাজারের থলিটা নিয়ে নামিয়ে রাখল। উঁকি মেরে থলিটা একবার দেখে নিয়ে বললে, 'কৈ বাবা আমার খাতা আননি?'

'হচ্ছে হচ্ছে,' ভবেশবাবু উবু হয়ে বসে থলে থেকে জিনিসগুলো একে একে নামিয়ে রাখতে থাকেন। পুঁইশাক, একফালি কুমড়ো, এক তাড়া মুলো, চারটি উচ্ছে, একখানা কাপড় কাচা সাবান, ডুমুর—তার নীচে থেকে বাঁধানো ভাল রুল টানা কাগজের প্যাড্, চারটি বাদামী কাগজ—তার এক পিঠে কি সব ছাপা, দুটো নতুন পেন্সিল, কাগজে মোড়া গোটাকতক নিব, খানিকটা ব্লটিং, একটা ইরেজার—এবং আধখানা মোটা লালনীল পেন্সিল। বড়ছেলে বঙ্কু ছোঁ মেরে লালনীল পেন্সিলটা কেড়ে নিলে। ফটিক ভাল ছেলে, এবারেও সেকেণ্ড হয়েছে, ভবেশ বাবু তাকে ডেকে সস্নেহে একটি গোটা পেন্সিল ও নিবগুলো দিয়ে দিলেন। নন্দিতা নাকি স্বরে বললে 'কৈঁ খাঁতা—ওঁ তঁ ওঁদের পেঁন্সিল—'

'এই ত, এই কাগজগুলো আনলুম কি করতে? কাল সকালে একটা খাতা বেঁধে দেবো—রাফ খাতা করবে তার আবার—'

'হ্যাঁ, তাই বৈকি! অফিসের ছাপা কাগজ, মেয়েরা কত ঠাট্টা করে আমাকে।'

'যা যা। ভারি লবাবের বেটি লবাব হয়েছেন। অফিসের কাগজ চলবেনা, ওঁকে নতুন খাতা কিনে দিতে হবে। কে না আনে অফিসের খাতা তাই শুনি। আমরাও ঐ-সবে লেখাপড়া করেছি। পেন্সিল কাগজ কোনদিন কিনতে হয়নি। ......আচ্ছা না হয় ঐ প্যাডখানা থেকেই একটা ভাল খাতা করে দেব, যা!'

'এবার তোমার এসব পেতে এত দেরী—?' গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

'আর বলো কেন? নতুন এক শালা ছোট সাহেব এসেছে, মাসে একবার করে দেবে এই নিয়ম হয়েছে এবার—'

সলিলেরও সেদিন বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হল। দোকানের ওপর তলায় একটা ঘরে ওদের গুদোম। সলিল সব সেরে ওপরে চাবি দিয়ে আসে। সেদিনও দিতে গেল। অনেকগুলো ঘর ওপরে, প্রত্যেকটাই হয় কোন দোকান, নয়ত দোকানের গুদাম। তখন প্রায় সবগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। ওপরের বারান্দাটা রীতিমত অন্ধকার। সলিল কোনমতে হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে চাবি খুলে ফেললে। গুদোম ঘরের জানালাটা ঠিকমত বন্ধ আছে কি না দেখে আবার চাবি দেবে, এবারে সবগুলো তালা, এই ওর তখনকার কাজ। এটা নিত্যনৈমিত্তিক।

সলিল জানালা বন্ধ করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলে। তারপর অভ্যস্ত দ্রুত-হস্তে খানদুই বই বার করে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে বারান্দার এক কোণে জড়ো-করা জঞ্জালের মধ্যে বই দুটো লুকিয়ে রেখে দোর বন্ধ করে একে একে সেই ছ' সাতটা তালা বন্ধ করলে। সেগুলোকে সশব্দে জোর করে টেনে টেনে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিচে নেমে গিয়ে দারোয়ানের হাতে চাবিটা দিলে, তখন প্রায় দশ মিনিট ধরে নিচের দোকান বন্ধ হল। বাবু গিয়ে উঠলেন নিজের গাড়ীতে, বেয়ারা, দারোয়ান এবং অন্যান্য বাবুরা যে-যার নিজের নিজের বাসার পথ ধরলে।

সলিলও ট্রাম-রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল। কি যেন মনে পড়ল ওর, বোধ হয় কি একটা ভুলেছে। সে আবার সমস্ত পথটা ফিরে এল তারপর এদিক ওদিক চেয়ে সে দোকানের বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তখন সব দোকানই বন্ধ হয়ে এসেছে—গলিটা অন্ধকার এবং জনবিরল। তবু বেরিয়ে আসবার সময় সলিল দোরের আড়াল থেকে রাস্তাটা একবার ভাল করে দেখে নিলে কেউ চেনা লোক আসছে কি না—তারপর দ্রুতবেগে গিয়ে ঢুকল ওধারে একমাত্র যে বইয়ের দোকানের দরজাটা ছ ইঞ্চি খোলা ছিল তখনও, এবং তার ভেতরে আলো জ্বলছিল—সেই দোকানে। 'এত দেরি?' কে যেন প্রশ্ন করলেন।

'এই যে, হৈ-হৈ করে খানিকটা দেরি হয়ে গেল। ওকি, মোটে তিন টাকা দিলেন? না হয় ত্রিশ টাকাই ধরুন কমিশন।'

'হ্যাঁ, চোরাই মালে আবার কমিশন। আধা-আধি ধরেছি। আমাদেরই কি রিস্‌ক্ কম?' সলিল বিষণ্ণমুখে বেরিয়ে এল। ওর আরও টাকার দরকার ছিল।

রমেশবাবু বাড়ী ফিরতেই তাঁর ছোট ভাই এসে বললে, 'দাদা মহেশ ডাক্তার ইঞ্জেকশনটার জন্য তিনবার লোক পাঠিয়েছে!'

'তা-ত পাঠিয়েছে। টাকা দিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, যোল টাকা।'

'কেন, যোল টাকা কেন? আমি বলে দিয়েছি না আঠারো টাকা নেব! বাজারে কোথাও বাইশ টাকার কমে পাবে না।···তুই যা, টাকা ওষুধ দুই-ই নিয়ে যা, যদি আর দুটাকা দেয় ত মাল দিবি, নইলে ফিরিয়ে আন্‌বি। খদ্দেরের অভাব নেই আমার।'

ভাই মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'মহেশ-দা বলে তোর দাদার তো সবই লাভ, মিছিমিছি জুলুম করিস কেন?'

'হ্যাঁ—জুলুম বৈকি। ও মক্কেলের কাছে ঐ ওষুধের অন্ততঃ ডবল দাম নেবে না?'

পদ্মরাজ সরকার বাড়ী ফিরলেন রাত একটারও পর। স্ত্রী ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলেন।

'কি গো, ব্যাপার কি? তোমার কি আর বাড়ী ফেরার কথা মনে থাকে না?'

চাকর জুতো খুলে নিচ্ছিল পা থেকে। সে চলে যাবার পর পদ্মরাজ মুখ খুললেন, 'আমি যে কি মজায় রয়েছি, তা তুমি কি জান্‌বে? আমার আবার দিনরাত!'

'কেন গো, কি হল?'

'ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল তা ত জান—আজ হোক্ কাল হোক্ পেমেণ্ট বন্ধ করতে হবে। অথচ আমাকেও ত খেতে হবে? সম্বলের মধ্যে বোলপুরের ঐ জমিটা—ওটা ব্যাঙ্কেরই পয়সায় কেনা, তা সবাই জানে। পেমেণ্ট বন্ধ করলেই সবাই চেপে ধরতো, তখন আর ও জমিতে হাত দেওয়া যেত না। তাই গোপনে সব বন্দোবস্ত করে জমিটা বেচে দিলুম। আজ সেই সব ফাইন্যাল হল। রেজেস্ট্রী অফিস থেকে বেরিয়ে চেক্ ভাঙ্গিয়ে লোক দিকে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে এলুম বাইরে, আমরাও কাল তুফানে রওনা হচ্ছি, দিল্লী হয়ে মুসৌরী। এখানের গোলমাল একটু না মিট্‌লে আর ফিরতে পারব না। চেনাশোনা লোক ছিঁড়ে খাবে।...নাও দিকি, যতটা পারো আজ রাত্রেই গুছিয়ে নাও। সময় কম। আর দ্যাখো—ছেলেপুলেগুলোকে এসব কিছু বলে দরকার নেই—বলো যে এমনই বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে—'

সে চোরটিও ততক্ষণে বাড়ী ফিরেছে। ক্ষতবিক্ষত পিষ্টদেহ, পা টেনে টেনে চলতে কষ্ট হয়, তার ওপর বাড়ী সেই বেলেঘাটার এক প্রান্তে—বস্তি অঞ্চলে।

ওর নাম? ধরে নেওয়া যাক্—সতীশ।

ওর স্ত্রী বিমলাও জেগে অপেক্ষা করছিল, নরককুণ্ডের মত সেই বস্তির একটি অত্যন্ত পুরনো ঘরের কপাট ধরে। কাছে আসতেই দ্রুত নেমে এল সে রাস্তায়, 'এত রাত কেন গো তোমার?...ওমা একি কাণ্ড?'

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে বিমলা। সাম্‌না-সাম্‌নি আসতে গ্যাসের আলোয় সে দেখতে পেয়েছে অবস্থাটা।

'কিছু নয়, চলো বলছি।'

সতীশ মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে ঘরের মেঝেতে এসে বসে পড়ল। বিমলা তাড়াতাড়ি দেশলাই জেলে কুপিটা ধরায়। তারপর আরো ভাল করে দেখে সে শিউরে ওঠে—'এ কি সর্বনাশ গো, এমন কাণ্ড কে করলে!'

কুপির সেই ক্ষীণ আলোতেই যেন ঘরের মধ্যটা স্পষ্ট দেখা গেল। একটা ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের ওপর অত্যন্ত মলিন একটা কি বিছানার মত, মাটির দু-একটা রান্নার সরঞ্জাম—কতকগুলো শুক্‌নো পাতা, ছেঁড়া কাগজ এবং র‍্যাঁদার গুঁড়ো ইন্ধনের জন্য কুড়িয়ে এনে জড়ো করা একপাশে। আসবাব বলতে শুধু এই। বিমলার গায়ে ছেঁড়া ময়লা ট্যানার মত একটুক্‌রো কাপড়।

বিমলা ততক্ষণে কেঁদে ফেলেছে। সতীশ কিছুক্ষণ ওর দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে থেকে বললে, 'একজনের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিলুম; এ তারই চিহ্ন—'

'পকেট মারতে গিয়ে?'

'হ্যাঁ। আজ তিন চারদিন ধরেই চেষ্টা করছি, অভ্যাস ত নেই—পারি না; তবে এতদিন সাহস করে কারুর পকেটে হাত দিইনি—তাই ধরাও পড়িনি। আজ দিতে গিয়ে—'

'তুমি—তুমি চুরি করবে?'

'চেষ্টা করব অন্তত। নইলে তুমি ত জান চাকরির চেষ্টা কম করিনি, দু-দুবার আনাজ ফিরি করতে গিয়ে সামান্য যা বাসন-কোসন ছিল তাও বিক্রী করলুম। ভিক্ষার চেষ্টাও দেখেছি কিন্তু ভিক্ষা কেউ দিতে চায় না। কদিন ভিক্ষা করে দেখলুম ত—চার পয়সা, ছ'পয়সা সারা দিনে। তিনদিন ত প্রায় উপোষ চলেছে। কি করব বলতে পারো?'

বিমলা সেই অত্যন্ত মলিন ট্যানাতেই চোখ মুছে বললে, 'তুমি এত-গরীব যে চুরিও করতে পারবে না। তার দরকারও নেই, আমি এক জায়গায় আজ কাজ পেয়েছি, ঝিয়ের কাজ—আমার খাওয়া পরা ছাড়া আট টাকা করে পাবো। রাত্রে ভাত নিয়ে বাড়ী চলে আসব—বলে কয়ে নিয়েছি।'

'তুমি ঝিয়ের কাজ করবে বিমলা!'

বিমলা ম্লান হাসল, 'তুমি কোথায় নেমেছ আগে সেদিকে তাকিয়ে ছাখো।'

# জননায়ক

প্রায় চল্লিশ বছর আগে বিহারের এই ছোট শহরটিতে এসে 'হনুমান দাস কেদারনাথ' ফার্মের মালিক কেদারনাথ যখন তাঁর মুদিখানার দোকান খোলেন তখন তাঁর কল্পনা ছিল তিনি লক্ষপতি হবেন। মাত্র ত্রিশ বৎসর ব্যবসা ক'রে তিনি যখন মারা গেলেন তখন তাঁর শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তাঁর ছেলে রঘুবীরপ্রসাদ এক লক্ষ টাকা শুধু দরিদ্রদের দান ক'রে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, কারও কারও অদৃষ্টে সিদ্ধি আসেন 'ভাবনা'র কূল ছাপিয়ে---কল্পনার বহুগুণ বেশি হয়ে। রঘুবীরপ্রসাদও বাপের উপযুক্ত পুত্র, তিনি আরও দশ বৎসরের মধ্যে ব্যবসাকে ফলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করালেন যে তাঁকে সেই শহরের মালিক বললেও অত্যুক্তি হ'ত না। একটা চিনির কল, একটা তেলের কল, তিনটে পেট্রোল পাম্প্, কেরোসিনের গুদাম, গোটা-চারেক বাস লাইন, একটা বিরাট কাপড়ের দোকান এবং প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা-জোড়া এক গোলদারী দোকানের মালিক হয়ে বসলেন তিনি। এ ছাড়া শহরে বাড়ি এবং দেহাতে জমিদারী কত যে তিনি করেছিলেন তা বোধ হয় তাঁর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুরও ভাল ক'রে জানা ছিল না। অবশ্য, কমলার এই অযাচিত প্রসাদের তিনি অপব্যবহার করেন নি। একটি ধর্মশালা, একটি হাসপাতাল এবং একটি অতিথিশালা সম্পূর্ণ তার পয়সাতেই চল্‌ত। এছাড়া সমস্ত রকম স্বদেশী উৎসাহেই তাঁর দান থাক্‌ত মোটা অঙ্কের রূপ ধরে।

এহেন রঘুবীরপ্রসাদ একদিন তার বাস-স্টেশনের আফিসে বসে কী একটা হিসাব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন এমন সময়ে একটি কুড়ি একুশ বছরের তরুণী মেয়ে ঈষৎ ত্রস্তপদেই সিঁড়ি ক-টা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে প্রশ্ন করলে, 'রঘুবীরবাবু কোথায় বসেন?'

কণ্ঠস্বর খুবই মিষ্ট আর তা শান্ত করবার একটা চেষ্টাও ছিল, তবু ব্যাকুলতাটুকু ধরা পড়ল। রঘুবীরপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে তাকালেন এবং তাকিয়েই রইলেন।

বাঙালীর মেয়ে, খুব যে সুন্দরী তা নয়—বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, চোখ দুটিও খুব আয়ত নয়—অসাধারণত্ব দেহের কোথাও সেই, তবু তার দীর্ঘ ঋজু দেহে এমন একটি মিষ্ট ছন্দ ছিল যে সেদিক থেকে চোখ ফেরানো সত্যিই শক্ত। বিশেষ ক'রে তার দৃষ্টি এমন আশ্চর্য প্রাণপূর্ণ যে. সে চাহনি অপরের দৃষ্টিকে প্রায় চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে। রঘুবীরপ্রসাদ যুবক নন, বয়স তাঁর চল্লিশের কোঠায় পৌঁচেছে, বিভিন্ন ব্যবসায়ের হিসাব এবং স্বদেশী আন্দোলনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর চোখ থেকে রং বিদায় নিয়েছে বহুদিন. তবু চোখ নামাতে তাঁর একটু দেরিই হ'ল।

চোখ নামিয়ে রঘুবীরপ্রসাদ বললেন, 'বলুন।'

'ওঃ, আপনিই ?' মেয়েটি যেন একটু অপ্রতিভ হ'ল। এত বড় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারকে সে এমন সাধারণ খদ্দরের পোষাকে খোলা অফিসে বসে থাকতে দেখবে আশা করেনি বোধ হয়। সে একটু থতিয়ে গিয়ে বললে, 'দেখুন আমি একটু বিপদে পড়েছি। আমি আপনাদের ঐ থানার পাশের বাংলোটায় থাকি—'

রঘুবীরপ্রসাদ শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বাড়ি সম্বন্ধে কিছু যদি বলবার দরকার থাকে ত কষ্ট ক'রে আমাদের ম্যানেজার কুঞ্জবাবুর কাছে যেতে হবে। তিনিই ওসব দেখেন শোনেন, আমি বলতে গেলে কোন খবরই রাখি না। আপনার কথার ঠিকমত জবাব আমি হয়ত দিতে পারব না।'

মেয়েটির কণ্ঠস্বর আবারও যেন কেঁপে উঠল। সে বললে, 'না দেখুন দরকারটা আপনার কাছেই। কুঞ্জবাবুর কাছে আমি গিয়েছিলুম, তিনি বললেন আপনার হুকুম না পেলে তাঁর কিছু করবার নেই।'

তারপর একটুখানি, বোধ হয় এক মুহূর্ত থেমে মেয়েটি বললে, 'আমার দাদা অসুস্থ, তাঁকে সারাতেই আমার এখানে আসা, এখন যদি আবার ফিরে যেতে হয় তাহ'লে আর তাঁকে বাঁচানো যাবে না !'

রঘুবীরপ্রসাদ যেন কোথায় একটু আলো দেখতে পেলেন, বললেন, 'কী অসুখ তাঁর ?'

'অনেকদিন ধরে কালাজ্বরে ভোগবার পর শেষের দিকে একটু প্লুরিসির মত হয়েছিল। তিনি সে সব থেকে সেরেই উঠেছেন সেই জন্যই তাঁকে নিয়ে চেঞ্জে এসেছি। এখানে এসে পথের কষ্টে একটুখানি শ্রম-জ্বরের মত হয়েছে—কুঞ্জবাবু সন্দেহ করছেন টি-বি, কিন্তু টি-বি কিছুতেই নয়, আপনি বিশ্বাস করুন।'

রঘুবীরপ্রসাদ বললেন, 'দেখুন আমি এসব কিছুই দেখিনে, কুঞ্জবাবুর ওপরই সব ভার আছে। তিনি ভাল বুঝে যা ব্যবস্থা করতে চান তার ওপর কথা বলা কি আমার উচিত? তা'হলে কাজের গণ্ডগোল হয় না কি?'

'কিন্তু', মেয়েটির চোখে জল ছলছলিয়ে এল, 'তা'হলে কোথায় যাই বলুন, এখানের সব বাড়িই ত আপনাদের। এখনই ফিরতে গেলে দাদা পথেই মারা যাবেন।'

রঘুবীরপ্রসাদ জবাব দিলেন, 'বেশ, আপনার দাদা যতদিন না সুস্থ হন, তাঁকে এখানকার হাসপাতালে রাখবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু নিয়ম যেটা আছে সেটা ভাঙ্গতে আমি পারব না। তাছাড়া একবার জানাজানি হয়ে গেলে ও বাড়ি কেন, আমার কোন বাড়িই সহজে ভাড়া হবে না।

'কিন্তু আপনারা কেন ধরে নিচ্ছেন যে তাঁর টি-বি হয়েছে। আমি বলছি যে তার টি-বি নয়।'

'বেশ ত, কয়েকটা দিন তিনি হাসপাতালেই থাকুক না। সুস্থ হ'লে না হয়—'

'সে হয় না।' মেয়েটি বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠেই বললে, 'তাঁর যা সেন্‌জিটিভ নার্ভস, হাসপাতালে গেলে একদিনও বাঁচবেন না।'

রঘুবীরপ্রসাদও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তাহ'লে আমি আর কি করব বলুন, কুঞ্জবাবুর ব্যবস্থা বদল করা আমি সঙ্গত মনে করি না।'

মেয়েটির চোখে যেন এক মুহূর্তের জন্য আগুন জ্বলে উঠল, সে অকস্মাৎ তার হাতের দু'গাছি চুড়ি খুলে রঘুবীরের সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে বললে,

'টাকা আমার হাতে যথেষ্ট নেই এখন, আপনি এই দুটো চুড়ি রেখে দিন, এর যা দাম এখন, তাতে আপনার ঐ দুটো ঘরের প্ল্যাস্টারিং খসিয়ে নতুন ক'রে প্ল্যাস্টারিং আর চুনকাম নিশ্চয়ই করাতে পারবেন—যদি দাদার অসুখটা টি-বিই প্রমাণ হয় তাহ'লে এইতেই ত আপনার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হবে।'

রঘুবীর যেন একটু বিরক্ত হয়েই এবার বললেন, 'দেখুন এসব ঝঞ্ঝাট আমরা করতে পারব না, আমাকে মাপ করবেন!'

মেয়েটি এবার সোজাসুজি জলে উঠল, বললে, 'কিছুই পারেন না আপনারা, শুধু একটা অসুস্থ লোক আর একটা মেয়েছেলেকে পথে বার ক'রে দিতে পারেন না?……সে কাজটাও অত সহজ ভাববেন না, আমি ও বাড়ি ছাড়ব না। দেখি কি ক'রে আপনারা আমাদের ওখান থেকে উঠিয়ে দেন! যা পারেন করবেন—'

সে তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিমেষের মধ্যে তার বাড়ীর পথে অদৃশ্য হ'লো।

রঘুবীরপ্রসাদ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর একটা বেয়ারাকে দিয়ে কুঞ্জবাবুকে ডাকিয়ে পাঠালেন। কুঞ্জবাবু বসেন গোলদানি গদিতে, তিনি শশব্যস্তে চলে এলেন, কারণ রঘুবীরবাবু তাকে ডেকে পাঠান কদাচিৎ, প্রয়োজন হলে প্রায়ই নিজে যান।

কুঞ্জবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'থানার পাশের ঐ নতুন বাংলোটা কে ভাড়া নিয়েছে? কার মারফৎ এসেছে ওরা?'

কুঞ্জবাবু জবাব দিলেন, 'ওটা কলকাতা থেকে চিঠি লিখে ওঁরা ঠিক করেন। ইন্দ্রাণী বোস, এই নামেই মনিঅর্ডারে টাকা আসে! তখন ত জানি না যে ওঁরা ও-রকম রুগী আনবেন, চেহারা দেখে মনে হ'ল টি-বির লাস্ট স্টেজ—'

রঘুবীর বললেন, 'যদি তা-ই হয়, ক্ষতি যা হবার তা ত হয়েই গেছে এই ক'দিনে, ওঠাতে গেলেও দু-একদিন আরো লাগবে; তাতে আর দরকার নেই।'

কুঞ্জবাবু খুবই বিস্মিত হলেন। এসব ব্যাপারে রঘুবীর কোনদিন তাঁর ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন নি। তিনি মাথা চুলকে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু—'

'সে রকম হলে এরপর বাড়িটা ভেঙে দিলেই চলবে।'

রঘুবীর আবার তাঁর কাগজে মন দিলেন।

দিন-দুই পরে একদিন রঘুবীরপ্রসাদকে একটু কাজে থানায় আসতে হয়েছিল, ফেরবার পথে কি খেয়াল হলো তিনি সোজা রাস্তাটা ছেড়ে তাঁর বাংলোর পাশের গলিটাই ধরলেন। বাংলোর সামনে অনেকটা জমি খালি পড়ে আছে, দু-একটা শালগাছ আর আতাগাছ আপনিই জন্মেছে, এখানে বাগান করবার কল্পনাও করেনি কেউ। তারই মধ্যে একটা পাথর পড়েছিল বহুকাল ধরে, সেই পাথরটার ওপর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল ইন্দ্রাণী, শালবনের ফাঁকে সূর্যদেব যেখানে অস্ত যাচ্ছিলেন সেই দূর আকাশের বিশেষ প্রান্তটির দিকে চেয়ে—সহসা পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে রঘুবীরবাবুকে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র, চোখোচোখি হবার পর একটি মুহূর্তমাত্র তার সময় লাগল নিজেকে সাম্‌লে নিতে, তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে নমস্কার করে বললে, 'কী সৌভাগ্য আমাদের, আসুন, আসুন—নেমে আসুন পথ থেকে—'

রঘুবীর সামান্য একটুখানি ইতস্তত করে নেমে এলেন, প্রতি-নমস্কার করে বললেন, 'আপনার দাদা কেমন আছেন?'

ইন্দ্রাণী জবাব দিলে, 'ভালই আছেন কাল থেকে, কিন্তু সে ত আপনারই দয়া। শুনলাম আপনিই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি ত 'ফি' পর্যন্ত নিলেন না আমাদের কাছ থেকে। কুঞ্জবাবুও আজ সকালে এসে খবর নিয়ে গেছেন—'

তারপর সহসা থেমে বললে, 'এখানেই বসবেন, না ভেতরে যাবেন?'

রঘুবীর একেবারে পাথরখানার ওপর বসে পড়ে বললেন, 'এখানেই বস্‌ছি—'

'উঁহু, উঁহু, বসবেন না, বসবেন না—আমি আসন আনছি।'

সে ছুটে ভেতরে গিয়ে দু'খানা আসন নিয়ে এল। রঘুবীরবাবুকে জোর করে তুলে পাথরের ওপর একখানা আসন পেতে দিলে, আর একখানা মাটির ওপরই বিছিয়ে নিজে বসে পড়ল। তারপর একটু দম নিয়ে বললে, 'আচ্ছা আপনি যদি এত অনুগ্রহই করবেন ত সেদিন মিছিমিছি অত রাগিয়ে দিলেন কেন?...ছি ছি, দেখুন দেখি, আমিও কতকগুলো কড়া কথা বলে এলুম।'

রঘুবীর এতক্ষণ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই ওর পরিশ্রমের ফলে আরক্ত ও ঈষৎ স্বেদসিক্ত সুডৌল ললাটের দিকে চেয়েছিলেন, ওর কথাটা থামতে যেন চমক ভেঙে উঠে উত্তর দিলেন, 'মিছিমিছি ত রাগাই নি, আপনাকে বা বলেছিলুম সবই সত্য। শেষকালে আপনারা উঠে গেলে বাড়ি ভেঙে দেব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে কুঞ্জবাবুকে রাজি করিয়েছি—'

কথাটা বলে ফেলেই রঘুবীর বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। ইন্দ্রাণীর মুখ অপমানে রাঙা হয়ে উঠেই বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি সামলে নিয়ে বললেন, 'অবিশ্যি যদি আপনার দাদার রোগটা খারাপ বলেই শেষ পর্যন্ত জানা যায়—'

ইন্দ্রাণী কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে অথচ চাপাগলায় বললে, 'কিছুতেই তা জানা যাবে না, আমি বলছি, আপনাকে তা নয়। দাদার কথা যদি সব শোনেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কেন ওঁর চেহারা অত রোগা!'

রঘুবীর জিজ্ঞাসুনেত্রে শুধু চাইলেন। এর পর কিন্তু আলাপ দ্রুত জমে উঠল। ইন্দ্রাণীর দাদা সুব্রত কোন্ ইস্কুলের মাস্টার। ওদের বাবা মা ছেলেবেলাতেই মারা যান, মানুষ করেন ওদের ছোটমাসি। বাড়ি শ্রীরাম-পুর। দাদা মাস্টারি নেবার পর নিজে দুবার এম-এ পাস করেন, ইচ্ছে ছিল বোনকেও এম-এ পাস করাবেন, কিন্তু এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় দাদার খরচপত্র কিছুতেই কুলোচ্ছে না, অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, দুটো টিউসানী করেও কুলোচ্ছে না দেখে ইন্দ্রাণী বি-এ পাস করার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিজেও

জোর করে একটা ইস্কুলে মাস্টারী নিয়েছিল—মাস ছয়েক মাস্টারি করেওছে, এমন সময় এই বিপত্তি। আগে কালাজ্বর, তারপর প্লুরিসি। জমানো কিছুই ছিল না—ইন্দ্রাণীর সামান্য দু-একটা গহনা ও স্ুব্রতর প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা সবই গেছে। ইন্দ্রাণীর চাকরীও বাধ্য হয়েই ছাড়তে হয়েছে। চিকিৎসা ও পথ্যের যোগাড় করাই দায়—দাম দেওয়া ত আরও দুঃসাধ্য। ডাক্তাররা অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু চেঞ্জে না গেলে সেরে উঠতে পারবেন না কিছুতেই, এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন। ইস্কুলের ছেলেরা ও অন্য মাস্টারমশাইরা চাঁদা করে একশ' টাকা তুলে দিয়েছেন, তাই নিয়েই ও এখানে এসে পড়েছে। ভরসার মধ্যে দেশে এখনও একটা পুরোনো বাড়ি আছে, সেইটেই বিক্রি করতে বলে এসেছে। মাসির হাতেও হয়ত কিছু আছে, কিন্তু যিনি চিরকাল ওদের জন্যেই সব কিছু বিসর্জন দিলেন, তাঁর এই অতিবৃদ্ধ-বয়সের শেষ সম্বল শেষ করতে ও রাজি নয়। ইত্যাদি—

রঘুবীর এতক্ষণ প্রায় নিঃশব্দেই ওর সুদীর্ঘ কাহিনী শুনে যাচ্ছিলেন। অবাক্ লেগেছিল ওঁর মনে। তিনি বিশেষ লেখাপড়া করবার সুযোগ পাননি, তবে এই বিপুল ব্যবসায়ের সম্পর্কে এসে চলনসই রকমের একটু ইংরেজি তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। লেখাপড়া-জানা মেয়ে সামনাসাম্নি দেখবার সুযোগ কিন্তু তাঁর কখনই হয়নি। ও সম্বন্ধে বরং একটা ভয়ই ছিল তাঁর মনে। তিনি তাই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য কর্ছিলেন যে বি-এ পাস মেয়েও কেমন অবলীলাক্রমে, কত সহজে তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করে যাচ্ছে। তাঁর ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নেই এর কোথাও!

হঠাৎ যেন ইন্দ্রাণীই সচকিত হয়ে উঠ্ল, 'আমিই খালি ছাই-ভস্ম বকে যাচ্ছি, আপনি ত একটা কথাও কইছেন না। নিশ্চয়ই আমাকে খুব অসভ্য ভাব্ছেন!'

অপ্রস্তুত হয়ে রঘুবীর বললেন, 'না না, তা নয়, তবে আপনার কাহিনী আপনারই ত বলবার কথা, আপনি বকে না গেলে কে বলবে বলুন?'

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ইন্দ্রাণী বললে, 'দাদা একটু সাম্‌লে উঠলেই আমি কিন্তু একদিন আপনার বাড়ি যাবো। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসব। আপনারা শুনেছি ভয়ঙ্কর বড়লোক, কিন্তু তাই বলে কি আর তিনি কথা কইবেন না আমার সঙ্গে?'

হেসে রঘুবীর বললেন, 'নিশ্চয়ই কইবেন, তবে আমার মত বাঙলা তিনি বলতে পারেন না, তা কিন্তু আমি আগেই বলে রাখছি।'

ইন্দ্রাণী কান পেতে কী একটা শুনে বললে, 'দাদা বোধ হয় উঠেছেন। চলুন, আলাপ করিয়ে দিই—'

সুব্রতর ঘুম ভেঙ্গেছিল সত্যিই, তবে উঠে বসবার শক্তি তখনও তার হয়নি, তাই শুয়েই ছিল। রঘুবীরপ্রসাদ ঘরে ঢুকতে কোন মতে উঠে বসল। তার অপরিসীম কৃশতা ও মুখের পাণ্ডুরতা দেখেই রঘুবীর কুঞ্জবাবুর সন্দেহের কারণ বুঝতে পারলেন। হয়ত তাঁরই সন্দেহ সত্য—অন্য রোগের ছিদ্রপথে চরম রোগই কখন প্রবেশ করেছে এই শিক্ষাব্রতীর বুকে।

সামান্য দু-একটা কথা কয়েই রঘুবীর উঠে পড়লেন। যাবার সময়ে আর একবার নিজের বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি দ্রুত শালবনের মধ্যকার রাস্তাটা ধরে একসময়ে ইন্দ্রাণীর দৃষ্টির অলক্ষ্যে চলে গেলেন।

এর দিন-তিনেক পরেই একটি অত্যন্ত স্থূলকায়া বাঙালী মহিলা এলেন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে। পরিচয়ে জানলেন তিনি এখানকারই একটি বাঙালী মেয়ে-ইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্—কুমুদিনী মিত্র। ইস্কুলটিতে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু না হয় সে ইস্কুলে পর্যাপ্ত মেয়ে আর না পাওয়া যায় স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকদের কোন সহানুভূতি। 'হনুমানদাস কেদারনাথ এস্টেটের একটা মোটা মাসিক সাহায্য পাওয়া যায় বলেই কোনমতে এখনও টিকে আছে, নইলে কবেই উঠে যেত। অবশ্য লোকাভাবও খুবই। ভ[illegible] শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় না। সামান্য বেতনে বাইরে থেকেও কেউ এসে থাকতে

চায় না। স্কুল চালাবার রীতি-পদ্ধতি জানেন, এমন কাউকে কিছুদিনের মত পেলেও কুমুদিনী নূতন করে সব ব্যবস্থা করতে পারতেন। কুমুদিনী নিজে আই-এ পাস করেছেন বটে, কিন্তু ইস্কুলের অভিজ্ঞতা কিছুই নেই।

সব কথা শেষ করে কুমুদিনী আসল কথাটা পাড়লেন, 'শুনেছি আপনি মাস্টারী করেছেন কিছুদিন কলকাতায়, আর থাকবেনও এখানে তিন চার মাস —এই সময়টা আমাদের একটু সাহায্য করুন না। এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ত!...আমরা আপনাকে তিন মাসের জন্য একশ' টাকা ক'রে মাইনে দিতে পারব।'

ইন্দ্রাণী মুহূর্তখানেক চুপ ক'রে থেকে বললে, 'রঘুবীরবাবুর সঙ্গে আপনাদের ইস্কুলের কোন সম্পর্ক আছে নাকি?'

'আছে বৈ কি! তিনিই ত আমাদের সেক্রেটারী।'

'আমার সব কথা তাঁর মুখেই শুনলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, নইলে কোথা থেকে জানব বলুন।'

ইন্দ্রাণী মাথা নত ক'রে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'দেখুন কাজ আমি করতে পারি, কিন্তু মাইনে আমি পঞ্চাশ টাকার বেশী নিতে পারব না।'

'কেন?' বিস্মিত হয়ে কুমুদিনী প্রশ্ন করলেন।

'পঞ্চাশ টাকা পযন্ত আমার প্রাপ্য—একশ' টাকাটা দান।'

কুমুদিনী কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে, তারপর বললেন, 'বেশ তাই হোক। কাল থেকেই যাবেন ত? ঝি পাঠাব, না রঘুবীরবাবুর গাড়িটা পাঠাতে বলব?'

'কতদূর?'

'এই ত, মিনিট-পাঁচেকের পথ—'

'তাহ'লে ঝি-ই পাঠাবেন।'

কুমুদিনী বিদায় নিলেন।

পরের দিন থেকেই ইন্দ্রাণী ইস্কুলের কাজে লেগে গেল। গিয়ে দেখলে কাজ

সত্যিই অনেক করবার আছে। ইস্কুল সেটাকে না বলে ইস্কুলের পরিহাস বলাই উচিত, এমনই বিশৃঙ্খল অবস্থা সেখানকার। ইন্দ্রাণী বেশী দিন মাস্টারী করে নি, হেড মিস্ট্রেস ত ছিলই না, কিন্তু তবু কী করা উচিত সে সম্বন্ধে তার সহজ বুদ্ধি দিয়েই একটা ধারণা করে নিতে পেরেছিল, ফলে তিন-চার দিন না যেতে যেতেই মোটামুটি ব্যবস্থা একটা করে ফেললে সে।

ইতিমধ্যে রঘুবীরবাবুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। রঘুবীরবাবু ইস্কুলেও আসেন নি। তিনি ইন্দ্রাণীর প্রতি যে অনুগ্রহই করেছিলেন সেটা ইন্দ্রাণীর মনের কাছে অজানা ছিল না, কিন্তু সে অনুগ্রহের সঙ্গে তিনি নিজেকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলবেন হয়ত, এই আশঙ্কা ক'রে ইন্দ্রাণী আগে থাকতেই একটু বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই চারদিনের মধ্যেও তার কোনও আভাস পর্যন্ত না পেয়ে তার সে বিরক্তি সত্যকার কৃতজ্ঞতায় পরিণত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল ওর বাড়িতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে সে, সেটা এবার পূর্ণ করা দরকার। সে আর দেরী না ক'রে শনিবার দিনই ছুটির পর ইস্কুলের ঝিকে সঙ্গে ক'রে রঘুবীরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হ'ল।

রঘুবীর তাঁর স্ত্রীকে ইন্দ্রাণীর কথা ব'লেই রেখেছিলেন, তাই নর্মদা বিস্মিত হ'লেও ওর পরিচয়টা অনুমান ক'রে নিলেন খুব শীঘ্রই এবং ভাঙা বাঙলাতে অভ্যর্থনা জানিয়ে একেবারে ওপরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। নর্মদার বয়স হয়েছে, ইন্দ্রাণীর মনে হ'ল পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, চেহারাও সাধারণ বিহারী মেয়েদের মতই, সুন্দরও নয়—কুশ্রীও বলা চলে না। এককালে তন্বীই ছিলেন হয়ত—এখন একটু স্থূলতার দিকে মোড় ফিরেছেন।

আলাপ জমে উঠল দ্রুত। নর্মদা এক সময়ে বললেন, 'আপনি কলকাতার মেয়ে, লিখাপঢ়িও ঢের শিখেছেন, গান গাইতে পারেন নিশ্চয়ই। একটা গান শুনান না!'

ইন্দ্রাণী লজ্জিত মুখে বললে, 'কিন্তু সে যে সব বাঙলা গান!'

'তা হোক না বাঙলা গান, কথা বুঝছি আর গান বুঝব না?'

অগত্যা ইন্দ্রাণীকে গাইতে হ'ল। রবীন্দ্রনাথের দু তিনখানা গান পেয়ে সে যখন থামল তখন নর্মদা মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'বড়ি মিঠা আছে আপনার গলা। হামার মেয়েদের আপনি দু-একখানা গান শিখাইতেন ত ভাল হ'ত'—

ছেলেমেয়েদেরও তিনি ডাকলেন। বড় ছেলেটির বয়স বছর ষোল, এখানকার ইস্কুলে পড়ে। তারও ওপরে একটি মেয়ে আছে সে এখন শ্বশুর-বাড়িতে থাকে। আরও গুটি চার-পাঁচ ছেলেমেয়ে ওঁর। সবগুলিই বেশ শান্ত আর ভদ্র। নর্মদা ওদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি সত্যিই ওদের দু' একখানা গান শিখলাইয়ে দেন ত বড় ভাল হয়। এখানে কেউ জানে না, অথচ আমার বড্ড শোনবার সোখ আছে—'

ইন্দ্রাণী তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দিলে। তারপর প্রচুর জলযোগ ক'রে চা খেয়ে এক সময় তার হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে চারটে বাজে, এইবার তার বাড়ি ফেরা উচিত। দাদার ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এবার আমি বাড়ি যাব দিদি, সে ঝিটা আছে কি?'

নর্মদা জবাব দিলে, 'ঝিকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। ওঁর অফিস যাবার সময় হয়েছে, উনিই গাড়ি ক'রে পৌছিয়ে দিবেন।'

চম্‌কে উঠে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলে,—'রঘুবীরবাবু কি বাড়িতে আছেন নাকি? কই, তাঁকে ত দেখলুম না!'

নর্মদা হেসে জবাব দিলে, 'তিনি বিশ্রাম করছিলেন ওপরে। অন্য দিন এর আগেই বেরিয়ে যান, আজ আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, পৌছে দেবেন বলে—'

ইন্দ্রাণী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'এ কিন্তু ভারি অন্যায়। মিছিমিছি তাঁর দেরি হয়ে গেল, তা ছাড়া আমি গানটান গাইলুম—কী মনে করলেন তিনি!'

রঘুবীরপ্রসাদ বোধ হয় কাছেই কোথাও ছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে বললেন, 'আমার গান শোনা কি নিষিদ্ধ মিস্ বোস?'

'না, তা নয়—তবে—'

ইন্দ্রাণী ভাল ক'রে জবাব দিতে পারলে না।······

রঘুবীর শহরটা একটু দেখাবার জন্য গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়েই চললেন। দূ
পাহাড়ের নীল রেখার মধ্যে সূর্যদেব ঈষৎ রক্তাভ দেহে ঢলে পড়েছেন, দুধা
শালবন আর ধানের ক্ষেতে তার লাল আলো এসে পড়ে কেমন যেন স্বপ্নের সৃ
করেছিল। সে দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে রঘুবীর একটা ছো
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে স্ত্রী
অনুরোধটা আমি একটু বাড়িয়ে দিতে চাই—'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ আমার ছেলেমেয়েদের আপনি যদি এই ক'মাস একটু বাঙল
পড়াতে আর গান শেখাতে পারতেন ত আমার সত্যিই উপকার হ'ত।'

ইন্দ্রাণী ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'শেখাতে পারি যদি পারিশ্রমিক ন
নিতে হয়।'

রঘুবীরবাবু খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু এটাকে আপ
সাধারণ টুইশনি বলে মনে করতে পারছেন না কেন ?···সবটাই আপনি উপক
করবার চেষ্টা বলে মনে করছেন এই ত মুস্কিল !'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু এটা কি তাই নয় ? অন্তত অনেকটা ?······আপ
ত শুনেছি মিথ্যা বলেন না কখনই !'

রঘুবীর হেসে বললেন, 'মিথ্যা বলি বই কি—তবে প্রয়োজন না হ'লে ব
না। কিন্তু আমার সত্যিই উপকার হ'ত।'

ইন্দ্রাণী বললে, 'বেশ ত আপনিই বা পারিশ্রমিক দেবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছে
কেন ? আপনার একটু উপকার করার সুযোগই দিন না !···আপনার সম্ব
আমি কিছুই জানতুম না, তাই একদিন কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে গিয়েছিলু
আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন !

রঘুবীর একটু হেসে বললেন, 'আমার সম্বন্ধে এরই মধ্যে কি
জানলেন ?'

'জানলুম যে আপনি এইবয়সেই স্বদেশী আন্দোলনে বার-চারেক জেল খেটেছেন, এখানকার কংগ্রেসী ব্যাপার সমস্তই আপনার আনুকূল্যে চলে! অন্তত কুড়িটি নিঃস্ব পরিবার আপনার দানে জীবনধারণ করে; প্রতিদিন আপনার গোলা থেকে দু-মণ ক'রে চাল ভিক্ষা দেওয়া হয়—আর কত শুনবেন নিজের প্রশংসা?' •

আরক্ত মুখে রঘুবীর বললেন, 'আর শুনতে চাইনে। এ নিশ্চয়ই মিসেস মিত্রের কাজ!'

হেসে ফেলে ইন্দ্রাণী বললে, 'কুমুদিনী-দি'র নিন্দা করাই স্বভাব বটে।'

গাড়ি ততক্ষণে শহরের বাইরে গিয়ে ঘুরে আবার শহরে প্রবেশ করেছে। দূরে লাইব্রেরী হলের সামনের মাঠে কী একটা উপলক্ষ্যে জনসমাগম হয়েছে। সেদিকে দেখিয়ে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলে, 'ওখানে কি সভা-টভা হবে নাকি কিছু, রঘুবীরবাবু?'

'হ্যাঁ। আমিই সভাপতি।'

'এখনও সময় হয় নি বুঝি?'

হাতঘড়িটা দেখে রঘুবীরবাবু জবাব দিলেন, 'সময় হয়ে গেল বৈ কি!··· একটু দেরিই হ'ল।'

ব্যস্ত হয়ে উঠে ইন্দ্রাণী বললে, 'তবে ত বড় অন্যায় হয়ে গেল। আপনি না হয় সভায় যান, আমি এটুকু একাই যেতে পারব। আমিও যেতুম তবে—দাদা—'

রঘুবীরবাবু বললেন, 'আপনার জন্য ও ঠিক দেরি হয় নি মিস্ বোস। আসল কথা আজ একটা বড় ক্লান্তি অনুভব করছি—।···আপনি ব্যস্ত হবেন না। সারাজীবনই ত ঠিক সময়ে হাজিরা দিলুম, একদিন না হয় একটু দেরিই হ'ল—'

তাঁর কণ্ঠে অপরিসীম শ্রান্তি লক্ষ্য ক'রে ইন্দ্রাণী উদ্বিগ্ন হয়ে রঘুবীরবাবুর মুখের দিকে চাইল। কিন্তু সে মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না, কারণ তিনি তখন গাড়ির কোণে মাথা রেখে চোখ বুজেছেন।

অবশ্য এইটুকুই যথেষ্ট—রঘুবীরবাবুর ইতিহাসে অবসন্নতা নেই কোথাও, তা সে বহুবার শুনেছে কুমুদিনীদি'র মুখে। সে একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করলে, 'আজ কি সভাতে যেতেই হবে?'

'আমি তাদের কথা দিয়েছি, সুতরাং একটা বাধ্য-বাধকতা আছে বই কি!'

তখন গাড়িটা ইন্দ্রাণীর বাংলোর সামনে এসে পৌঁছেছে। ইন্দ্রাণী বললে, 'তাহ'লে একটুখানি দাঁড়ান, আমি দু' মিনিটের মধ্যেই এক কাপ চা তৈরী ক'রে দিচ্ছি। এই অবস্থায় সভার কচ্‌কচিতে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।'

রঘুবীরবাবু চোখ মেলে চাইলেন। খুব ম্লান একটুখানি হেসে বললেন, 'এ কিছু নয় মিস্ বোস, এখনই ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া চা আমি খাই না—'

ইন্দ্রাণী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'না তা হয় না। আপনি বসুন, আমি লেবু দিয়ে এক গ্লাস সরবতই ক'রে দিচ্ছি। যখন এতই দেরি হ'ল তখন আর দু' মিনিটে কিছু ক্ষতি হবে না।'

ইন্দ্রাণী উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ছুটে চলে গেল। রঘুবীরবাবুও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার গাড়ির কোণে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। তিনি বাইরে কোথাও কখনও কিছু খান না, কোন দিনই না, তবু আজ ইন্দ্রাণীকে ক্ষুণ্ন করতে তিনি পারলেন না, একটু পরেই ইন্দ্রাণী যখন সরবৎ নিয়ে ফিরে এল, তখন তিনি নিঃশব্দে ওর হাত থেকে সরবতের গ্লাসটি নিয়ে নিঃশেষে পান করে গ্লাসটি ফিরিয়ে দিলেন। তিনিও কোন কথা কইলেন না, ইন্দ্রাণীও না, শুধু গাড়ি ছেড়ে দেবার পর তাঁর মনে হোল যে ইন্দ্রাণীর নমস্কার তিনি ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেলেন!

রঘুবীববাবু চলে গেলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রাণী কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারল না। সুব্রত অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠেছে, তার যা দরকার ওদের ঝিই দিয়েছে সব—সুতরাং কাজ কিছুই ছিল না। সুব্রতর সঙ্গে দু' একটা কথা কইবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে ও একখানা বই নিয়ে বসল, কিন্তু বইতেও মন দিতে

পারলে না। সমস্ত কাজের মধ্যেই বার বার রঘুবীরবাবুর সেই ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর কানে বেজে ওকে উন্মনা ক'রে তুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে কতকটা নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল এবং একটা মোটা গোছের সিল্কের চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলে, 'কোথায় যাচ্ছিস রে ইন্দু!'

বোধ হয় একমুহূর্ত ইতস্তত ক'রে সে জবাব দিলে, 'এমনি একটু বেরুচ্ছি। এখানে একটা মিটিং আছে, মনে করছি একটু ঘুরে আসব।'

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সুব্রত বললে, 'যা যা, একটু ঘুরে আয়।...সত্যি, একা একা বন্ধ হয়ে থাকা—'

কাছারীর পেছনের বিরাট আম-বাগানটা পেরিয়ে ইন্দ্রাণী যখন সভাস্থলে পৌছল, তখন সভার অন্য বক্তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, স্বয়ং সভাপতিই বক্তৃতা করছেন। এ যেন রঘুবীরবাবুর সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা। তাঁর কণ্ঠ এখনও তেমনি শান্ত ও সংযত বটে, মুখের প্রশান্তি কোথাও খর্ব হয়নি, কিন্তু যে কথাগুলি তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ ভেদ ক'রে বার হয়ে আসছিল তা যেন এক একটি অঙ্গার খণ্ড—তেমনিই তার জ্বালা, তেমনিই তার তেজ! বিষয় ছিল মিউনিসিপ্যালিটির কী একটা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ—সব কথা ইন্দ্রাণী বুঝতেও পারলে না, তার মনেও রইল না অর্ধেক – কিন্তু সে স্থানকালপাত্র ভুলে গিয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই মধ্যবয়সী বিহারী ভদ্রলোকটির দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী এঁকে সম্মানিত করে নি, শিক্ষার সুযোগ পাওয়া তার সম্ভব নয়—কিন্তু শুধু প্রখর সহজ বুদ্ধি ও আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান তাঁকে যে মহিমা ও কর্মক্ষমতা দিয়েছে, তার কাছে ইন্দ্রাণীর মাথা নত না হয়ে পারল না।

ইন্দ্রাণী বসে ছিল সভার পিছনেই, তখন সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে, সভাস্থলের সামান্য আলোকে তাকে সেই ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাবার কথা নয়। কিন্তু বোধ করি, তার প্রস্ফুটিত সূর্যমুখীর মত উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখ এবং নিষ্পলক চাহনিই এক সময়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন

রঘুবীরবাবুর বক্তব্য গোলমাল হয়ে গেল, তারপরই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে পুনরায় তাঁর পূর্ব কথার জের টেনে নিলেন। বক্তব্য অবশ্য আর বেশী ছিল না, মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল, সভাও ভাঙ্গল সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু সে তথ্যটা বুঝতে ইন্দ্রাণীর আরও মিনিটখানেক সময় লাগল। তার পাশ থেকে অন্য মেয়েরা উঠে সভাস্থল ত্যাগ করছে দেখে তার চৈতন্য হ'ল, সে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

কিন্তু বাইরে এসে আবার একটু গোল বাধল। এখানকার পথঘাট এখনও তার আয়ত্ত হয় নি, তাছাড়া অন্ধকারে ঠিক বোঝাও যায় না—কোন্ পথ ধরবে ভাবছে সে, এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং রঘুবীরপ্রসাদ, ঈষৎ চমকে দিয়ে বললেন, 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ইন্দ্রাণীর সমস্ত দেহ অকস্মাৎ যেন কী কারণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ওঁর সঙ্গ নিলে। রঘুবীরবাবুই একটু পরে বললেন, 'সভায় যোগ দেবার আপনার ইচ্ছা হয়েছিল জানলে আমি তখনই অপেক্ষা করতুম—'

ইন্দ্রাণী এবার যেন একটু জড়িত-কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'না, ঠিক তা নয়! তখন বুঝতেও পারি নি। দাদার যা দরকার আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল, আর বিশেষ কোন কাজও ছিল না হাতে—তাই।...আপনার গাড়ি কোথায় গেল, হেঁটে ফিরতে কষ্ট হবে না?'

'না, এইটুকু ত! বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। আপনার সঙ্গে দেখা করব ব'লেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি যে নিজে ইচ্ছে ক'রে আজ আমাদের সভায় যোগ দিয়েছেন, আমার বক্তৃতা আপনাকে শোনাতে পেরেছি—এ কথাটি চিরদিন আমার মনে থাকবে!'

ইন্দ্রাণী জবাব দিতে পারলে না, তার কেমন যেন মনে হ'তে লাগল যে কথা কইতে গেলেই ওর গলা কেঁপে যাবে।

আর একটুখানি চল্‌বার পরই ওদের বাংলো পৌঁছে গেল। একেবারে দোরের কাছে এসে রঘুবীরবাবু বললেন, 'তাহ'লে আমি যেতে পারি—মিস্ বোস্?'

কী ছিল সে কণ্ঠস্বরে কে জানে, ইন্দ্রাণীর যেন নিমেষে সব গোলমাল হয়ে গেল। সে কিছু ভাবলে না, ভাববার অবসরও ছিল না, শুধু অন্ধ আবেগের প্রেরণায় সেই অন্ধকারেই তার ডান হাতখানা এগিয়ে দিলে রঘুবীরের দিকে। রঘুবীরও দুহাতে ওর হাতখানা চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'এ আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য ইন্দ্রাণী, এ আমার কল্পনার অতীত!'

মুহূর্তের আবেগ মুহূর্তেই কেটে যায়—ইন্দ্রাণীও সেই একটি মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হ'ল। বিষম লজ্জায় ওঁর মুঠোর মধ্যে থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে এক রকম ছুটেই সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল, একটা নমস্কার করার কথাও মনে রইল না।

এরপর রঘুবীরবাবুর বাড়ি যাওয়া ওর উচিত হবে কিনা, ভাবতেই দু'দিন কেটে গেল। কিন্তু নর্মদাকে ও একরকম কথাই দিয়েছে স্মরণ ক'রে তৃতীয় দিনে স্কুলের ফেরৎ রঘুবীরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। নর্ম্মদা ওকে দেখে আদরে অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। রঘুবীরবাবু আছেন কিনা জানা গেল না, জানবার প্রয়োজনও নেই—তবে তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর দেখা হ'ল না। সেদিনও না, তার পরের দিনও না। পর পর সাতদিন ইন্দ্রাণী গেল ওঁদের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়াতে এবং গান শোনাতে কিন্তু গৃহকর্ত্তা একদিনও কোন ছলেই ওদের সামনে এলেন না। পাছে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আর লজ্জায় সে সহজভাবে কথা বলতে না পারে এই ভয়ই ছিল ইন্দ্রাণীর, কিন্তু সে ভয় যখন অমূলক প্রমাণিত হ'ল তখন সে যেন একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল। এবং সে ক্ষোভ যেদিন নিজের কাছে ধরা পড়ল সেদিন সে নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠে স্থির করলে যে সে নর্মদাদের বাড়ি আর যাবে না।

সেই ভেবেই সেদিন সে ইস্কুলের ফেরত সোজা বাড়ি ফিরে এল। সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'পড়াতে গেলিনে ?'

'শরীরটা ভাল লাগছে না দাদা !'

বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে সুব্রত প্রশ্ন করলে, 'সে কী রে ! কী হয়েছে ?…জ্বরটর হয় নি ত ?'

'না না। এমনি—মাথাটা একটু ধরেছে—'

সে সুব্রতকে এড়িয়ে একখানা বই হাতে ক'রে নিজের ঘরে চলে গেল। ভাল লাগছে না ওর কিছুই, কিছুতেই মন নেই যেন। অকারণেই একটা তিক্ততা জমা হয়েছে মনের ভেতর—তার কারণ অনুসন্ধান করতে ও ভয় পায়। একটা অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা, একটা অপমানকর বেদনা ওকে ভুলতে হবে এটা ঠিকই, কিন্তু তার কোন পথই চোখে পড়ছে না যে !

সে বইখানা কোলের ওপর ফেলে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের শালবনের দিকে তাকিয়ে ছিল, সহসা একসময় পথের শুকনো অর্জুন পাতাগুলো মচ্‌মচ্‌ ক'রে উঠতে ও চম্‌কে চেয়ে দেখলে স্বয়ং রঘুবীরবাবু আসছেন, তাদেরই বাড়ির দিকে।

সে চকিতে ত্রস্ত হয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতসারেই একবার নিজের বেশ-ভূষায় চোখ বুলিয়ে, খোঁপাটা ঠিক ক'রে নিলে—কিন্তু তখনই অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেল না। বাইরে চেয়ার নিয়ে বসেছিল সুব্রত, সুব্রতই রঘুবীরবাবুকে অভ্যর্থনা ক'রে বসালে। ইন্দ্রাণী উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল অন্ধকারেই !—

অন্যান্য কুশল প্রশ্নের পর রঘুবীরবাবু বললেন, 'মিস্ বোস আজ আমাদের বাড়ি যান নি, তাঁর অসুখ-বিসুখ কিছু করল কিনা, তাই খোঁজ করতে এসেছি। আমি জানতুমও না, আমার স্ত্রী চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন অফিসে, জোর হুকুম —এখনই ওঁর খবর নিতে হবে—'

একটু হেসে রঘুবীরবাবু মুঠো খুলে একখানা কাগজ দেখালেন।

সুব্রত বললে, 'হ্যাঁ, ওর মাথাটা ধরেছিল নাকি, সেইজন্যেই যেতে পারে নি। ইন্দু, ও ইন্দু, রঘুবীরবাবু এসেছেন।'

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ ধরে তার পরিধেয় শাড়িখানা আরও একটু ভদ্রভাবে নামাবার চেষ্টা ক'রে এক সময়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। তার কণ্ঠ-কপোলের রক্তিমা অন্ধকারে চোখে পড়ল না কারুর, কিন্তু সেই শীতার্ত্ত হেমন্ত সন্ধ্যাতেও তার ললাট যে স্বেদসিক্ত হয়ে উঠেছিল তা একটু চেষ্টা করলেই দেখা যেত।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রঘুবীরবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এখন কেমন আছেন? মাথাটা ছেড়েছে?···সন্ধ্যাবেলা একটু মাঠের দিকে বেড়ালে বোধহয় ভাল হ'য়। অতিরিক্ত পরিশ্রমেই বোধহয়—'

বহু চেষ্টায় যে স্বর বার হ'ল তা যেমন শুষ্ক তেমনি তীক্ষ্ণ—ইন্দ্রাণী উত্তর দিলে, 'না, এখন ভালই আছি।'

ওঁরা দুজনেই সে কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন। সুব্রত বললে, কিন্তু রঘুবীরবাবু কথাটা ভালই বলেছেন, ঠাণ্ডা বাতাসে একটু পায়চারি করা উচিত।'

নিজের কণ্ঠস্বরের অকারণ তীক্ষ্ণতায় ইন্দ্রাণী নিজেই লজ্জা পেয়েছিল! সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'কোথায় আর পায়চারি করব, তার চেয়ে নর্মদাদিদির ওখানেই একটু বেড়িয়ে আসি। আপনি যান, আমি নিজে গিয়েই তাঁর চিন্তা দূর করব'—

ওর মনে রইল না যে কথাটা ও শুনেছিল আড়াল থেকে সুতরাং সে কথার উল্লেখ না করাই উচিত। কিন্তু রঘুবীরবাবু সহজভাবেই কথাটা নিলেন, জবাব দিলেন, 'আমাকেও বাড়িই ফিরতে হবে, যদি আপত্তি না থাকে, না হয় আমার সঙ্গেই চলুন।'

একমুহূর্ত্তেরও অল্প সময় ইতস্তত ক'রে ইন্দ্রাণী বললে 'চলুন।'

সে চাদরটা জড়িয়ে পথে যখন নেমে এল, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শুক্‌নো ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে উত্তর দিক থেকে, তার ফলে শাল ও আম্রবনের মধ্যে জেগেছে মর্মর—সে শব্দ যেন ভীত ক'রে তুলল ইন্দ্রাণীকে। সে চলতে চলতে একবার একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে শিউরে উঠল। অন্ধকারেও তার সে

শিহরণ লক্ষ্য করে রঘুবীরবাবু বললেন, 'ভয় পেলেন নাকি? ভয় কি? ওটা শুকনো পাতার আওয়াজ!'

লজ্জিতা ইন্দ্রাণী কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা জোর দিয়ে বললে, 'বড্ড শুকনো পাতা চারিদিকে আপনাদের এখানে!···বাগানগুলো রোজ ঝাঁট দেয় না কেন? দু' চোখে দেখতে পারি না আমি, পাতাঝরায় সময়টা!'

অন্যমনস্কভাবে রঘুবীর জবাব দিলেন, 'হেমন্তকালটাই খারাপ ইন্দ্রাণী, মানুষের বেলাও তাই। যৌবন চলে যায়, পাতাঝরার সময় আসে তারও, অথচ বার্ধক্যের রিক্ততাকে সে মেনে নিতে চায় না।'

তিনটি অক্ষরের একটি শব্দ—মনের অবচেতন গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা—ইন্দ্রাণীর সারা মনটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে গেল, অকস্মাৎ তার দুটি চোখ ভরে উঠল জলে। সে আর কথা কইলে না, নিঃশব্দে সেই সুতীব্র বেদনার মাধুর্যকে রক্তাক্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে করতে এগিয়ে চলল।

রঘুবীরবাবুও তেমনি অন্যমনস্কভাবে নীরবে পথ চলতে লাগলেন।

সুব্রত সেরে উঠেছে। তার মন এবার এই অলস মন্থর অবসরে উঠেছে হাঁপিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর কাছে বাড়ি ফেরার কথাটা পাড়তে তার সাহস হয় না। কারণ শরীর তার সুস্থ হ'লেও সবল হয় নি—সে কথা সে নিজেই জানে। আর ইন্দ্রাণী, তার দিন চলেছে কী এক উদ্দেশ্যহীন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। তার সমস্ত চিন্তা যেন কেমনতর এলোমেলো হয়ে গেছে। বাড়ির কথা, তার অতীত জীবনের কথা—যেন মনে হয় কোন্ যুগের কথা—সেখানে ফিরতে হবে বটে, কিন্তু কবে তা সে জানে না।

ইস্কুলে ওকে খাটতে হয় খুব বেশী। ইস্কুলের অনেকটা সুবন্দোবস্ত হয়ে গেছে, উন্নতিও হয়েছে ঢের, সেজন্য কুমুদিনীর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সেক্রেটারী রঘুবীরবাবুও এর মধ্যে দু' তিন দিন এসে সব দেখেশুনে, ওকে উচ্ছ্বসিত স্তুতি

জানিয়ে গেছেন এবং খুব সম্ভব তাঁরই প্ররোচনায় কমিটির এক বিশেষ সভায় ইন্দ্রাণীকে অনুরোধ করা হয়েছে বেশি মাইনে নেবার জন্য।

ইস্কুলের পর নিয়মিতভাবেই নর্মদার বাড়ি যায় ও। ছেলেমেয়েগুলিকে কিছু বাঙলা এবং কিছু গানও শিখিয়েছে সে, তাদের তার ভালও লাগে খুব। নর্মদার ত কথাই নেই—নিজের বোনের মতই তিনি ভালবাসেন ওকে। কিন্তু এ সবে ইন্দ্রাণীর মন ভরে না। কাজগুলো ক'রে যায় যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, মন তার সর্বদাই কী একটা অজ্ঞাত ক্ষুধায় হু-হু করে।

রঘুবীরবাবু সেদিনকার সেই দুর্বলতার পর খুবই সতর্ক হয়েছেন। দেখা তিনি প্রায় রোজই করেন—নিজের বাড়িতে, সহস্র কাজের ফাঁকে। নির্জনে দেখা করার যে সমস্ত সুযোগ তিনি এড়িয়ে যান-তা ইন্দ্রাণী লক্ষ্য করে, সেজন্য সে কৃতজ্ঞ। রঘুবীরবাবু নিজের গাড়ি দিয়ে কাছাকাছি পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল সব দেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু সুব্রতর কোন নিমন্ত্রণেই তিনি ওদের সঙ্গে যেতে রাজী হন্‌নি। তাঁর কাজের বিবরণটা সম্যক পাবার পর সুব্রতও সাহস করেনি বেশি পীড়াপীড়ি করতে।

এমনি করেই দিন কাটছিল, সহসা একদিন সুব্রত রঘুবীরবাবুর কাছে কথাটা পাড়লে, 'এবার মনে করছি বাড়ি ফিরব রঘুবীরবাবু! ইন্দ্রাণীকে ত ছাড়তে হয়!'

যেন চমকে ঘুম ভাঙল রঘুবীরবাবুর। তিনি কেমন একটা বিবর্ণ মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'সে কি? এরি মধ্যে? আপনি ত এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন্‌নি।'

'সুস্থ নিশ্চয়ই হয়েছি—হয়ত কিছু মোটা হ'তে বাকী আছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, দেশের জন্য মন টেনেছে এবার। তা ছাড়া ইস্কুলের চাকরীটা হয়ত এখনও গেলে আবার ফিরে পাওয়া যেতে পারে।'

রঘুবীরবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'অবিশ্যি দেশের জন্য যদি মন টেনে থাকে তাহ'লে কিছুই বলবার নেই, তবে ইস্কুল এদেশেও ছিল এবং মাস্টারীরও অভাব হ'ত না সুব্রতবাবু!'

সুব্রত ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললে, 'সে আমিও ভেবে দেখেছি। আপনি প্রথম থেকেই যে অনুগ্রহ করেছেন এবং যত রকমের সাহায্য করেছেন, তা'তে আপনার আশ্রয়েই আমার অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা যে হ'তে পারে সে ধারণা আমারও হয়েছে, কিন্তু—চিরকাল বাঙলার বাইরে কাটানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

রঘুবীরবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে, যেন জোর ক'রেই একটু হেসে বললেন, 'কী আর বলব বলুন, তবে অমন চমৎকার মাস্টারনীটিকে নিয়ে যেতে চাইছেন এতেই আমাদের আপত্তি। বাস্তবিক এই তিন মাসেই ইস্কুলটাকে কী করেছেন! আরও কিছুদিন থাক্‌লে আমাদের উপকার হ'ত খুব!

সুব্রত চুপ ক'রে রইল। রঘুবীরবাবু যেন একটা উত্তরের আশা ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লেন।……

সেদিন সন্ধ্যায় নর্মদার ওখানে ছিল ইন্দ্রাণীর নিমন্ত্রণ। এ ব্যাপার এর আগেও দু'একদিন হয়েছে—আহারের পর ঝি আর চাকর দিয়ে নর্মদা ওকে বাঙলোয় পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু আজকে আহার শেষ ক'রে উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখলে যে স্বয়ং রঘুবীরবাবু অপেক্ষা করছেন ওকে পৌঁছে দেবার জন্য।

সংবাদটা শুনে মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রাণীর বুকের কম্পন যেন দ্রুততর হয়ে উঠল, তারপরই শুষ্ক কণ্ঠে বললে, 'আপনি আর কষ্ট করবেন কেন, ঝিয়ের অসুবিধা থাকে আমি একাই যেতে পারব। এই তো মোটে রাত আটটা—'

ঈষৎ হেসে রঘুবীরবাবু বললেন, 'না, ঝিয়ের অসুবিধার জন্য নয়, আমারই একটু ওদিকে দরকার আছে, তাই –

ইন্দ্রাণী আর কোন কথা বললে না। রাস্তায় নেমে খানিকটা নিঃশব্দে পথ হাঁটবার পর রঘুবীরবাবু হঠাৎ বললেন, 'আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, চলুন না কাছারীর দিকটা ঘুরে যাই। দু-একটা কথাও আছে আপনার সঙ্গে!'

উত্তর দেবার মত ইন্দ্রাণীর অবস্থা ছিল না, অকস্মাৎ যেন দেহের সমস্ত রক্ত ওর মুখে উঠে এক ঝলক আবির ছড়িয়ে দিলে ওর সুন্দর গণ্ডে, তাও অন্ধকারে দেখা গেল না—শুধু নিঃশব্দে ও শালবনের পথটা ধরলে।

রঘুবীরবাবুই কথাটা পাড়লেন, 'আপনার দাদা যে এবারে বাড়ি ফিরতে চাইছেন! আপনার মত কি ?'

ইন্দ্রাণীর বহুদিনের একটা তন্দ্রার ঘোর যেন চমক লেগে ভাঙ্গল। তবু সে যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ-কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'তাঁর যদি শরীর সুস্থ হয়ে থাকে ত তিনি ফিরবেন, আমার মত আর কি দরকার বলুন! তাঁর জন্যই ত আমার এখানে থাকা!'

'কিন্তু শরীর কি তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে ? আরও কয়েকদিন থাকা কি উচিত ছিল না ?'

'তা হয়ত ছিল, কিন্তু মন যদি তাঁর এখানে আর না বসে, তাহ'লে ত শরীরও ভাল থাকবে না। তা ছাড়া কাজ ক'রেই যখন খেতে হবে তাঁকে, তখন আর বিদেশ-বাসের বিলাসে কি হবে বলুন!'

রঘুবীরবাবু একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'কিন্তু তাঁর জীবিকার একটা ব্যবস্থা এখানেও হ'তে পারে!'

'তা হয়ত তিনি চান না—!' কণ্ঠস্বর তেমনি নির্লিপ্ত, তেমনি উদাসীন।

রঘুবীরবাবু প্রাণপণ চেষ্টায় সহজভাবে বললেন, 'আপনাকে হারালে আমাদের স্কুলের বড় ক্ষতি হবে, সেই কথাটাই ভাবছি।'

'আরও উপযুক্ত লোক পাবেন বৈকি!···তা ছাড়া আমার এখানে স্থায়িত্ব কম, জেনেই ত আমাকে নিয়েছিলেন।'

তার গলার আওয়াজে অপমানকর শৈত্য!

সহসা উত্তাপ এল রঘুবীরবাবুরই কণ্ঠে, তিনি যেন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে বললেন, 'কিন্তু কিছুতেই কি আর কিছুদিন আপনাকে ধরে রাখা যায় না ?—অন্তত, অন্তত আর দু'মাস ?'

তীক্ষ্ণ ছুরির মত ইন্দ্রাণীর কথাগুলো যেন অন্ধকারকে চিরে দিয়ে গেল, 'তাতে কি লাভ হ'ত বলতে পারেন রঘুবীরবাবু ?'

'লাভ ?' ভগ্নকণ্ঠে রঘুবীরবাবু বললেন, 'সব লাভের হিসাব কি মুখে দেওয়া যায় ইন্দ্রাণী ?'

ইন্দ্রাণী !—আবার সেই ছোট্ট একটু শব্দ।

অকস্মাৎ যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী বললে, 'এখানে থাকাটা কি আপনার জন্য চান, না ইস্কুলের জন্য ?'

রঘুবীরবাবু একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমার জন্য চাই একথা বলবার অধিকার আমার যে নেই ইন্দ্রাণী। বলতে পারলে খুশি হতুম।'

অন্ধকারেই ইন্দ্রাণীর ওষ্ঠে একটা বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। সে বললে, 'কিন্তু তারপর ? আরও ছ'মাস থাকলে আপনার কি সুবিধা হ'ত ?···এমনি কালে-ভদ্রে দেখা হ'ত—এই ত !'

রঘুবীরবাবু চুপ করে থাকলেন। ইন্দ্রাণী নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করে বললে, 'বড়জোর সৌজন্য ক'রে মধ্যে মধ্যে এমনি পৌছে দিয়ে যেতেন কিম্বা আমাদের দারিদ্র লাঘব করার জন্য নিঃশব্দে আড়াল থেকে কিছু সাহায্য করতেন। কিন্তু আপনার সেই পরোপকার ও স্নেহের বিলাস চরিতার্থ ক'রে আমার কি লাভ হ'ত ভেবে দেখেছেন কি ? আমার রক্তমাংসের দেহ রঘুবীরবাবু, আপনার মত পাথর নয়।'

রঘুবীরবাবু নতমুখে অভিযোগটা মাথা পেতে নিয়ে যেন চুপি চুপি জবাব দিলেন, 'আমারই অন্যায় ইন্দ্রাণী, আমারই অপরাধ !'

ইন্দ্রাণী পাগল হয়ে গেছে তখন, সে চাপা অথচ তীব্র গলায় বললে, 'দোহাই আপনার রঘুবীরবাবু, অন্তত একবার সৌজন্যটা থাক, সোজাসুজি বলুন আমাকে ভালবাসেন কি না !······'

রঘুবীরবাবু যেন কী একটা যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠলেন। বললেন, 'সে কি এতদিন পরেও বলতে হবে ইন্দ্রাণী ?'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু তারপর ? আর কিছুই কি বলবার নেই আপনার ?

'বলবার হয়ত অনেক কথাই আছে, কিন্তু করবার কিছু নেই। কোন পথ আমার কোন দিকে খোলা নেই!'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু কেন নেই জানতে পারি কি? আমাকে বিয়ে করুন। বহু-বিবাহও ত লোকে করে!'

রঘুবীরবাবু বললেন, 'নিজের যা যন্ত্রণা তা নিজেরই থাক, অকারণে নর্মদার বুক ভেঙ্গে দিতে পারব না!'

'সৌভাগ্য নর্মদার! বিদেশিনী বাঙালীর মেয়ের বুক ভাঙ্গে ত ভাঙ্গুক—নর্মদা সুখে থাক, শান্তিতে থাক!'

'শুধু তাও নয়, ইন্দ্রাণী! আমি এ দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোক, এখানকার জননেতা আমি—কংগ্রেস বল্‌তে, এদেশের যা কিছু জাতীয় অনুষ্ঠান বলতে সবই আমি। আমার দিকে তাকিয়ে আছে এ শহরের লোক—আমি যদি কোন অনাচার করি তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত লোকচক্ষে হেয় হয়ে যাবে।···না, সে সম্ভব নয় ইন্দ্রাণী! আমার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, ব্যক্তিগত কামনার জন্য আমি স্বদেশের ক্ষতি করতে পারব না। যে সমস্ত যুবকেরা আমার দিকে তাকিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ গঠন করছে, তাদের আদর্শকে ছোট ক'রে দিতে পারব না।'

এই নিষ্ঠুর অপমানে ইন্দ্রাণীর সমস্ত দেহ মন যেন অসাড় হয়ে গেল। জবাব দেবার, কথা কইবার, তিরস্কার করার কোন ক্ষমতা কোথাও তার রইল না।

রঘুবীরবাবুই আবার বলে চললেন, 'জানি আমার জীবনের বসন্তের দিক, আনন্দের দিক চিরকালের মত শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে গেল কিন্তু তবু আমার কর্তব্যেরই জয় হবে ইন্দ্রাণী। আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু আমার আদর্শ, আমার দেশসেবার ব্রত, প্রাণের চেয়েও বড়। তোমার সামান্য কণ্ঠস্বরের জন্যে আমি বাতাসে কান পেতে থাকি, তোমার পায়ের শব্দ আমার রক্তকে চঞ্চল ক'রে তোলে—এ সবই সত্য কথা ইন্দ্রাণী, কিন্তু তবু, তবু আমার কিছুই করবার নেই।'

ভগ্নকণ্ঠে ইন্দ্রাণী বললে, ‘আমার জন্য আর কিছুই করবার নেই তোমার, কোন ত্যাগ করতে পারো না ?’

‘প্রাণ দিতে পারি ইন্দ্রাণী, সেইটাই সবচেয়ে সহজ।……’

বহুক্ষণ, যেন বহু যুগ নিঃশব্দে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্খলিত কণ্ঠে ইন্দ্রাণী শুধু বললে, ‘আচ্ছা, নমস্কার।’

তারপর সেই অন্ধকার শালবনের মধ্য দিয়ে সে নিজের বাংলোর পথ ধরলে। রঘুবীরবাবু সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। সঙ্গে যাবার সাহস তার হ'ল না। অনেকক্ষণ, বোধ হয় মিনিট-পাঁচেক পরে শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন ‘তুমি যাও ইন্দ্রাণী, কালই যাও—আর অপরাধ বাড়াব না।’

পরের দিন সকালেই কুঞ্জবাবু এসে জানালেন, ‘সুব্রতবাবুরা আজই চলে যেতে চান। ভাড়া ওঁরা এ মাসের পুরোই দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন……কিন্তু আমি নিইনি।’

বাইরের দিক থেকে শূন্যদৃষ্টি ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর রঘুবীরবাবু বললেন, ‘ও, আজই চলে যাচ্ছেন। তা, বেশ ত !· না, আপনি ঠিকই করেছেন।’

কেরাণী ঈশ্বরদয়াল এলেন কী কতকগুলো কাগজ সই করাতে, ক্লান্তভাবে তাঁকে বললেন, ‘একটু পরে ঈশ্বরবাবু, একটু পরে।’ তারপর কুঞ্জবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ‘আমার গাড়ীটা ব্যবস্থা ক'রে দিন না, স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।’

‘সে কথাও আমি বলেছিলুম, কিন্তু তাঁরা বাসের টিকিট কেটে ফেলেছেন। রাজী হলেন না।’

‘ও, আচ্ছা।’

কুঞ্জবাবু চলে যাওয়ার পর রঘুবীরবাবু কিছুক্ষণ কাগজপত্রে মন দেবার বৃথা চেষ্টা ক'রে উঠে পড়লেন। শীতের অলস রৌদ্র এসে পড়েছে ধূলিবিবর্ণ শাল-

গাছের পাতায়, পথের বাতাস অসংখ্য গরুর গাড়ীর চাকা থেকে উৎক্ষিপ্ত ধূলোয় ভারী। পথে ঘুরতে ভাল লাগে না—তবু পথে-পথেই তিনি ঘুরলেন, বহুক্ষণ ধরে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণে কালি—মুখ শুক্‌নো—এ রঘুবীরবাবুর সঙ্গে শহরের লোক পরিচিত নয়। তারা বিস্মিত হয়ে তাকাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে, তাদের দৃষ্টিতে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে তিনি বাগানের পথ ধরে এক সময়ে এসে হাজির হলেন ইন্দ্রাণীদের বাংলোতে। ওরা চলে গেছে, ঘরগুলো হা-হা করছে খালি—কতকগুলো কুচো কাগজপত্র এদিকে ওদিকে ছড়ানো, দু-একটা ভাঙ্গা-ফুটো পরিত্যক্ত জিনিস! এক মুহূর্তের বেশী সেখানে দাঁড়াতে পারলেন না রঘুবীরবাবু, এক রকম ছুটেই বেরিয়ে এলেন।

তখন এগারোটা, ট্রেনের আর মাত্র একঘণ্টা দেরি আছে। গাড়ি অফিস-ঘরের সাম্‌নেই তৈরী থাকে, তিনি অকস্মাৎ গাড়িতে উঠে বসে নিজেই চালাতে শুরু করলেন, বিদ্যুৎগতিতে। স্পিডোমিটারের কাঁটা ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ—শেষ পর্যন্ত ষাটে এসে পৌঁছল। দীর্ঘ পথ, তবু এই এক ঘণ্টার ভেতরে পৌঁছতেই হবে।

সুব্রত বোনকে কোন প্রশ্নই করেনি, কিন্তু তার মুখ দেখে বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছিল কিছুটা, তাই তার মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা এবং আকস্মিক পলায়নের কোন কারণই জানতে চায়নি। স্টেশনে এসে ইন্দ্রাণী শুষ্ক মুখে, আরক্ত চক্ষু মেলে বসে ছিল ফেলে-আসা পথের দিকেই চেয়ে—বোধ হয় তার সমস্ত মন অপরিসীম ধিক্কার ও আত্মগ্লানির পরেও কোথায় বসে আশা করছিল যাত্রার আগে, অতি পরিচিত, শান্ত, সৌম্য একখানি মুখ। কিন্তু মিনিটের পর মিনিটই শুধু কেটে গেল, না পেলে তার দেখা, না পারলে ইন্দ্রাণী নিজের মনের কাছে স্বীকার করতে—যে সে তারই দেখা চায়!

সিগন্যাল দিল। প্লাটফর্মের সমস্ত লোক চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তবু ইন্দ্রাণীর মুখে চোখে যেন কোন প্রাণ-লক্ষণ জাগল না। সুব্রত এসে পেছন থেকে সস্নেহ কণ্ঠে ডাকলে, 'ইন্দু, এবার যে উঠতে হবে দিদি!'

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে চাইলে, 'উঠতে হবে? গাড়ি এসেছে?...এই যে—'

কিন্তু উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর নজরে পড়ল দূর পথের বাঁকে ধূলোর ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করতে করতে ছুটে আসছে একটি পরিচিত গাড়ি। সুব্রতও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দিকে চেয়ে বললেন, 'রঘুবীরবাবুর গাড়ি না? আমি তাই ভাবছিলুম, ভদ্রলোক যাবার আগে একবার দেখা করতে এলেন না! আমিও সময় পেলুম না—। বোধহয় উনিও সকালে খুব ব্যস্ত ছিলেন, না?'

ইন্দ্রাণী জবাব দিল না। গাড়িও তখন এসে গেছে। মেয়ে-গাড়ি খালি দেখে সুব্রত তাড়াতাড়ি ওকে সেইখানেই তুলে দিয়ে মালপত্র নিয়ে নিজে ছুটল স্থানের সন্ধানে। রঘুবীর যখন এসে পৌঁছলেন তখন সুব্রতর কোনও চিহ্ন নেই কোথাও, ইন্দ্রাণী শুধু তার গাড়ীতে বসে আছে, ওধারের প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে।

রঘুবীরবাবু কাছে এসে দাঁড়াতে সে মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'সময় মোটে ছিল না বলেই দাদা দেখা করে আসতে পারেন নি, তাঁকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না।...আর নর্মদাদিদিকে বলবেন, তাঁকে আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। তাঁর দয়া, তাঁর স্নেহ চিরদিন মনে থাকবে—'

রঘুবীরবাবু ধরা গলায় বললেন, 'ইন্দ্রাণী, অপরাধের আমার মার্জনা নেই জানি। কিন্তু তবু, কিছু কি তোমাকে আমার দেওয়া সম্ভব নয়? কোন উপকারে কি আমি আস্‌তে পারি না?'

'না।' শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিলে ইন্দ্রাণী।

'কিন্তু—' ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন রঘুবীরবাবু, 'আমার দিন কি নিয়ে কাটবে ইন্দ্রাণী, অন্তত কিছু আমাকে দিয়েও যাও। কোন স্মৃতিচিহ্ন কি ভিক্ষা দিতে পারোনা?'

'না।'

আরও কিছু হয়ত রঘুবীরবাবু বলতেন, সেই সময়েই গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা দিল। সমস্ত আবেগ প্রাণপণ শক্তিতে দমন করে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন

কিন্তু শেষ মুহূর্তেই একটা বিপর্যয় ঘটল। অকস্মাৎ ইন্দ্রাণী গাড়ী থেকে নেমে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে ওকে, তারপর চুপি চুপি বললে, 'আমার প্রণাম দিয়ে গেলাম তোমাকে, আমার শেষ স্মৃতিচিহ্ন!'

তখন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। কোনমতে সে আবার গাড়িতে উঠে পড়ল।

# অভিমান

প্রকাণ্ড বড় দো-মহালা বাড়ী, তাহারই গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে ছোট একটি চালা—দৃশ্যটা বড়ই বিসদৃশ, তবু দিনের পর দিন দেখিতে দেখিতে ব্যাপারটা সকলেরই সহিয়া গিয়াছে, আর বস্তুত বড় বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে যদি ওটা ঠেকিয়া না থাকিত তাহা হইলে হয়ত আর চালা ঘরটির অস্তিত্বই থাকিতনা এতদিন, এমনই তাহার জীর্ণ দশা।

বড় বাড়ীটি ছোট ভাইয়ের, চালাটি দাদার।

অর্থাৎ চালাটাই পৈতৃক আমলের সম্পত্তি; দাদা আই এ পাশ করিয়া আর লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, মাইনর ইস্কুলে হেড মাষ্টারী করিতে গিয়াছিলেন ফলে এই যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির যুগেও (একচল্লিশ বছর হেড মাষ্টারী করিবার পর) মাহিনা ও ভাতা মিলাইয়া আয় দাড়াইয়াছে মোট বাহান্নটি টাকা। তাহাতে আর যাই হোক্ চালা ফেলিয়া পাকা ঘর তোলা যায় না, চালাও সারানো কঠিন। আর ছোট ভাই দাদার আয়েই লেখাপড়া শিখিয়া ইনসিওরেন্সের দালালী শুরু করিয়াছিলেন, আজ তাহার মাসিক আয় দু'হাজার টাকারও উপর। কোম্পানী মাহিনা, ভাতা, কমিশন দিয়া পুষিতেছেন, তৎসহ স-পেট্রোল একখানি মোটর গাড়ী ফাউ।

কিন্তু আমাদের বীরেন মাষ্টার মশাইয়ের তাহার জন্য কোন ক্ষোভ আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে ঠিক নির্বিকারও নহেন, বরং সগর্বে যখন তখন পরিচিতদের কাছে গল্প করেন, 'আমার ছোট ভাই তা বলে আমার মত ভিখিরী নয়। সে মস্ত লোক, আগের দিন হ'লে দুয়োরে হাতী বাঁধা থাকত। এখন মোটর থাকে। আর কত বড় বাড়ী, সে কি আর আমার মত ভাঙ্গা চালায় থাকে। হা-হা হা!' ইহারই মধ্যে মস্ত রসিকতার সন্ধান পাইয়া নিজেই হাসিয়া খুন হন।

কখনও বলেন, 'আমার ভাই কানুকে চেনো না? ঐ যে ধীরেন রায়? মস্ত বড় লোক। ও আমার আপন ছোট ভাই!' এই অবিশ্বাস্য সংবাদটি দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শ্রোতাদের উপর সংবাদের প্রভাবটা লক্ষ্য করেন, তাহার পর পুনশ্চ সগর্বে বলেন, 'তোখোড় ছেলে, বুঝলে না! প্রথম যখন ইনসিওরেন্সের দালালীতে ঢুকল, তখন ওকে দেখলে কষ্ট হত। না খেয়ে না দেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত—জল নেই, রোদ নেই, হিম নেই—আজ দেখ তার পয়সা খায় কে! করলে ত এই সব নিজের চেষ্টায়! এঁ্যা?'

শ্রোতাদের মধ্যে কেহ হয়ত বলিয়া বসে, 'আপনি ত বড় ভাই, তার এখন পয়সা হয়েছে—উচিত ত আপনাকে এখন ওর দেখা। কতই বা খরচ আপনার। এখনও কি আঁর সামান্য ঐ কটা টাকার জন্য আপনাকে মাষ্টারী করতে দেওয়া ওর উচিত!'

তাহাতে বীরেনবাবু চটিয়া যান, বলেন, 'তা কি করবে? ও ছাপোষা মানুষ, ওর ছেলেমেয়ে আছে, সব পয়সা ত আর বিলিয়ে দিতে পারে না। তাছাড়া আমি বড় ভাই, ওর কাছ থেকে নেবই বা কেন! ভগবান ত এখনও একেবারে অক্ষম করেন নি? যতদিন পারব খেটে খাবো!'

চালা ঘরটার উল্লেখে বলেন, 'ঐ বেশ আছে, তুমিও যেমন। আমিই বা কদিন? যেমন আমি হেলে পড়েছি, আমার ঘরও তেমনি!

শুধু ভাই বলিয়া নয়, পৃথিবীতে যেন কাহারও উপর কোন অভিমান ছিলনা ভদ্রলোকের। বাজার হইতে মাছের থলি প্রায়ই শূন্য লইয়া ফিরিতে হয়, তবু কোন দিন কোন অনুযোগ করেন না। বরং গৃহিণীকে আসিয়া বলেন 'জানো বড় বৌ, আজ অনেক পয়সা রোজগার করেছি সকাল বেলা!' . তারপর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বুঝাইয়া দেন—'এই যে ধরোনা মাছের পয়সা ত বাঁচলই, তার সঙ্গে তেল মসলা কয়লা সব ধরো। এটা ত খরচ করব বলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলাম, যখন বেঁচে গেল তখন রোজগার বলেই ধরব বৈ কি!' শুধু সামান্য

একটু ডাল ও তেঁতুল দিয়া ভাত খাইয়া উঠিয়াও উদ্গার ছাড়েন সশব্দে, 'আঃ! যাই বল বড় বৌ, আজকের খাওয়াটা বড় ভাল হয়েছে। কাঁটা খোঁচা কোথাও নেই, ডাঁটা ছিব্‌ড়ের বালাই ছিল না—একেবারে নিষ্কণ্টক খাওয়া। এমনি খাওয়াই আমার ভাল লাগে!'

তাঁহার সমসাময়িকদের অনেকেই আজ ধনী। এমন কি যাহারা অনেক পরবর্তী তাহারাও প্রকাণ্ড মোটর করিয়া যখন কাদা ছিট্‌কাইয়া চলিয়া যায়, তখন তিনি আন্তরিক আনন্দে বলিয়া ওঠেন, 'আমাদের সন্তুও মোটর কিনেছে? বা-রে, আমি ত জানতুম না! কবে কিনলে? বেশ বেশ! বড় আনন্দ হল। কী করে? চৌরঙ্গীতে হোটেল করেছে? এটা ত মন্দ নয়—কীই বা হত চাকরীর জন্যে ফ্যা ফ্যা করে বেড়িয়ে—হয়ত শেষে ষাট টাকা মাইনে। তবু ওর যে স্বাধীন ব্যবসার দিকে মন গেছে এই ভাল। চৌরঙ্গীতে ও সব হোটেলে খায় কারা? সাহেবরা খায়? বেশ ত! যাক্—ছেলেটার জন্য বড় দুর্ভাবনা ছিল। গ্রামার আর আঁক মোটে মাথায় ঢুকতনা, কতদিন ভেবেছি কী করে খাবে ছেলেটা। বড় ভাল হয়েছে। বে-থা করেছে? ভাল ভাল, একদিন দেখে আসব।'

কিংবা একদিন হয়ত বাজারের পথে কোন হঠাৎ-বড় লোকের বৈঠকখানায় ঢুকিয়া পড়িয়া তাহার চার পয়সা দামের সিগারেটটি নষ্ট করাইয়া বলেন, 'এই সুনু—তুই নাকি কী সব ব্যবসা করে পয়সা-কড়ি করেছিস? হতভাগা, মাষ্টার মশাইকে একবার খবরটা দিয়ে আসতে পারো না, না? তোদের ভাল হয়েছে শুনলে আমাদের মনটাতে কত আনন্দ হয় বল্ দেখি! বৌমাকে একবার ডাক্ না, খোকা হয়েছে না, খোকা? ডাক ডাক, দেখে আশীর্বাদ করে যাই!'

তারপর বধূমাতার মাথায় হাত বুলাইয়া, ছেলেটাকে লুফিয়া নাচাইয়া আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হন। প্রত্যাশা যে তাঁহার কিছু নাই তা সেই হঠাৎ-বড় লোকেরাও বোঝে। অপ্রস্তুত হইয়া আসিয়া পায়ের ধূলা লয়। বীরেন মাষ্টার মশাই কিন্তু এক কাপ চা পর্যন্ত খাইতে রাজী হন না। বলেন, 'হ্যাঁ,

ঐ সব বড়মানষী নেশা ঢুকিয়ে দাও, তারপর মরি আর কি! না না, চাল পাল্‌টানো কিছু না। তা খবর টবর দিস, আবার নতুন খোকাখুকি হ'লে।'

ঈর্ষা নাই, বিদ্বেষ নাই কোন দুঃখ-বোধ পর্যন্ত নাই। হা-হা করিয়া হাসিয়া, চেঁচাইয়া পরের গুণ দশগুণ করিয়া প্রচার করিয়া এবং দোষ প্রাণপণে ঢাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ান মনের আনন্দে। স্ত্রী আগে যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। কোনমতে একটা মোটা কাপড় জামা ও ক্যাম্বিশের জুতা পাইলেই মাষ্টার মশাই মহা খুশী। একান্ত অভাব হইলে আট-দশ টাকার টিউশনী জুটাইয়া লন, আবার কোনমতে দিন চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা হইলেই ছাড়িয়া দেন। অন্য কোন মাষ্টার মহাশয়ের অভাব তাঁহার চেয়ে বেশী বুঝিলে যাচিয়া নিজের টিউশনী তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আসেন।

কিন্তু মানুষ যত অভিমান ত্যাগ করে এবং বেদনাবোধকে উড়াইয়া দেয় ভগবান হয়ত ততই তাহাকে পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষা হইতে মাষ্টার মশাইও বাদ গেলেন না।

একটি মাত্র কন্যাকে বহু দুঃখ করিয়া ধার-দেনা ভিক্ষা করিয়া পাঁচ জনের সাহায্যে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। দোজবরে হইলেও পাত্রটি ভাল, অল্প বয়স, ভাল রোজগার করে। এই বিবাহের পর হইতেই যেন আরও নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা মেয়েটি বিধবা হইয়া এক দিন বাপের কাছেই ফিরিয়া আসিল। রোজগার ভাল করিলেও জামাই কিছু রাখিয়া যায় নাই—জমি-জমাও কোথাও কিছু নাই। ছোট ভাই একজন আছে, সে-ও রীতিমত ছাপোষা।

গৃহিণী আছড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহার চোখের জল শুকাইতে চায় না কিছুতেই। পাড়ার লোক পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু বীরেন বাবু নির্বিকার। কন্যাকে কাছে বসাইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শুধু বলিলেন, 'ভগবানের মার মা—দুঃখ করে এর হাত থেকে পার পাবি না। যত

কাঁদবি—কান্না আর ফুরোবে না। সে-ত ফিরে পাবার নয়, ভাগ্য ত পাল্‌টানো যায় না। এর একমাত্র ওষুধ হ'ল কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা।'

তিনিও কার্যত তাহাই করিলেন। সকালে বাড়ীতে কোচিং ক্লাস বসাইয়া প্রায় টাকা পনেরো আয়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং সন্ধ্যায় কন্যাকে পড়াইতে শুরু করিলেন। গৃহিণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'যতটা আমার বিদ্যেতে কুলোয় পড়িয়ে ইস্কুলে দেব। একটা পাশ করলে হয়ত ছোট খাটো মাষ্টারী বা চাকরী যোগাড় করতে পারবে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে পারে তবে ত!'

পাড়ার অল্পবয়সী তরুণরা কেহ কেহ আসিয়া বলিল, ওর আবার বিয়ে দিন মাষ্টার মশাই—এই বয়স থেকে ঐ রকম হয়ে থাকবে?

'দ্যাখ্‌না বাবা, পাত্র যদি সে রকম পাস! আমার কোন আপত্তি নেই। তবে বিধবাই হোক আর যাই হোক, বিনা পয়সায় কি আর বিয়ে হবে? আমার ত একটা বিয়ের দেনাই শোধ হয় নি এখনও। কোথা থেকে আর টাকা পাবো। প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা পর্যন্ত খেয়ে বসে আছি।'

ফলে উৎসাহ নিভিয়া যায় অনেকেরই। রূপ নাই, মেয়েটি কালো—তার উপর বিত্তহীনা, আবার বিধবা। এ মেয়ের পাত্র জোটা সহজ নয়, জুটিলও না। বীরেন বাবু সেজন্যও কোন অনুযোগ করিলেন না, যেমন আগেও বিশেষ কোন উৎসাহ দেখান নাই। মেয়ে কমলা তখন প্রতিবাদ করিলে বরং বলিয়াছিলেন, 'কোথা পাবো মা পাত্র যে আবার বিয়ে দেব? ওরা আমাকে ভালবাসে, কথাটা বললে মিছিমিছি প্রতিবাদ করি কেন? ওরাও খুঁজুক, আমিও তোকে পড়িয়ে যাই।'

কিন্তু আসল আত্মাভিমানের জায়গায় ঘা পড়িলে দেখা গেল যে ভগবানের পরীক্ষায় পাশ করা অত সহজ নয়।

যে ইস্কুলে বীরেন বাবু হেড্‌মাষ্টারী করিতেন সেটি ছিল তখন এ অঞ্চলের একমাত্র ইস্কুল। এখন অনেকগুলি ইস্কুল হইয়াছে তবু এ ইস্কুলে ছাত্র কমিবার কথা নয়—এতদিন খুব কমেও নাই। কারণ এ অঞ্চলের অধিকাংশ অভিভাবকই

ছিলেন বীরেন বাবুর ছাত্র। সম্প্রতি বহু নূতন বাসিন্দা আসায় একটা গণ্ডগোল বাধিয়াছে। বীরেন বাবু প্রাচীনপন্থী, গাধা পিটিয়া ঘোড়া করার কথাই তিনি জানেন, তাঁহার ধারণা কঠোর শাসন ছাড়া ছেলেদের লেখাপড়া হয় না। কিন্তু এখনকার ছেলেরা সে সব শাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে, অভিভাবকরা আসেন নালিশ করিতে প্রথম হেডমাষ্টার পরে সেক্রেটারীর কাছে। কোন কোন অভিভাবক ইস্কুলের কার্য-নির্বাহক কমিটিতে ঢুকিবার চেষ্টাও করেন, উদ্দেশ্য এই বুড়ো হাবড়া ইস্কুল মাষ্টারকে তাড়ানো।

সেক্রেটারী এবং কোন কোন কমিটি-মেম্বার মাথা চুল্‌কাইয়া ইতস্ততঃ করিয়া কথাটা নিবেদন করেন। কিন্তু বীরেন বাবু একেবারেই উড়াইয়া দেন, 'হ্যাঁ, ছেলেদের মারবে না, ধরে সন্দেশ খাওয়াবে! গোবেড়েন না দিলে ঐ সব গাধারা মানুষ হয়? ঐ ত সব অন্য ইস্কুলের বাবুরা, কী মানুষই সব করছেন ছাত্রদের। বাঁদরামী বেড়েই চলেছে চারিদিকে, আর বিদ্যে যে কত হচ্ছে, তা দু-একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা কইলেই ত বুঝতে পারবে বাবাজী। ওসব কথা আমাকে শুনিও না। দেখি যাই একবার, সুনীতি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে!'

এ রোগ তাঁহার বহু কালের। কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি, কিংবা ব্যাকরণগত সংজ্ঞা লইয়া মনে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই ছোটেন সুনীতি চাটুয্যের কাছে, কোন অঙ্কের বইতে ভুল লেখা আছে মনে করিলে সুরেন গাঙ্গুলীর কাছে এবং ইংরাজীর জন্য জে, এল্‌ ব্যানার্জ্জির কাছে গিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত ও বিব্রত করিয়া তোলেন। জে, এল ব্যানার্জ্জির মৃত্যুর পর আবার কে এক অধ্যাপককে ধরিয়াছেন। পড়াশুনার পদ্ধতি লইয়া মাথা ঘামান না তত, যত ঝোঁক নির্ভুল তথ্যের দিকে। বইতে কোন একটি শব্দ ভুল লিখা আছে কিনা না দেখিয়া কোন বই পাঠ্য করেন না।

কিন্তু এসব বিষয়ে আধুনিক হইলেও শাসন ব্যাপারে ছিলেন একেবারেই সেকেলে। দু-একজন কমিটি-মেম্বার এবং একাধিক সেক্রেটারী-প্রেসিডেন্ট

অনেকবার বিলাতী বই হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এ সম্পর্কে কোন কথা তিনি কানেই তুলিতে চান না, বলেন, 'রেখে দাও রেখে দাও—ভারি জানে ওরা, তাই পণ্ডিতি করতে এসেছে। আমি এই তেতাল্লিশ বছর ধরে গরু গাধা চরাচ্ছি, আমি জানি না, ওরা জানে! ওসব, বুঝলেনা বাবারা, নতুন নতুন কথা বলে শুধু পাণ্ডিতি দেখানো।'

অথচ, একটা কথা তিনি ইদানীং নিজের মনের কাছে অন্তত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন যে তাঁহার ইস্কুলের ছাত্র সংখ্যা খুব ধীরে ধীরে নিয়মিত ও নিশ্চিন্ত ভাবে কমিয়াই চলিয়াছে। অনেক ইস্কুল হইয়াছে চারিদিকে সত্য কথা, তেমনি যুদ্ধের দৌলতে এই সব শহরতলীতে লোক সংখ্যাও এত বাড়িয়াছে যে সর্ব্বত্রই স্থানাভাব। সেক্ষেত্রে তাঁহার ইস্কুলে যদি তিন বছরে দেড়শ'টি ছাত্র সংখ্যা কমিয়া মোট একশত সাতষট্টিতে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে চিন্তার কথা বৈকি! সরকারী গ্র্যাণ্ট বা দান আছে সত্য কথা তবু এখনই মাসিক ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে, ইতিমধ্যেই দুইবার রিজার্ভ ফাণ্ডে হাত দিতে হইয়াছে, বাড়ীটা আর না সারাইলে নয় তবু চোখ কান বুজিয়া ভাঙ্গা ঘরেই দিন চালানো হইতেছে। এধারে বাজার দর হিসাবে মাষ্টার মহাশয়দের মাগ্‌গীভাতা বা মাহিনা কিছু বাড়ানো নিশ্চয়ই উচিত—কিন্তু সে কথা এখন চিন্তা করাও অসম্ভব।

মাষ্টার মশাই যেন কতকটা নিজের মনকেই সান্ত্বনা দিবার জন্য গলা চড়াইয়া বলেন, 'আসলে এতগুলো হাইস্কুল, এর মধ্যে মাইনর ইস্কুল চলে? সবাই চায় একেবারে হাইস্কুলে দিতে। ব্যাটারা বোঝে না যে মাইনর ইস্কুলে বনেদটা কত শক্ত হয়ে যায়!'

অঙ্কের মাষ্টার জীবন বাবু তাঁহার দড়ি-বাঁধা চশমাটার মধ্য হইতে জুল জুল করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলেন, 'তাই যদি বলেন ত—এখানকার কোন ইস্কুলেই ত জায়গা নেই—এখান থেকে অত পথ হেঁটে সব বালিগঞ্জের ইস্কুলে

যাচ্ছে ; ঢাকুরের ইস্কুলটাও ত মাইনর, সেখানেও ত ছাত্র খুব কম নয়। শুনেছি এ সেসনে প্রায় সাড়ে তিনশ'র ওপর হয়ে গেছে—তাই না পূর্ণ ?'

বীরেন বাবু হঠাৎ চেঁচাইয়া ওঠেন, 'তাহলে আমার জন্যই ছেলেরা সব চলে যাচ্ছে, এই ত ? তা বেশ, তোমরাই ভাল করে ইস্কুল চালাও, আমি চলে যাচ্ছি !'

জিভ্ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া জীবন বাবু বলেন, 'ছি ছি তাই কখনও বল্‌তে পারি। এসব কী বলছেন! আমি বলছি এখানকার কতকগুলো লোকের বদ্‌মায়েসী আছে। তারা চায় ইস্কুলটা উঠিয়ে দিতে।'

বীরেন বাবু আবার খুশী হইয়া ওঠেন কিন্তু তবু ঢাকুরিয়া এম-ই স্কুলের ছাত্র সংখ্যার তথ্যটা কাঁটার মত খচখচ্ করে মনের মধ্যে। কোথায় যেন একটা বিবেকের সূক্ষ্ম প্রশ্ন শুনিতে পান অন্তরে অন্তরে, এটার জন্য কি তাহা হইলে তিনিই দায়ী ?

নূতন জীবন স্রোত যে বিপুল কোলাহলে চারিদিক ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, কানে তুলা দিয়া তাহার আগমনের শব্দটাকে হয়ত এড়ানো যায় কিন্তু সে প্রলয়ঙ্কর আবির্ভাবের ফলাফলকে ঠেকাইবেন কি করিয়া ? বিভ্রান্ত বীরেন বাবুর সদানন্দময় ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া ওঠে, একটির পর একটি। কুটিল একটা সংশয়ে প্রতিদিনকার জীবন যেন বিসাইয়া ওঠে, তাহা হইলে কি তিনি ভুলই করিয়া আসিতেছেন এতদিন ?

ইতিমধ্যে সরকারী দপ্তর হইতে এক নিমন্ত্রণ পান।

গান্ধীজীর বেসিক এডুকেশন সম্বন্ধে সরকার প্রবীণ শিক্ষকদের সহিত পরামর্শ করিতে চান। দেশের সমস্ত প্রাইমারী বা মাইনর ইস্কুলেই নাকি অতঃপর এই বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করিতে হইবে। আহ্বান পাইয়া বিহ্বল বীরেনবাবু বাজার হইতে তাড়াতাড়ি দুই একখানি বই কিনিয়া আথেন—এ সম্পর্কে তথ্যাদি আছে বলিয়া শুনিয়াছেন এমন সব বই। কিন্তু তাহাতে বিস্ময় আরও বাড়ে। রাগে জ্বলিয়া ওঠেন, এ আবার কী, প্রথম দুবছর ছেলেদের কোন অক্ষর পরিচয়ই হবে না। ঝাঁটা মারো শিক্ষার মুখে !

সেক্রেটারী তরুণ উকীল, এ বিষয়ে তাঁহার খুব উৎসাহ, সে বুঝাইয়া বলে, 'অক্ষর দু'বছর না শিখলেও চলবে, মাষ্টার মশাই,—দুটো বছর ব্যাকরণ কি নামতা মুখস্থ না করলে কিছু ক্ষতি হবে না। চারিদিকে ত চেয়ে দেখছেন উচ্চ শিক্ষা পেয়েও কী সব বাঁদর তৈরি হচ্ছে এক একটি। একটা ডিসিপ্লিন নেই, নাগরিকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, হাইজিনিক সেন্স্ নেই—কেউ সমাজের জন্য নিজের ব্যক্তিগত এতটুকু স্বার্থ ছাড়তে প্রস্তুত নয়। এই ত আমাদের অধিকাংশ দেশবাসী। এসব শিক্ষিত লোক নিয়ে কী হবে বলুন ত? এম্‌নিতেই ত আমাদের দুর্নাম আর লাঞ্ছনার শেষ নেই—এর পরে যে পৃথিবীর কোন জাতের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। মনটা তৈরি হোক্, প্রথম কতকগুলো মূল শিক্ষা পেয়ে যাক্—তারপর আপনাদের পুঁথিগত বিদ্যা না হয় শিখবে' খন্। এমনিতেই ত কেবল বইয়ের ওপর বই চাপাচ্ছেন তাদের মাথায়, চার বছরের ছেলে-মেয়ে থেকে আর ওটা শুরু করেন কেন? মস্তিষ্কটা একটু ভাল করে ডেভেলপ্ করবার সময় দিন না, পরে বরং আরও তাড়াতাড়ি শিখ্‌বে। আর যে সব লোক চাষ বাস বা হাতের কাজ করবে, তাদের অত হিষ্ট্রীর সন তারিখ কিংবা ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিয়ে কী হবে বলতে পারেন? তার চেয়ে সুস্থ হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে বেঁচে থাকবার শিক্ষা, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শিক্ষা ঢের, ঢের বেশী দরকারী।'

বলাবাহুল্য, এসব কোন কথাই বীরেন বাবু বুঝিতে পারেন না, বিশ্বাসও করেন না। চিরকাল যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, নিজে দীর্ঘকাল যেভাবে চলিয়াছেন—এখন তাহা হইতে সম্পূর্ণ নূতন বা ভিন্ন রকমের কিছু একটা শুনিয়া বিস্ময়বোধ হয় বৈকি! প্রস্তাবটার উপর একটা বিদ্বেষও জাগে মনে মনে।

তবুও বীরেনবাবু চিন্তিত ভাবে ইস্কুলে আসেন। দিন পালটাইয়াছে, এসব দিনে তিনি অচল—এটাই ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

ইস্কুলে পা দিতেই জীবনবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলেন, 'অশোক সেই কানেক্‌শন বানান ভুল লিখেছিল বলে আপনি কাল তার কান মলে দিয়ে-

ছিলেন—আজ তার বাবা এইমাত্র এসে যাচ্ছেতাই করে গেল ইস্কুল সুদ্ধ ছেলের সামনে।'

'তার মানে?' চোখে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে বীরেনবাবুর, 'এসব কি বেয়াদপি! ছেলের হয়ে বলতে আসতে তাঁর লজ্জা করে না? অসভ্য ছেলে—ভুল লিখবে আবার তর্ক করবে, বলে আজকাল সাহেবরা এই বানানই নাকি লিখছে। আপনি কি সাহেবদের চেয়েও ভাল ইংরেজী জানেন?…ওকে চাবকানো উচিত।'

জীবেনবাবু সবিনয়ে এবং সসম্ভ্রমে বলেন, 'কিন্তু ওর বাবাও যে সেই কথা বলে গেল মাষ্টার মশাই! বলে, নতুন নতুন বানান হচ্ছে, কত সংশোধন হয়ে গেল ইংরেজী ব্যাকরণের, কিছু জানবেন না—শুধু ঘরের কোণে বসে গুণ্ডামী! ছেলেটার কান লাল হয়ে রয়েছে আজও, যদি কালা হয়ে যেত? ঐ বুড়ো কি তার ক্ষতি পূরণ করতে পারত? আরও সব যা যা বলে গেল মাষ্টার মশাই, মুখে আনবার নয়। ছেলেদের সামনে আপনাকে পাগল, মুখখু কত কি বললে!'

'হারামজাদা!' বোমার মত ফাটিয়া পড়েন বীরেনবাবু 'আমি এখনই যাবো সে হারামজাদার কাছে, দেখিয়ে দিক আমায় কোথায় ঐ বানান লেখা আছে।'

তিনি পাগলের মত ছড়ির উদ্দেশে হাত বাড়ান।

জীবনবাবু চাদর ও তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'সেই ত মুস্কিল, প্রমাণ সে হাতে করেই এনেছিল। এই যে একখানা স্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজ, আর এই একটা আমেরিকান বই—দাগ দিয়ে রেখে গেছে। আবার স্পর্ধা কত, বলে ছেলেদের ভুল শেখানোর জন্য তাঁরই কান মলে দেওয়া উচিত। তা ছাড়া সামান্য একটা ইংরেজী বানান, আজকাল যা অনবরতই পালটাচ্ছে, আমেরিকানরা যা একেবার যা-নয়-তাই করে দিলে, তার জন্য আমার ছেলের প্রধান ইন্দ্রিয় একটা নষ্ট করে দেবেন আপনারা?'

মাষ্টার মশাই কাগজ ও বইখানা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশ্য একটা কাগজ কী একটা বই সব নয়—প্রাচীন ইংরেজী বানান বজায় রাখিয়াছে আজও অধিকাংশ লোক, এসব যুক্তি দিয়া অভিভাবককে ঠাণ্ডা করা যায়। পুরাতন বানানের দৃষ্টান্তই বেশী—কিন্তু এসব কথা নয়, বীরেনবাবুর মনের মধ্যকার মূল প্রশ্নটাই মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ধারণা তাঁহার পদ্ধতি ক্রমশঃ অচল হইয়া পড়িতেছে—এটাই বড় কথা। অথচ এইসব নূতন চিন্তা, নূতন ধারণাকেও তাঁহার মন সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে না, তিনি আজও বিশ্বাস করেন যে ছেলেমেয়েদের এ প্রশ্রয় দিলে তাহাদের সর্বনাশই করা হইবে।

একটা সূক্ষ্ম অভিমানও মাথা চাড়া দেয় বৈকি, একটা অত্যন্ত বেদনাবোধ। তাঁহার এতদিনের ঐকান্তিকতার এই পুরস্কার?

সেদিন আর পড়ানো হইল না। বীরেনবাবু সকলের অলক্ষ্যে বাড়ী চলিয়া আসিলেন। ছেলেরা না তাঁহাকে দেখিতে পায়। এই দীর্ঘ দিন তাঁহার আসন ছিল ছাত্রদের সম্ভ্রম ও ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ অপমানের পর—এই শ্রেণীর ধৃষ্টতা প্রকাশের সমুচিত জবাব দিতে না পারিলে আর তাহাদের কাছে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া?

•

পরের দিন সেক্রেটারীর কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া আবার স্মিত প্রসন্ন মুখে দাঁড়াইলেন বীরেনবাবু!

সেক্রেটারী একেবারে হৈ চৈ করিয়া উঠিল, 'একী করছেন মাষ্টার মশাই? কালকের সেই ব্যাপার ত? আমি আর প্রেসিডেণ্ট কালই রাত্রে বসে স্থির করেছি যে এর সিরিয়াস স্টেপ নেব। সে একটা বাঁদর দু' পাতা বই পড়ে ভাবছে নিজেকে মস্ত পণ্ডিত। বিদ্যা দেখাতে এসেছে আপনার কাছে। তাকে দিয়ে প্রকাশ্যে মাপ চাইয়ে তবে ছাড়ব।'

বীরেনবাবু হাসি হাসি মুখেই বলিলেন, 'না বাবা তার জন্যেও নয়, আমিও

ত বুড়ো হচ্ছি এই বেয়াল্লিশ বছর মাষ্টারী হল—সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এর পর ভীমরতি হয়েছে বলে তোরাই তাড়িয়ে দিবি ত, তার চেয়ে মানে-মানে সরে পড়া ভাল নয় কি?'

সেক্রেটারীদের এইটাই বহু দিনকার মনোভাব—সুতরাং আর দুই একবার চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিল—সেটা বীরেনবাবুও লক্ষ্য করিলেন। অহমিকায় ঘা পড়িলে খুব উদাসীন লোকও সজাগ সতর্ক হইয়া ওঠে বোধ হয়। তিনি কহিলেন, 'তাহলে উঠি বাবা? আর এই কটা দিন আমাকে ছুটিই দে, কখনও ত ছুটি নিইনি।'

মাষ্টার মশায়ের সংসারের কথাটা সেক্রেটারীর অজানা ছিল না, কতকটা সেই বিবেচনাতেই এতকাল তাহারা মাষ্টার মশাই-এর কাছে অবসর গ্রহণের কথা কখনও পাড়িতে পারে নাই। এখনও সে কথাটা মনে করিয়াই সেক্রেটারী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু বীরেনবাবু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া অগত্যা বলিয়া ফেলিতেই হইল, 'কিন্তু আপনার সংসার চলবে কিসে মাষ্টার মশাই?'

'দেখা যাক!' অত্যন্ত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে উত্তর দেন বীরেনবাবু, 'আঢ্যিদের শুনেছি একটা খাতা লেখবার লোকের দরকার—দেখি আমাকে নেয় কিনা। নইলে, ঐ রকম যা হোক কিছু একটা জুটিয়ে নিতে হবে বৈকি।'

তাহার পর প্রণত সেক্রেটারীর মাথায় হাত রাখিয়া নির্মল প্রসন্ন চিত্তে আশীর্বাদ করিলেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, সুখে থাকো, সুস্থ থাকো। জয়ী হও, ভগবান তোমার ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখুন। চল্লুম বাবা।'

আর কিছুতেই কাহারও অনুরোধেই সে পদত্যাগপত্র বীরেনবাবু প্রত্যাহার করিতে রাজী হইলেন না।

# সভাপতি

অনুপম এর আগেও দু-একটা সাহিত্য সভায় গিয়েছে বৈকি! কিন্তু সে সাধারণ বক্তা হিসেবে, একবার বুঝি প্রধান অতিথিরূপেও কোথায় গিয়েছিল। সভাপতি এই প্রথম। কেবলমাত্র তাকে নিয়ে যাবার জন্যই সভার উদ্যোক্তারা বিস্তর তেল পুড়িয়ে গাড়ী নিয়ে আসবেন এই টালিগঞ্জ পর্যন্ত, তার পর সেখান থেকে সুদূর সভাস্থলে নিয়ে যাবেন এবং আবার সভা ভাঙলে বাড়ী পৌঁছে দেবেন। এতখানি অর্থ ব্যয়, এত ঐকান্তিকতা শুধু তারই জন্য। সেদিনকার সেই উৎসব সমারোহের সে-ই একমাত্র নায়ক।

এর মধ্যে এত আনন্দিত হবার কি আছে, এ ত তার সাহিত্য সাধনার প্রাপ্য পুরস্কার—এমনি নানা কথায় মনকে বোঝালেও, এই ব্যাপারটিতে আনন্দিত না হয়ে পারে না অনুপম। বিশেষত সকালে যাবার পথে রাস্তার মোড়ের কাগজওয়ালার কাছ থেকে তিন-চারখানা দৈনিক চেয়ে নিয়ে উল্টে দেখেছে সে, সভা-সমিতির বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এই বিশেষ সভার খবরটা ছাপা আছে। তার নামও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে সভাপতিরূপে। না, ছাপার ভুল কোথাও নেই, ছাপ ওঠেনি এমনও হয়নি। বেশ পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে তার নামটা।

অবশ্য ভাল ক'রে ভেবে দেখলে, সত্যিই এতে আনন্দিত হবার এমন কিছু কারণ নেই। আর্থিক লাভ নেই অনুপমের এক পয়সাও। বরং খানিকটা সময় নষ্ট, হয়রানি—মেহনৎ, এমন কি অর্থব্যয়ও কিছু আছে। ফরসা কাপড় জামা চাই ত! গরজ তাদেরই, তারা সভা ডেকেছে, সভাপতি চাই তাদের নইলে সমস্ত আয়োজন পণ্ড। কৃতজ্ঞতা যদি এক্ষেত্রে কারুর প্রাপ্য হয় ত সে তারই।

তবু আনন্দ একটু হয় বৈকি!

এর মধ্যে একটা সম্মানের প্রশ্ন আছে যে, একটা স্বীকৃতির প্রশ্ন আছে। সে
য় ভাল সাহিত্যিক, পাঠক মহলে তার যে কিছু খ্যাতি মিলেছে—এই সভা-
পতিরূপে আহ্বান করার মধ্যে সেই কথাটাই কি মেনে নেওয়া হচ্ছে না? এত
লোক থাকতে তার কাছেই ওরা এসেছে, একমাত্র তাকেই ওদের প্রয়োজন।
অন্য অনেক সাহিত্যিক ছিল, তাদের কারুর কাছে যেতে পারত ওরা। তা না
গিয়ে তার কাছেই এসেছে। এতেও কি খুশী হবার, একটু গর্বিত বোধ করার
কারণ নেই?

অনুপমের সাহিত্য সাধনার পথটা খুব মসৃণ নয় যে, তা বলাই বাহুল্য।
'জন সাহিত্যিকের ভাগ্যেই বা তা হয়। সে কাজ করত কি একটা মার্চেণ্ট
অফিসে—টাকা সত্তর মাইনে পেত। তাতে যুদ্ধের আগে একরকম চলে যেত।
তারপর বিবাহ করলে। তখন আর ঐ স্বল্প আয়ে সংসার চলে না। লেখার
অভ্যাস ছিল ছেলেবেলা থেকেই, এখন তাই নতুন ক'রে ঝালিয়ে লিখতে বসল
—গল্প আর কবিতা, গল্পই বেশি। পাঠালে বিভিন্ন কাগজে, কেউ ফেরৎ দিলে
কেউ দিলে না। ছাপালে না কেউই।

এক্ষেত্রে হতাশ হবারই কথা কিন্তু দৈবক্রমে একদিন ওর এক বন্ধুর সঙ্গে
পথে দেখা হয়ে গেল। সে এক বিখ্যাত দৈনিকে চাকরী করে। তাদের
রবিবারের সংখ্যা সম্পাদনা করে সে। এই যোগাযোগে অনুপম একটা গল্প
পাঠালে—সে গল্প ছাপাও হল। কিছুদিন পরে আর একটা, তারপর আরও।

এইবার ভরসা করে সে অন্য কাগজেও লেখা পাঠাতে লাগল—দু একটা
ছাপাও হ'ল। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, এরই মধ্যে এক-আধ জায়গায় কিছু
পারিশ্রমিকও মিলল। হোক্ সামান্য তবু নিজের রচনার মূল্য—ওর সেদিন
মনে হয়েছিল যেন বিনা পরিশ্রমেই পেলে সে টাকাটা।

টাকাটার প্রয়োজনও ছিল সেদিন খুব বেশি। অফিসে যা মাইনে পেত
তার সঙ্গে মাগ্গী ভাতা যোগ হয়েও সংসার চলে না। অথচ খাটতে হয়
ভূতের মতো। সেখান থেকে ফিরে রাত্রে আর এতটুকু পরিশ্রম করার শক্তি

থাকে না। থাকলেও বাজার, রেশন, গয়লা—এ-সব করে সময় পাওয়া যায় না।

এই সময় হঠাৎ ও একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেল্‌লে। চাকরীটি দিলে ছেড়ে। স্ত্রী সুপ্রিয়াকে বললে, 'ভাবছ কেন, সাহিত্য করে খাব। তাতে যদি এক বেলা খাই ত সেও ঢের ভাল।'

আসল কথা এই সময় সে অধিকাংশ দিনই অফিসে মন দিয়ে কাজ করতে পারছিল না। নিয়মিত হাজরেও পড়ত না। তার মত কনিষ্ঠ কেরাণীর এত গাফিলতি সইবে কে? অফিস তাই ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল।

কিন্তু চাকরীটা ছেড়ে দিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারলে। যে সব কাগজ লেখার মূল্য দেয় তাদের সংখ্যা খুব পরিমিত। তাদের ছাপবার সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে একই লোকের লেখা ত ছাপা সম্ভব নয়। দৈনিকে বড জোর মাসে একবার বেরোতে পারে, মাসিক পত্রিকায় তিন মাস অন্তর। সেভাবে যদি নিয়মিত লেখা যায় তা হলেও মাসিক একশ' টাকা আয় তোলা সম্ভব নয়। তবু তখন যুদ্ধের বাজার—অবস্থা সকলেরই স্বচ্ছল।

অগত্যা অনুপম প্রকাশকদের দ্বারস্থ হ'ল। গল্প সে ভালই লেখে বটে তার নামও তাঁরা শুনেছেন কিন্তু ছোট গল্পের বইয়ের কিছুমাত্র চাহিদা নেই। লাইব্রেরী থেকে যাঁরা বই কিনতে আসেন তাঁরা আগেই বলে দেন, 'দেখুন বই যা দেবেন তাতে টুকরো গল্প না থাকে। টানা গল্প চাই।' অর্থাৎ সকলেই উপন্যাস চান।

'কিন্তু কাগজে যে এত গল্প ছাপা হয় সেগুলোর গতি কি হবে?' প্রায় হতাশ হয়ে প্রশ্ন করে অনুপম।

'ঐ নগদ বিদায় যা পেলেন।' একজন প্রকাশক বুঝিয়ে দেন ওকে।

একখানা ছোট গল্পের বই তবু এক প্রকাশক দয়া করে ছাপালেন—সর্ত হল তার জন্য অনুপম কোন টাকা চাইবে না। তিনি বললেন, 'এতে যে আপনার নাম ছড়াবে, ধরে নিন ঐটেই লাভ।'

তথাস্তু

আর একজন প্রকাশক দিলেন পঞ্চাশটি টাকা। উপদেশ দিলেন, 'উপন্যাস লিখুন, বেশি করে টাকা দিতে পারব।'

তা ত পারবেন কিন্তু তার অবসর মেলে কৈ ?

তার আগে যে হাঁড়ী চড়ার বন্দোবস্ত করতে হয়। খবর নিয়ে জানলে অনুপম যে ছেলেদের য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই, ডিটেকটিভ উপন্যাস এ-সবের খুব চাহিদা আছে। অগত্যা তাই লিখতে বসলো। প্রথম প্রথম ভেবেই পেত না কি লিখবে, কিন্তু এখন চালাক হয়ে গেছে। দেখেছে যে এ ধরনের বই নিজস্ব রচনা খুব কম লোকেরই আছে। সবাই সাগরপারের বই পড়ে অজীর্ণ উদ্‌গার করেন। অনুপমও সেই পথ ধরল। কিন্তু তাতেই বা কটা টাকা পাওয়া যায় ? পরিশ্রম করতে হয় ঢের বেশি। বই পড়া, তাকে আত্মসাৎ করা, তারপর লেখা। কত বই হয়ত কাজে আসে না তবু সেগুলো পড়ে দেখ্‌তে হয়।

এতদিন পরে সে বুঝতে পেরেছে যে, কেরাণীগিরির চাইতে ঢের বেশি পরিশ্রম এতে। অথচ এতে যশও নেই। ছোট গল্প সে সত্যিই ভাল লিখতে পারত, হয়ত এখনও পারে, কিন্তু পড়বে কে ? যদি বা পড়ে—কিনবে না। প্রতি-দিনকার উদরান্নের সংস্থান করতে করতে ভাল উপন্যাস ভাবাও যায় না, লেখা ত যায়ই না। ছোট গল্পের কিছু চাহিদা হয় পূজার সময়। টাকাও কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সে টাকা কোন কাজেই দেয় না। পূজার নানা খরচ রাঘব বোয়ালের মত সব আয়টাকেই গিলে নেয়।

কিন্তু আজ আর ফেরবার উপায় নেই। নতুন করে কেরাণীগিরি শুরু করা যায় না। পাবেও না হয় ত। এই অজ্ঞাত অখ্যাত জীবনই তাকে যাপন করতে হবে—সাহিত্যের নামে কলম পিষে।

এমনি হতাশা যখন প্রায় তাকে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করে তুলেছে সেই সময় এল এই সভার আহ্বান !

তবে ত একেবারে ব্যর্থ হয়নি। তবে ত তাকেও চেনে দু'চারজন, স্বীকার করেছে তাকে সাহিত্যিক বলে!

সেই জন্যই ওর বিশেষ একটি আনন্দ, সেই জন্যই ওর এই গর্ব।

গাড়ী এল ঠিক পাঁচটার সময়।

অনুপম প্রস্তুত হয়েই ছিল। সারা সকাল ধরে সুপ্রিয়া জামা-কাপড় সাবান কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রী করে রেখেছে। ইস্ত্রী ত ছাই—ভাঁজ করে বিছানার নীচে রেখে দেওয়া, দেহের চাপে যা ইস্ত্রী হয়। তবু তাতেই মন্দ দেখাচ্ছে না। অনুপম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল। গাড়ীটা ভাল নয়, বহুদিনের পুরানো গাড়ী—ঝড়-ঝড়্ করতে করতে চলল, দু তিনবার খারাপও হ'ল। তা হোক্—অনুপম মনকে বোঝালে, ভাল গাড়ী পরে দেবেই বা কেন? আর এতে ত তেল খরচা কম হচ্ছে না। এবং সে খরচা হচ্ছে শুধু তাকে নিয়ে যাবার জন্যই।

সভাস্থলে পৌছে কিন্তু তার মনটা দমে গেল।

দর্শক বা শ্রোতা যাই বলুন, তার সংখ্যা খুবই কম। শুধু শ' খানেক ছোট ছেলে সামনের ফরাসে বসে মহা হৈ চৈ করছে। তরুণ বা প্রবীণের সংখ্যা ত্রিশের বেশি হবে না। অবশ্য এ ছাড়া উদ্যোক্তারা আছেন জন-[illegible]া-কুড়ি।

ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করে একজন উদ্যোক্তা বললেন চুপি চুপি, 'লোক হবার কথা ঢের বেশি, মুস্কিল হয়েছে কি জানেন, আজ একটা ভাল খেলা আছে কিনা এখানে, সবাই সেইখানে গেছে। এটা আমরা জানতুম না।'

যথারীতি সভা আরম্ভ হল। কে যেন একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিল ওর গলায়। সভাপতির নাম যিনি প্রস্তাব করতে উঠলেন তিনি ওর নামটা ভুল বললেন এবং পরিচয় দিতে দিতে বললেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। নাটক অনুপম জীবনে লেখেনি। কিন্তু তবু কোন প্রতিবাদ করতে ওর মন সরল না। কী হবে মিছিমিছি মেজাজ খারাপ করে।

তারপর শুরু হল সভার কাজ। আসলে এদের নিজেদের আবৃত্তি ও গান শোনানোর উপলক্ষ এটা। একটি প্রবন্ধ পঠিত হল—প্রলাপে পূর্ণ। তা ছাড়া অসংখ্য আবৃত্তি। যারা করছে তাদের কারুর উচ্চারণ শুদ্ধ নয়, কবিতার লাইন মুখস্থ নেই—মানে ত বোঝেই না। আবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে চলল গান। কী তার বাণী আর কী যে তার সুর কিছুই বোঝার উপায় নেই। দু একটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইবারও চেষ্টা করলে, কিন্তু অনুপম দেখলে সেগুলো রবীন্দ্র সঙ্গীত বলে চিনতে কষ্ট হয়। আকৃতি-প্রকৃতি অর্থাৎ বাণী ও সুরে কিছুই মেলে না।

এই কষ্টকর ব্যাপার চলল সাড়ে নটা পর্যন্ত। ছেলেপুলেরা সমানে হৈ-চৈ করে যাচ্ছে, শুধু যখন কোন একটা পর্ব শেষ হচ্ছে তখন ঘন ঘন করতালি এবং শীষ দিয়ে নিজেদের উৎসাহ প্রকাশ করছে তারা।

এর পর যখন সভাপতির অভিভাষণ দিতে উঠল অনুপম তখন বয়স্করা সবাই চলে গেছেন। আছে ঐ ছেলের দল। অনেক ভাল ভাল কথা সে ভেবে এসেছিল কিন্তু এখন এদের কাছে সে সব কথা বলতে ওর লজ্জা বোধ হল। অথচ কী বলবে, কী বলা উচিত তাও ভেবে পেলে না। কোন মতে সেই সব বড় বড় কথা—সাহিত্যের রসবস্তু ও মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে দু চারটে কথা খাপ খাপছাড়া ভাবে বলে বসে পড়ল! এইটুকু সভা, কটাই বা লোক কি মাইক ও লাউড স্পীকার ভাড়া করা হয়েছিল ঠিকই। মাইকের সামনে উঠে লজ্জায় অনুপমের মাথা কাটা যাচ্ছিল।

সভা ভেঙ্গে যখন অনুপম উঠল তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তিতে সে অবসন্ন। উদ্যোক্তারা ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে অবশ্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। ঠাণ্ডা সিঙ্গাড়া দুর্গন্ধ পান্তুয়া। তার সঙ্গে কড়া তেতো চা। তবু তাই প্রাণপণে গিলল অনুপম। নইলে সে আর দাঁড়াতে পারছে না তখন।

এইবার ওঁরা আসল কথাটা পাড়লেন। যে গাড়ীখানা পাওয়া গিয়েছিল সেটা একেবারে বিগড়ে গিয়েছে, অন্য গাড়ীও যোগাড় হ'ল না। অনুপম যদি

কিছু মনে না করে ত বাসেই—অবশ্য বাস এখন সব খালিই যায়, কোন অসুবিধা হবে না।

তবু একবার ক্ষীণকণ্ঠে অনুপম বললে, 'ট্যাক্সী, এখানে ট্যাক্সী পাওয়া যায় না?'

'দেখুন—' একজন খুব সঙ্কুচিতভাবে বললেন, 'ট্যাক্সি বড্ড বেশি নেবে এখান থেকে, আমাদের ফান্ড্ পারমিট করছে না। শুধু তেলের খরচটা হলে দিতে পারতুম। এক মাইক ভাড়া করতেই বিস্তর বেরিয়ে গেল কিনা!'

অগত্যা অনুপমকে উঠ্‌তে হ'ল। দু তিনজন এসে বাস অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। কে একজন আনাচারেক ভাড়া দিতে এসেছিল, অনুপমের আত্মসম্মানে বাধল। সে নিলে না।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। যেখানে বাস বদল করার কথা, সেখানে বাস আর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলে কিন্তু পথও বহু দূরে, ঘণ্টাখানেক চলবার পর একটা চলতি রিক্সার সঙ্গে দর করে উঠে বসলে। একটি টাকাই ছিল পকেটে, তার সবটারই মায়া ত্যাগ করতে হ'ল, নইলে এত রাত্রে, এতটা পথ সে যেতে প্রস্তুত নয়

সুপ্রিয়া তখনও জেগে বসেছিল। দোর খুলে দিয়ে বললে, 'বাবা ধন্যি তোমার সভা করতে যাওয়া। এই এত রাত অবধি কিসের সভা? কৈ গাড়ী এল না?'

সংক্ষেপে অনুপম বললে, 'না পথে খারাপ হয়ে গেছে—'

সুপ্রিয়া ভাত বেড়ে দিলে, ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত। তাও পরিমাণে অত্যন্ত অল্প। একটু অপ্রস্তুতভাবেই বললে, 'ভাত বোধ হয় তোমার কম হবে। কী করব একদানা চাল নেই ঘরে। এমন আটাও নেই যে দুখানা রুটি গড়ি। ছেলে-মেয়ে দুটো কাল সকালে যে কী খাবে তা জানি না—বাসি রুটি থাকলে তবু খায়। কাল সকালে যতক্ষণে রেশন আসবে ততক্ষণে হাঁড়ি চড়বে।'

একটা হিমের মত কী যেন মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে যায় অনুপমের। শেষ টাকাটি যা তার হাতে ছিল, এই মাত্র রিক্সাওলাকে দিয়ে এসেছে সে।

পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় কথাটা, 'তোমার খাওয়া হয়েছে ?'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুপ্রিয়া বলে, 'হ্যা। নইলে রাত বারোটা পর্যন্ত উপোষ করে বসে থাকব নাকি ? ক্ষিদে পায় না ?'

মিছে কথা বলেই এত কথা বললে সুপ্রিয়া—তা অনুপম জানে। যেখানে তার ভাতই পরিমাণে কম, সেখানে সুপ্রিয়া আগে খেয়ে নেয়নি এটা ঠিক। কিন্তু তারও তখন আর খুঁচিয়ে সত্যি কথা জানবার অবস্থা নয়, সে সব ভাতগুলোই খেয়ে উঠ্‌ল।

পয়সা কাল সকালেই চাই। যে প্রকাশক দু' পাঁচ টাকা দিতে পারেন বাড়ী গেলে, তিনি কিছু কপি হাতে না পেলে দেবেন না। অগত্যা এখনই কপি লিখতে বসতে হবে। যত রাতই হোক্, আর যত ক্লান্তই হোক্ সে।

সঙ্কীর্ণ ঘর, তার সবটাই প্রায় তক্তপোশে জোড়া। তাতে মলিন বিছানা এবং শতছিন্ন মশারী, সেখানে ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে। তার পাশে শোওয়া যায় কোন মতে কিন্তু বসে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।

অগত্যা এই মাত্র যেখানে সে বসে খেলে, ফালি-মত সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু, সেইখানেই হ্যারিকেন নিয়ে লিখতে বসল অনুপম। এখনও সেখানটা ভিজে, উচ্ছিষ্টের গন্ধ ছাড়ছে।

'আবার এত রাত্রে লিখতে বসলে ?' সুপ্রিয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'উপায় নেই। তুমি শুয়ে পড়ো। আমাকে অন্তত সাত আটখানা কাগজ যেমন করে হোক্ ভরাতেই হবে।'

# পরিণাম

সিসি বোস বরাবরই, ঐ যাকে বলে, একটু মহৎ-পূজারিণী গোছের ছিল, অর্থাৎ কিনা "হিরো ওআরশিপার"—মেয়েলি কথায় বলা যেতে পারে শক্তের ভক্ত। তা না হ'লে, ধরুন ছেলেবেলায় দেখতে শুনতেও মন্দ ছিল না, এতদিনে কবে ভাল ঘরে বিয়ে-থা হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করতে পারত। ঐ ঝোঁকটার জন্যেই না এত বিপত্তি!

আর, আমাদের মনে হয় এর জন্যে ওর ঠাকুর্দাই অনেকখানি দায়ী। তিনি যদি ওর নাম মাতঙ্গিনী জগদম্বা না হোক— কমলা বিমলা, এমন কি রেবা ইরা রাখতেন তা'হলেও এ ঝোঁকটা ওর হ'ত কিনা সন্দেহ। তিনি আদর করে "এটি আমার মেম-মেম নাৎনী—আমার বিবি-বিবি নাৎনী" বলে নাম রাখলেন সিসিলিয়া। একেবারে বিলিতি নাম। একটু বড় হতেই ওর মাথায় গেল যে যে-হেতু পাড়ার বুঁচি-পুঁটি-খেঁদি-ক্ষেন্তির সঙ্গে ওর নামে কোথাও মিল নেই—না আটপৌরে না পোষাকে—সে-হেতু মানুষটাও ও একটু অসাধারণ। অতএব চালচলনটাও একটু ভিন্ন রকমের হওয়া চাই ওদের থেকে।

তার ওপর ওর ঠাকুর্দা অনেক বেশী বয়স অবধি ওর চুল রেখেছিলেন 'বব' করে—ভাল বিলিতি অর্গ্যাণ্ডির ফ্রক পরিয়েছিলেন, ফ্রক্ পরে বেড়াবার শোভন বয়সটা পার হয়ে যাবার পরও—তাতে করে ওর মেজাজটা গেল আরও বিগড়ে—

ওর প্রথম প্রণয়ের ইতিহাস শুরু হয়ে ছিল ছ'বছর বয়সে। পাড়াতে কেলো ছিল ছেলেদের সর্দার। পরের বাগানের পাঁচিল টপকে ফুল চুরি করতে, পেয়ারার সরু ডালে এগিয়ে গিয়ে পেয়ারা পাড়তে এবং ইস্কুল পালাতে তার জুড়ি ছিল না এপাড়ায়। বলা বাহুল্য সিসি তার ভক্ত হয়ে উঠল। বিশেষ করে যে দিন কল্‌কে ফুলের একটা অপল্‌কা ডাল ভেঙ্গে পড়তে পড়তে ও হঠাৎ

পাশের নিমডালটা ধরে নিজেকে সামলে নিলে, সেদিন সিসি ওর মার ঘরের মিট্‌সেফ থেকে সন্দেশ চুরি করে না এনে দিয়ে পারলনা। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে মার খেলে ( চুরি করার জন্য শুধু নয় চুরি করে নিজে খাওয়ার জন্য )—তবু কী জন্য অপরাধ এবং কার জন্য কিছুতেই বললে না।

ভয় নেই—কেলোর বয়সও তখন সাত-আট। তবু হয়ত অনায়াসে সে দেবদাসের ভূমিকায় পৌঁছাতে পারত যদি না শিগগিরই কেলোর বাবা বদ্‌লি হয়ে কাঠিহারে চলে যেতেন। অতএব ও পর্বের ঐ-খানেই পরিসমাপ্তি। সিসির বিরহ ছিল তিন চার দিন। সে ভাল করে খায়নি, পড়েনি, মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়িয়েছিল। ওর মা মেয়ের এই ভাবান্তরের কারণ খুঁজে না পেয়ে স্বামীকে ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দেবেন ভাবছেন—এমন সময় সিসি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

এর পর বছর-দুইয়ের খুব বিস্তৃত ইতিহাস জানা নেই। তবে পূজারিণীরা শ্রদ্ধাস্পদ ছাড়া বাঁচতে পারে না—সুতরাং পূজার পাত্র কেউ কেউ ছিল নিশ্চয়। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন পুরুষের মধ্যেও এই ধরনের চরিত্রের অভাব নেই। লতার মত এরা সর্ব্বদা শক্ত গাছের ডাল খোঁজে, তাদের আশ্রয় করে নিশ্চিন্ত হয়। তবে লতার সঙ্গে তফাৎ এই যে লতা তার সমস্ত ভার ছেড়ে দেয় মহীরুহকে কিন্তু মানুষ-লতাকে কিছুটা মহারুহর ভারও বইতে হয়—কিছু ফায়-ফরমাশ খাটা, কিছু বকুনি বা মার খাওয়া ( বয়স ভেদে ) কিছু কিছু বা ঘরে-বাইরে লাঞ্ছিত হওয়া—এসব সহ্য করতে হয়, এবং আনন্দেই সহ্য করে ওরা। সেইটেই তাদের গর্ব্ব ও সান্ত্বনা।

সে যাই হোক্—ইতিহাসটা যখন আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলে অশোক। পাড়ার বিখ্যাত তরুদির ছেলে। এই তরুদির কাজ ছিল বেলা দশটায় স্বামী আপিসে গেলে ও ছেলে মেয়েরা ইস্কুল গেলে একবার বেরিয়ে পড়তেন 'রোঁদে'—পাড়ার সমস্ত কেচ্ছা গৃহ হ'তে গৃহান্তরে সংগ্রহ ও বিতরণ করতে করতে একেবারে সিংহীদের পুকুরে স্নান করে বাড়ী ফিরতেন বেলা

তিনটেয়, তখন বিকেলের উনুনে আঁচ দিয়ে নিজে সকালের ঠাণ্ডা কড় কড়ে ভাত খেতে বসতেন। এর ভেতর ছেলে মেয়েদের দিকে তাকানোর সময় কৈ ? স্বামীও অফিস থেকে বেরিয়ে লোহার বাজার ঘুরে বাড়ী আসতেন রাত নটায় সুতরাং অশোকের পাথরে পাঁচ কীল, সে ইস্কুল যাওয়ার থেকে না-যাওয়া দিনের সংখ্যাটা বাড়িয়ে ফেললে এবং ডাংগুলি থেকে শুরু করে ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি সমস্ত রকম খেলাতেই অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করে 'হিরো' হয়ে উঠল। আরও বহু গুণ তার ছিল। পাড়ার সমস্ত দোকানে ধার করে খাবার খেত এবং বন্ধু বা স্তাবকদের খাওয়াত—বলত "ধরা পড়লে মার খাওয়াটা একদিনের, দেড়মাস দুমাস মিষ্টি খাওয়ার পর একদিন খাওয়া যায়। জানি দেনাত বাবাকে শুধতেই হবে।" এছাড়া ইস্কুলের মাইনে মেরে দেওয়া এবং মার বাক্স ভাঙ্গাত আছেই। সবচেয়ে—এগারো বছরের ছেলে যেদিন প্রকাশ্যে মাঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেলে, সেদিন থেকে মনে মনে পূজা না ক'রে থাকতে পারলে না সিসি।

কিন্তু ওর বরাতটাই এমনি। খুব বাড়াবাড়ি হ'তে অশোকের বাবার টনক্ নড়ল, তিনি ওকে 'র'াচি' না কোথাকার কোন্ ইস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। এবার বিচ্ছেদটা সামলাতে একটু বেশি সময় লাগল—দিন দশেক প্রায়।

আপনারা বলবেন এসব ত ছেলেমানুষী। কাজের কথাটা পাড়ো ত বাপু।

আমিও মেনে নিচ্ছি এসব ছেলেমানুষী। ছেলেমানুষী যেটা নয় সেটা ওর শুরু হয়েছিল বছর ষোল বয়সের সময়ে। তখন ও ক্লাস নাইনে পড়ছে। মাঠে মাঠে ঘোরা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু ইস্কুল যাওয়া বা বন্ধুর বাড়ী যাওয়ার ত কোন বাধা নেই। তাছাড়া মাঠের দিকে চেয়ে দোতলার বারান্দা কি তিন-তলার ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। অর্থাৎ মাঠের বার্তা এসে পৌছয় অন্তঃপুরেও। কাজেই ওদের পাশের বাড়ীর নতুন ভাড়াটে দত্ত গিন্নীর সঙ্গে যখন মায়ের খুব

মাথামাথি শুরু হ'ল এবং সেই সুযোগে দত্তগিন্নীর মেজ ছেলে নন্তুর আসা যাওয়ার বাধা রইল না তখন সিসি অনায়াসে এই ছফুট লম্বা ছেলেটিকেই মাঠের অধুনা সমস্ত মারামারির নায়ক বলে চিনতে পারলে। নন্তুরও বোধ হয় এই একই বয়স। তবু ঈশ্বর তাকে এমন অপরূপ স্বাস্থ্য ও শক্তি দিয়েছেন যে তাকে বয়সে অনেক বড় ভেবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে আট্‌কাল না। ইতিমধ্যেই গুণ্ডা বলে ওর নাম রটে গিয়েছিল পাড়ায়—যদিচ বিড়ি সিগারেট নন্তু আজও খায়নি এবং ইস্কুলেও খুব গবেট ছাত্র নয় সে।

"যাদৃশি ভাবনা যস্য—বুদ্ধির্ভবতি তাদৃশি" এটুকু রূপান্তর অনায়াসে করা যেতে পারে—বিশেষ মেয়েদের বেলায়। সিসি বললে, "তুমি ত শুনেছি পাটিগণিতে খুব পাকা। আমাকে একটু দেখিয়ে দেবে নন্তুদা? ঐ ঘোড়ার ডিম ঐকিক্ নিয়ম আর সুদকষা ও কিছুতেই মাথায় ঢোকে না।"

নন্তুর মা হেসে বললেন, "বেশ ত তোরা একসঙ্গে বসে সন্ধ্যেবেলা ত পড়তে পারিস।" বলে গলা নামিয়ে সিসির মাকে চুপি চুপি বললেন, "দেখতেই ঐ রকম তেধ্যাড়াঙ্গা লম্বা, নইলে বয়স ত কিছুই না।"

বোস গিন্নি বিগলিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—সে আমরা দেখে বুঝতে পারি না! ও সব কথা আমার মাথাতেও যায় নি। তুমি যেমন ক্ষ্যাপা।'

হয়ে গেল বন্দোবস্ত পাকা। পড়ার ফলাফল যাই হোক্—পড়াটা জমল খুব। অবশ্য সেজন্য সিসিকে মূল্যও কম দিতে হয় নি। চড় চাপড় গাঁট্টা—এটা ছিল নন্তুর আদরের মধ্যে। বল খেলে পায়ে ব্যথা ক'রে এলে পা টিপে হ'ত। যথেষ্ট জোরে না দিতে পারলে লাঞ্ছনার শেষ থাকত না। ব্যায়াম করে এলে পেশী শক্ত হয়ে যায় তার জন্য মাসাজ করতে হয় কি ক'রে শিখিয়ে দিয়েছিল নন্তু কিন্তু ওর ঐ বিশাল কঠিন দেহে কি করে মাসাজ করবে সিসি ভেবে পেত না। ঘামে হাত পিছলে যেত বার বার—( অনেক সময়ে ইচ্ছে করেও—কারণ হুমড়ি খেয়ে পিঠে পড়া যেত, পিছন থেকে ওর দেহের বলিষ্ঠতা অনুভব করতে পারত ) সে জন্য রাগ করে নন্তু একদিন কামড়ে দিয়েছিল ওর

আঙুলে, কেটে রক্ত বার হয়ে গিয়েছিল। সেটা জানলায় চিপ্‌টে গেছে বলে চালাতে হয়েছিল।

বছর খানেক কাটবার পর দুই গিন্নিরই টনক নড়ল। তখন বোস গিন্নি দোষারোপ করেন দত্ত গিন্নিকে—দত্তগিন্নী করেন বোস গিন্নীকে সে যাই হোক্—নন্তুর এ বাড়ী আসা এবং সিসির ও বাড়ী যাওয়া বন্ধ হল। তার ফলে গোটা পড়ার সময়টা চিঠি লিখতেই কেটে যেত রোজ। সে চিঠি পৌঁছে দেবারও লোক পাওয়া যেত। পাড়ার অনেক মেয়েই নন্তুর এবং অনেক ছেলেই সিসির ফরমাস খাটবার জন্য আগ্রহান্বিত। ব্যাপারটা কতদূর গড়াত বলা যায় না—কারণ নন্তুর আরও বহু ভক্তিমতী সেবিকা জুটল এবং সে খবর পেয়ে সিসি রেগে চিঠি দেওয়া বন্ধ করলে। তাতে কারুরই পড়াশুনোটা অবশ্য এগোল না। দুজনেই সে বছর ফেল করলে।

সিসি ফেল ক'রে কিন্তু সত্যিই সামলে গেল। মন দিয়ে পড়ে পরের বছর আবার পাশ করলে ফার্ষ্ট ডিভিসনেই।

এই সময়ে অনেকগুলি বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। এর আগেও।

কিন্তু মেয়ে যখন পাশ করেনি তখন সিসির বাবার আঁচ ছিল যেমন তেমন খেতে পায় চাকরী বাকরী করে এমন একটি ছেলে। সে রকম দু একটি খোজ আসেনি যে তা নয় কিন্তু ওর মা বললেন, 'আমার সুন্দরী মেয়ের পাশে দাঁড়াবার মত পাত্তর চাই বাপু। হোঁদল-কুৎকুতে ধরে দিতে হবে এমন কি অরক্ষণা হয়েছে ?'

ফলে কোন সম্বন্ধই পাকে নি। মেয়ে যখন একটা পাশ করলে বাপেরও আঁচ গেল বেড়ে। বললে, 'গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই ছেলে, দেশে জমি জায়গা কি শহরে বাড়ীঘর থাকা চাই।'

দুটো পাশের পর স্থির হল এম-এ পাশ জামাই হবে, কিম্বা ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার। তিনটে পাশ অর্থাৎ বি. এস-সি পাশ করার পর মেয়ে বললে, 'সে

দিন আর নেই বাবা, যে তোমরা যা ধরে দেবে তাই পতি পরম গুরু বলে মেনে নেব আর সেবা করব। আমার পাত্র আমি নিজে খুঁজে নেব। সময় হলে নিজেই বলব—ও সব বাজে লজ্জা আমার নেই।'

তথাস্তু! ভয়ে বাপ মা চুপ করে গেলেন।

এম. এস-সি পড়বার সময় সিসি আবিষ্কার করলে যে ওদের এক প্রোফেসার এই পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেননি—যথেষ্ট ইন্‌টারেষ্টিং মেয়ের দেখা পাননি বলে। অত্যন্ত সচ্চরিত্র, কোন মেয়েই কোন দিন টলাতে পারে নি। সিসি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে এর ধ্যান ভাঙ্গাতেই হবে। নইলে সিসিলিয়া নামই মিথ্যা আমার।

বান্ধবীরা বললে, "ও কিরে, তোর কি প্রবৃত্তি! ও যে বুড়ো।"

'হোক্ বুড়ো। জ্ঞান তপস্বী ত। শিবও ত বুড়ো ছিলেন, তবু তার জন্য উমা অপর্ণা হয়ে তপস্যা করেছিলেন। অতবড় একটা অধ্যাপকের জীবনে যদি একটু সেবা, একটু মমতার ছোঁয়াচ দিতে পারি সেটা কি আমার কম লাভ হবে মনে করিস?'

তবে সিসির তপস্যা উমার মত কঠিন হ'ল না। লেক্‌চারের পর সব[illegible] যখন বেরিয়ে যায় সিসি এসে চেয়ারের কাছে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে দু-এ[illegible]টা। অধ্যাপক রায় যখন উৎসাহিত হয়ে ওকে সেই সব প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানের জটিল রহস্যগুলি (যা নাকি খুবই সহজ এবং স্থূল—সিসিও যা বহুক্ষণ পূর্বেই বুঝেছে) বোঝাতে থাকেন তখন গদ্‌গদ্ চিত্তে শোনে সিসি, বিস্ফারিত হয়ে থাকে ওর চোখ, দৃষ্টি হয়ে ওঠে একাগ্র—তাতে যেমন ফোটে শ্রদ্ধা, তেমনি বিস্ময়—আর ঠোঁট-দুটি একটু ফাঁক হয়ে ভেতর থেকে শুভ্র সুন্দর দাঁতের আভাস উঁকি মারে। অর্থাৎ হাঁ করে শুন্‌ছে এই ভাব ফুটিয়ে তোলে সমস্ত ভঙ্গীতে।

ফল হ'ল অচিরাৎ। অধ্যাপক লেকচারের সময় ওকে ডেকে সামনে বসান। পড়ান শুধু যেন ওকে লক্ষ্য করেই। তেমনি শ্রদ্ধা, তেমনি ঐকান্তি-

কতাই ফুটে ওঠে সিসির চোখে। তাতে আরও উৎসাহিত বোধ করেন রায়। একদিন পড়া শেষের প্রশ্নোত্তর-বাসরে অধ্যাপক ঝোঁকের মাথায় ওর চিবুক ধরে নেড়ে দিলেন, পরের দিন ওর হাতটা ধরে মুঠো করে রইলেন। তার পরের দিন ঘরে ডেকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে এখন থেকেই কিছু কিছু রিসার্চ করো। তোমার মত রিসার্চ য়্যাসিষ্টাণ্ট পেলে আমি এই বয়সেও একটা কিছু দেওয়ার মত দিয়ে যেতে পারি বিজ্ঞানের জগতে। এমনি শ্রদ্ধা—এমনি অনুসন্ধিৎসা না থাকলে হয়? মারী কুরীকে যদি না পেতেন তাহলে পিয়েরে কুরী কিছু করতে পারতেন, না মারীরই কিছু হ'ত তাকে না পেলে!

সিসি সলজ্জ বিনয়ে মাথা হেঁট করে বললে, 'আমি কি আপনার সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে। তুমিই পারবে। কাল থেকেই শুরু করে দাও।'

কুরী দম্পতির উপমাটা খুবই ভাল হয়েছিল। হয়ত এ প্রণয়-পর্বের পরিণতি তেমনিই একটা কিছু হ'ত—যদি না অত সহজে জয় করে সিসির আগ্রহটা কিছু স্তিমিত হয়ে আসত। ও সত্যি-সত্যিই মনে মনে যখন ভাবতে শুরু করেছে বৃদ্ধের সঙ্গে ঘর করতে গেলে কি কি অসুবিধায় পড়তে হবে, তখন হঠাৎ একদিন ওদের কলেজে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এক সাহিত্যিক সভাপতির সম্মান দেখে ওর মাথা গেল গুলিয়ে। তিনি এলেন যেন দিগ্বিজয়ীর মত। সবাই এগিয়ে গিয়ে গাড়ী থেকে নামিয়ে আনলে তাঁকে, গলায় ফুলের মালা পড়'ল, সভাপতি বরণ করতে গিয়ে ওদের এক নামজাদা অধ্যাপক কত কি স্তুতি করলেন—তাতে সবিনয়ে নুয়ে পড়লেন না সভাপতি, বরং প্রসন্নস্মিত মুখে সেটাকে নিজের প্রাপ্যের মত গ্রহণ করলেন, দেবতা যেমন ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন তেমনি ভাবে—তারপর যখন তিনি বক্তৃতা করতে উঠলেন তখন কি নিস্তব্ধতা ও একাগ্রতা চারিদিকে, সকলে গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে, তারও পরে সভা ভাঙ্গলে অটোগ্রাফ নেবার জন্য কি হুড়োহুড়ি সকলকার। সে

কী ধাক্কাধাক্কি এবং কাড়াকাড়ি ; খাতার সাদা পাতায় সামান্য একটা কালির আঁচড়ের জন্য। শুধু ত একটা নাম-সই, তারই এত মূল্য।

সিসি মন স্থির করে ফেললে। সাহিত্যিককেই সে বাকী জীবনটা পূজা করবে। যদি সারা জীবনের জন্য কাউকে সঙ্গী করতেই হয় ত এমনি লোক বেছে নেওয়াই ভাল। পথ সে দেখতে পেয়েছে এবার, আর ভুল হবে না, আর এদিক ওদিক তাকাবে না সে।

এ সাহিত্যিক অবশ্য ওর স্বজাতি স্বঘর নন। তা না হোক্— ওতে আর আজকাল আটকায় না।

সে কিছু লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে কিছু বা কিনে সেই সাহিত্যিকের সব বই পড়ে ফেললে। তার পর লিখলে এক দীর্ঘ চিঠি—ওর বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে (ভদ্রলোক কথাসাহিত্যিক—অর্থাৎ কিনা নভেল-লেখক) নানা প্রশ্নের অজুহাতে অজস্র স্তুতি করে। সাহিত্যিকটির নাম—আসল নাম নাই বললুম—ধরা যাক্ সুদর্শন। সুদর্শন এতদিন সাহিত্য-চর্চা করে বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকা সম্বন্ধে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন তখন এই চিঠি। এমন ভক্তিমতী পাঠিকা কখনও কেউ পেয়েছে কিনা সন্দেহ, সুদর্শন ত নয়ই। সুতরাং তিনিও দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। এমনি চিঠি লেখালেখি বার তিনেক, তারপরই সাক্ষাৎ। দেখা গেল সুদর্শন মৃতদার—বয়সও খুব বেশী নয়। একটি মেয়ে আছে, সে থাকে মামার বাড়ী। সিসি ওকে একদিন আহারের নিমন্ত্রণ জানালে বাড়ীতে। তারপর চা পানের উপলক্ষে করলে আমন্ত্রণ—তারপর অকারণেই শুরু হল ওর আসা। মাস-দুই পরে উদ্দেশ্যটা সিসি খুলে বললে বাবার কাছে।

ওর বাবার তখন রিটায়ার করার বয়স হয়ে গেছে, টেনে টুনে আর একটা বছর এক্স্টেন্শ্যন্ পাবেন কিনা সন্দেহ—আশা করতে শুরু করেছিলেন কবে যে মেয়ে পাশ ক'রে ভাল রকম একটা চাকরী খুঁজে নেবে এমন সময় এই আকস্মিক আঘাত। এমনিতেই যথেষ্ট দুঃখিত হবার কথা, তারপর পাত্রের বিবরণ শুনে একেবারে অবাক—যাকে বলে বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

'সাহিত্যিক ? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?'

'তার মানে ?' মেয়ের মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে সপ্তমে চড়ে উঠল, স্বর হয়ে গেল তীক্ষ্ণ।

'যা, এতদিন ধরে এত বেছে শেষকালে আর পাত্তর পেলি না, সাহিত্যিককে বিয়ে করবি ? বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবার সাহিত্যিক, আরশোলা আবার পক্ষী। দেখ্‌গে যা—হয়ত নেশা ভাঙ করে, তাও ধার ক'রে। যা-যা, ও সব পাগলামী ছাড়।'

সিসি বাধা পেলেই কঠিন হয়ে ওঠে। বললে, 'তোমার রুচির সঙ্গে আমার রুচি মেলবার পথ ত রাখোনি বাবা—কোনমতে একটা পাশ করার পরই যদি তোমার মত কেরানীগিরিতে ঢুকিয়ে দিতে, তাহলে এত দিন কলম পিশে হয়ত তোমার মতই রুচি হত—মিছিমিছি এত লেখাপড়া শেখাতে গেলে কেন ?'

'সেইটেই দেখছি অন্যায় হয়ে গেছে।' তিনিও গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কেরাণীগিরির পয়সাতে লেখাপড়া শিখছ কেরাণী বাপকে অপমান করবার জন্যে, সেটা তখন ভাবিনি। আর লেখাপড়া শেখাতে চাওয়ার মত রুচিটা অত বছর কেরাণীগিরি করার পরও কী করে ছিল তাই ভাবি—'

'ঐ ত তোমার দোষ বাবা। সবতাতেই বাঁকা বাঁকা কথা বলো। আমি কি তোমাকে অপমান করার জন্যই কথাটা বলেছি ?'

'না মা, তুমি সোজা কথাই বলেছ, আমি বাঁকা অর্থ করেছি।'

উনি চুপ করে যান। কিন্তু সিসি চুপ করেনা। সুদর্শনকে সে বিয়ে করবেই—সে মন স্থির করেছে।

বাবাও জানিয়ে দিলেন, বিয়ে সে করতে পারে কিন্তু বাবার কাছে এক পয়সা পাবার আশা যেন না করে। এখনও না—এর পরেও না।

'সে ত জানিই বাবা। শুধু তাই কেন কোন দিন সাধ্যে কুলোয়ত যে টাকাটা তুমি আমার পেছনে খরচ করেছ এতকাল, সেটাও শোধ দেবার চেষ্টা করব।'

সুদর্শনও অবশ্য টাকার কথা ভাবেন নি। দুখানা বইয়ের কপিরাইট বেচে বিয়ের খরচটা যোগাড় করলেন। রেজেষ্ট্রী করেই বিয়ে হ'ল কিন্তু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দিকে সুদর্শনের ঝোঁক বেশী বলে সেটাও হ'ল! ফলে বিয়ের আনুষ্ঠানিক আচারের যোগাড় করতে ও বরযাত্রী কন্যাযাত্রী খাওয়াতে—খুব কম করেও শ পাঁচেক টাকা খরচা হয়ে গেল। এ ছাড়া বিয়ের দান ও গহনা কিছু—তাতেও হাজার দুই। সিসি কিছুই চায়নি কিন্তু পুরানো চুড়ি ভেঙ্গে যখন নতুন চুড়ি হ'ল এবং তার সঙ্গে এল ভাল হার ও কানবালা, তখন আপত্তিও করলে না।

সিসির বাবা খুশী হলেন না বটে—সিসি হ'ল।

বন্ধু বান্ধবরা অভিনন্দন জানালেন, সহপাঠিনীরা ত রীতিমত ঈর্ষিত! ওর প্রতিপত্তি ও সম্মান যেন বেড়ে গেল অনেকখানি। ভুল করেনি সাহিত্যিককে বেছে নিয়ে সে, ঠিকই করেছে। এমন কি আত্মীয়রাও সকলেই যেন সম্ভ্রমের চোখে দেখছেন। অতবড় সাহিত্যিক হল আমাদের জামাই! সিসির বরাত ভাল।

বিবাহের পরের দিন যখন শাশুড়ী বধূ-বরণ করে তুললেন তখনও সিসির মন্দ লাগল না। এক বাড়ী লোক, বৌভাত ফুলশয্যার ভীড় ও কোলাহল সবটা মিলিয়ে উৎসবের নেশা লাগল ওর মনে। বাঙালী গৃহস্থ ঘরের বধূ জীবন ত মন্দ নয়। বেশ একটা যেন নতুনত্ব আছে—এতকালকার একঘেয়ে জীবনের পর এ একটা বৈচিত্র্য বটে।

কিন্তু বিবাহের পরও যখন দেখলে যে মাথায় কাপড় দিয়ে থাকতে হয়, শাশুড়ীর কাছে বসে রান্নার যোগাড় দিতে হয়, খাওয়ার সময় তাঁকে হাওয়া করতে হয়, রাত্রে তিনি ঘরে শুতে গেলে তবে নিজের ঘরে আসবার অনুমতি মেলে এবং সবচেয়ে স্বামী বাইরে বন্ধু-বান্ধব ও ঘরে বই-লেখা নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন—তখন সে যেন হাঁপিয়ে উঠল।

একদিন সে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে।

"ওগো শুন্‌ছ, আমি একটু বেরোব।"

"কোথায় ?"

"তা জানি না। যেখানে হোক্—"

"সে আবার কি ? সঙ্গে কে যাবে ? মাকে বলেছ ?"

"সঙ্গে আবার কে যাবে! এতকাল কি কেউ সঙ্গে যেত ? আমি একাই যাব।"

"সেটা কি ঠিক হবে ? মা কি ভাববেন ? মা বাবা…ওঁদের বলেছ ?"

"বলতে হয় তুমি বলো। ওঁরা কেমন একরকম করে তাকান এবং গম্ভীর হয়ে থাকেন—আমার ভাল লাগে না।"

"হ্যাঁ, ওঁরা অতটা আধুনিকতা পছন্দ করেন না।"

"তাহলে তুমি কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে না ?"

'না ?'

"আসলে তুমিও পছন্দ করো না কোন রকমের আধুনিকতা।" রাগ করে বলে সিসি।

"নট অফ্ দি মার্ক। তা যদি বলো ত তাই। উৎকট আধুনিকতায় সুখ নেই, এই আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অভিজ্ঞতারই ফল।"

"তাহলে আধুনিকাকে বিয়ে করলে কেন ?"

"ঠিক আমি ত করিনি। তুমিই করেছ।"

"তখন বলোনি কেন তোমার বাড়ীর এই ধারা ?"

"তুমি ত জানতে চাওনি।"

রাগ করে দুম দুম করে পা ফেলে চলে গেল সিসি, দুদিন কথা কইলে না। কিন্তু সুদর্শন নির্বিকার। এমনিতেও ত তার টিকি দেখা যায় না, বাড়ীতে যতক্ষণ থাকত আগে, তাও কমিয়ে দিলে। গভীর রাত্রিতে ফিরেও বই নিয়ে বসে থাকে ইজিচেয়ারে—

অগত্যা সিসিকেই আবার ঝগড়ার সূত্রটা ধরতে হ'ল।

"এমন ক'রে আমার দিন কাটে কী করে বলতে পারো? কী করব আমি তাই বলে দাও।"

"সংসারে কাজের অভাব কি? মাকে একটু রিলিফ দাও না।"

"আমি কি হাতা-বেড়ি-খুন্তি ধরবার জন্মেই এতগুলো লেখাপড়া শিখেছিলুম?"

"তবে কি শুধু বসে থাকবে বলে শিখেছিলে? ডিগ্রিটা কি আলস্যের চাপরাস? পুরুষরাও ত এতগুলো লেখাপড়া শেখে, তাদের ত খেটে খেতে আপত্তি হয় না—বা করলে চলে না।"

"ও পয়সা রোজগারের কাজ সোজা, সবাই করতে পারে।"

"বেশ, সেই সোজা কাজটাই করো। টাকা যদি রোজগার করতে পার ত আপত্তি নেই।"

খানিকটা গুম্ খেয়ে সিসি বললে, "বিয়ে করবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি চাকরী করতে বেরোতে হয় ত লোকে কি বলবে? বাবা-মা কি মনে করবেন? সবাই ভাববে যে এত বেছে-বেছে খুব বিয়ে করলে সিসি বোস!"

"তা হলে ঘর-সংসার ছাখো। ইকোয়াল পার্টনারশিপ ইন্ লাইফ। দুজনকেই কিছু কিছু করতে হবে—জীবনের অংশীদার ত!"

"সেই ঘর-সংসার। তোমরা না বোহেমিয়ান লাইফ পছন্দ করো।"

"কাব্য দেখে যেমন ভাবো কবি তেমন নয়গো! আর তা ছাড়া যদি তাই হবে ত বিয়ে করব কেন? বোহেমিয়ান লাইফে ত বন্ধনের কথা নেই। আমি যদি নিত্য-নূতন স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াই তুমি সুখী হবে? তা ছাড়া ওতে সুখ নেই। গৃহের শান্তি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আলাদা জিনিস।"

"বললে অনেক কথাই বলা যায়। খুব ত পার্টনার শিপের কথা বলছ তোমার সঙ্গে সভাসমিতিতে যাবার সময় ত আমায় ডাকোনা সম্মানের ভাগ নিতে!"

"দোহাই তোমায়! সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী

—ওরকম রোমাণ্টিক প্রণয় আমার নেই, স্বীকার করছি! তাছাড়া দুজনেই যদি সভা-সমিতি করে বেড়াই ত জীবনযাত্রাটা চলে কিসে? ধোপার হিসেব, গয়লার ফর্দ, মাসকাবারী বাজার, সংসারের জিনিস পত্র ঝেড়ে মুছে রাখা, খাদ্যখাবারগুলো নির্ভেজাল এবং পরিষ্কার হচ্ছে কিনা দেখা, রান্না—এর কোনটাই তুচ্ছ নয়। জীবনের শুধু স্বাচ্ছন্দ্য ত নয়—প্রয়োজনের দিকও বটে ওগুলো। বালিগঞ্জের অতি আধুনিক ধনীদের দেখছি, আমার বন্ধুবান্ধবদের মতে অতি আধুনিক মধ্যবিত্তদেরও দেখছি—কেউই যে সুখী তা আমার মনে হয় না। বিদুষী বা শুধু মডার্ণ স্ত্রীকে বিজ্ঞাপন করে বেড়ানোর মধ্যে বাহাদুরী আছে কিন্তু সুখ নেই। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকিয়েও দেখেছি। একটু স্নেহের কাঙাল হয়ে থাকে সারা জীবন!"

"থাক। ও সব বক্তৃতা শুনতে চাইনি। স্বার্থপর কাপুরুষ কোথাকার, এত যদি সেকেলে মন তোমার ত মডার্ণ মেয়েকে বিয়ে করতে গিছলে কেন? পাড়াগাঁয়ের জংলী নোলকপরা মেয়ে আনতে পারোনি?"

"দুজনেরই ভুল হয়েছে সিসি। আমি ভেবেছিলুম সায়ান্স পড়া মেয়ে জীবনটাকে ফ্যাশনের চোখে না দেখে তার সত্য মূল্য দেবে।"

অনেক ঝগড়া করেও কোন ফল হয় না। অগত্যা কাজের অভাবে (বই পড়তেও ওর ভাল লাগে না—আধুনিক নভেলগুলো পর্যন্ত শুষ্ক, হেভি রিডিং—অতএব অপাঠ্য—এই ওর বিশ্বাস) সংসারেই মন দিতে হয়। কিন্তু সব চেয়ে বড় আঘাতটা ওর সেইখানেই অপেক্ষা করছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যিকের আয় বাঁধা থাকে না, হঠাৎ আসে। সুতরাং তার ওপর শ্বশুর-শাশুড়ীর আস্থা নেই। ওর দেওর সত্তর টাকা মাইনের চাকরীতে ঢুকেছে বলে তার খাতির এবং আদর দুই-ই বেশি। অফিস যেতে হয় বলে সে কিছুই করে না। বাড়ী শুদ্ধ লোক তটস্থ। সুদর্শনকে সবাই বেকার ভাবে।

সিসি দু একবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে তিনশ টাকার কম সংসারের

খাওয়া দাওয়া চলে না যখন এবং দেবরের সত্তর টাকার মধ্যে মাত্র চল্লিশ টাকা অর্থাৎ বাড়ী ভাড়াটাই পাওয়া যায় শুধু (সাবেকী ভাড়া চলছে তাই— বাড়ীওলা নালিশের ভয় দেখাচ্ছে)—তখন যেমন করেই হোক্ আর যেভাবেই হোক্ বাকীটা যোগাচ্ছে তার স্বামীই, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে। অশান্তিই বেড়েছে—খাতির বাড়েনি।

তার ওপর নিত্য অভাবেও সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সুদর্শনকে বললেই শোনে 'বইয়ের বাজার বড্ড মন্দা। এই আর জোটাতে পাচ্ছি না।'

রেশন, তেল, ঘি, মাখন, বাজার, কাঠ, কয়লা, দুধ—এগুলোর সংস্থান করতেই নিত্য একটা যেন যুদ্ধ করতে হয়। স্নো পাউডার ত চুলোয় যাক্— শাড়ী-সায়াই দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। পুরোনো ভাঁড়ার খালি হয়। একদিন সিসি বাপের বাড়ী গিয়ে জোর করে কুমারী জীবনের কাপড়গুলো বার করে নিয়ে আসে কিন্তু সেই বা ক দিন?

তার ওপর স্বামীকেও সে পায় না। শিল্পী মাত্রই আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর এটা সে বুঝেছে। স্বামী শুধু যেন প্রয়োজনের জন্যই বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীরও যে প্রয়োজন আছে তা স্বীকার করেন না। আশে পাশের সামান্য কেরানীরাও তাদের স্ত্রীকে নিয়ে কত আদিখ্যেতা করে—আর সে? ভাবতেও সিসির চোখে জল আসে।

অবশেষে একদিন রেশন আনাও বন্ধ হয়! দুমাস কোন টাকা পায়নি কোথাও থেকে সুদর্শন। সিসিকে চিঠি লিখতে হল বাবাকে, "বাবা শখানেক টাকা ধার দিতে পারো? পনের দিনের মধ্যেই শোধ দেব!"

বাবা চিঠি লেখেন "বুঝেছি মা! এই দশ টাকা পাঠালুম, রেশনটা আনিয়ে নিও।"

চাকরী খুঁজছে এখন সিসি। গোটা সত্তর দরখাস্ত দিয়েছে—কোন ফল হয়নি। ওর ইচ্ছা আছে, চাকরী পেলে স্বামীকে নিয়ে আলাদা বাসা করবে— না হয় একাই কোথাও গিয়ে থাকবে। কিন্তু মুস্কিল—হয় ত সেটা শেষ পর্যন্ত

হয়ে উঠবে না। কারণ তাতে সুখ আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে কিন্তু সম্মান নেই। লোকের বিদ্রূপ সওয়াটা বড় কঠিন। আর চেনা লোক নেই কোথায়? তবে চাকরীটা চাই। বাবাকে সে দেখিয়ে দেবে একবার।

এতদিনে ও বুঝেছে পূজা যদি কাউকে করতেই হয় ত ভাল বিলিতি মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবুকে।

হায়রে! তাই যদি করত সে!

# জামাই ষষ্ঠী

ইলিশ মাছ, মাংস, নূতন বেগুন, মিষ্টান্নের হাঁড়ি প্রভৃতি লইয়া প্রিয়নাথ ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ঢুকিলেন।

—ওগো শুনছ, এই হাঁড়িটা নামিয়ে নাও দেখি আগে। গেল বুঝি পড়ে—আর কটা নিই!…তবু এখনও আম, দই বাকি রইল। আমের যা দর, উঁকি মেরেছিলুম একবার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে—আটটার বেশি দিতেই চায় না—

আপন মনেই প্রিয়নাথ বকিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল ইন্দ্রাণীর দিকে। এক হাতে তিনি হাঁড়িটা লইয়াছেন বটে, আর এক হাতে মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতেছেন— নিঃশব্দ কৌতুকের হাসি।

'কি হ'লো গো তোমার ?'

ইন্দ্রাণী হাসিতে হাসিতেই বাকি জিনিসগুলা নামাইয়া লইয়া রান্নাঘরে রাখিলেন। তারপর কহিলেন—একটা মজা দেখবে ? একবার ওপরে এস।

প্রিয়নাথ ইন্দ্রাণীর এই অবস্থায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অপরাহ্ণের আর বেশী দেরি নাই, জামাই এখনই আসিয়া পড়িবে—রান্নাবান্না সব এখনও বাকি—এখন কি তাঁর মজা দেখিবার সময় ?

আরও একবার মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, কী ব্যাপার বলো তো? আজ তোমার হলো কি ?

ইন্দ্রাণী তবুও কোন জবাব দিলেন না, অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে পিছনে পিছনে আসিতে বলিয়া পা-টিপিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। অগত্যা প্রিয়নাথবাবুও তাঁহার পিছু পিছু উপরে উঠিলেন এবং দোতলার সংকীর্ণ বারান্দাখানি পার হইয়া দালানে পৌছিলেন।

গলির ভিতরে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি, কিন্তু খুব ভিতরে নয়। মোড়ের একখানি বড়বাড়ির ঠিক পিছনেই তাঁহাদের বাড়িটা পড়ে। সেই জন্য সামনের

তিনতলা বাড়িটা বড় রাস্তা আড়াল করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের শয়নকক্ষের একটা জানালা হইতে এক ফালি রাস্তা দেখা যায়। ইন্দ্রাণীর সঙ্কেতমত প্রিয়নাথ নিঃশব্দে শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিলেন তাঁহাদের নব-বিবাহিতা কন্যা অনুকণা সেই জানালাটিতে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বড় রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। অনেকক্ষণ লোহার গরাদেতে কপাল চাপিয়া থাকার ফলে লৌহদণ্ডের দুইটা রক্তিম ছাপ নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কপালের দুইদিকে।

প্রথমে প্রিয়নাথ ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু একটু পরে তাঁহার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল। তিনি একবার প্রসন্নমুখে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর আগের মতই চুপি চুপি নীচে নামিয়া আসিলেন।

ইন্দ্রাণী নীচে আসিয়া মন্তব্য করিলেন, আজকালকার মেয়েদের আর বিয়ে হবার যো নেই !···ব্যস, বর ছেড়ে একটি মিনিটও থাকা চলে না।

প্রিয়নাথবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, দোষটা আজকালকার মেয়েদেরই বটে। তুমি ঠিক ঐ জানলায় অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতে না ? যেমন মা তেমনি মেয়ে হয়েছে, ওর আর দোষটা কি ?

তিনি ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। ইন্দ্রাণী লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার জন্য চা আনিতে গেলেন।

এক দফা মুখ-হাত ধুইয়া চা ও জলযোগের পর প্রিয়নাথবাবু আবার বাজারের দিকে বাহির হইয়া পড়িলেন। অনুকণার বিবাহের পর এই প্রথম জামাইষষ্ঠী—অনুষ্ঠানের কোন ক্রুটিই তিনি রাখিবেন না। আর রাখিবার বিশেষ কারণও ছিল না। প্রিয়নাথের আয় সাধারণ বাঙালীর হিসাবে মন্দ নয়—সন্তান ঐ অনুকণা এবং একেবারে দুগ্ধপোষ্য একটি ছেলে। সংসারে অন্য বাড়তি লোকও বিশেষ ছিল না, একটিমাত্র বিধবা বোন, তাহাতে বরং সাশ্রয়ই হইত। সে বোনেরও স্বতন্ত্র আয় ছিল !

প্রিয়নাথ চলিয়া গেলে ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি কাজে মন দিলেন। অনেক

রান্না তখনও বাকি, বেলা আর বেশী নাই। ননদ শান্তির রান্না ভাল, তিনিই রাঁধিতেছিলেন, ইন্দ্রাণীর কাজ শুধু যোগাড় দেওয়া, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে যোগাড় দেওয়াতেই খাটুনি বেশী।

কিন্তু সহস্র কাজের মধ্যেও কথাটা ইন্দ্রাণী মন হইতে দূর করিতে পারেন নাই। বার বার তাঁহার নিজের যৌবনের কথা মনে হইতেছিল। ঠিক ঐ বয়সেই তাঁহারও বিবাহ হইয়াছিল এবং ঐভাবেই প্রত্যহ তিনি স্বামীর আগমনের পথ চাহিয়া থাকিতেন। আশ্চর্য! সেই বিশেষ গরাদেটিতেই অনু মাথা রাখিয়াছে!··· শুধু কি এখানে? পিত্রালয়ে গেলেও তিনি স্বামীর আসিবার দিনটিতে বার বার রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইতেন। এজন্য ভাইবোনদের কাছে কত লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে। ভাগ্যিস তাঁহার বাড়ীতে বেশী লোকজন নাই, নইলে আজ অনুকণারও রক্ষা থাকিত না—

কথাটা মনে হইয়া ইন্দ্রাণী আপনা-আপনিই হাসিয়া উঠিলেন। শান্তি ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, আ মর্—আপন মনে হেসে মরছিস কেন? কি হলো আজ তোর?

দুজনে প্রায় একবয়সী—এজন্য 'তুই-তোকারী'ই চলিত। ইন্দ্রাণী কহিলেন, তোর ভাইঝির কাণ্ডটা একবার দেখে আয় না—সেই থেকে হাঁ করে রাস্তার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

শান্তির মুখখানা এক মুহূর্তের জন্য কেমন হইয়া গেল। এ রোগ তাঁহারও ছিল। কিন্তু একটু পরেই হাসিয়া কহিলেন, তাতে আর হয়েছে কি? তুই থাকতিস না অমনি করে দাদার জন্যে?

ইন্দ্রাণী জবাব দিলেন, আমাকেই কি তোরা ছেড়ে দিয়েছিলি? কম যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তার জন্যে?

শান্তি কি একটা উত্তর দিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন, কারণ অনুকণা তখন গামছা কাঁধে করিয়া নীচে নামিতেছিল, বোধ হয় গা ধুইতে যাইবে। সিঁড়ির

পাশেই রান্নাঘর, নীচে নামিয়া একবার দরজার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল, কি ভাজছ-গা পিসিমা, বেশ গন্ধ ছেড়েছে—

তখনও তাহার কপাল হইতে গরাদের দাগ মিলায় নাই। সেদিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া পিসিমা জবাব দিলেন, তুই সারাদিন আছিস কোথায়? তোর বর খাবে, আমরা খেটে খেটে মরব নাকি? আয় দেখি এদিকে, কোমর বেঁধে লাগ্ দেখি—

—বয়ে গেছে আমার! তোমরা নেমন্তন্ন করেছ, তোমরা বুঝবে—

সে মাথা দুলাইয়া কলঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ইন্দ্রাণী কহিলেন, তোরও যেমন! ওর প্রাণ পড়ে আছে সেই জানালার দিকে। তবে নেহাৎ 'ভাবন'টাও না করলে নয় তাই—

খানিকটা পরে কী একটা কাজে ইন্দ্রাণী উপরে উঠিয়া দেখিলেন, শান্তির ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া অনুকণা প্রসাধন করিতেছে—। এই কাজটাতে সে খুব পটু নয়, তবু নিজেই করিতে যায়। চুল বাঁধা আর কিছুতে ঠিক হয় না, বার বার খুলিতেছে, বার বার বাঁধিতেছে। অনুকণা সুন্দরী নয়। মায়ের অসাধারণ রূপের কিছুই সে পায় নাই, বাবার ধাতে গিয়াছে—নিতান্ত সাধারণ চেহারা। কুৎসিত নয়, এই পযন্ত। সেই জন্যই তাহার প্রসাধনের সখটা খুব বেশী, কিন্তু পারিয়া ওঠে না।

দালানের ওপাশে তাহাদের আয়না-বসানো আলমারিতে ইন্দ্রাণীর চেহারাটা প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল—এখনও তাঁহার রূপ শিখার মত। ললাটে সামান্য দু'একটি রেখা দেখা দিয়াছে হয়ত, কিন্তু দূর হইতে তাহা কিছুই বুঝা যায় না। সন্তানাদি বেশী না হওয়ায় দেহের বাঁধুনি তখনও ভালই আছে—সামান্য একটু মোটা হইয়াছে বটে, তবে সে কিছু নয়। সেদিকে চাহিয়া মেয়ের প্রতি মমতায় মন ভরিয়া উঠিল। আহা বেচারি, ভগবান উহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন যখন, তখন সাজগোজ একটু দরকার বৈকি!···

তিনি ঘরে ঢুকিয়া সস্নেহে কহিলেন, আয় আমি মাথাটা ভাল করে বেঁধে দিই—

অম্বুকণা ফোঁস করিয়া উঠিল, হ্যাঁ, তবেই হয়েছে আর কি! তোমাদের সে-সব সেকেলে চুল বাঁধা এখনকার দিনে চলে কি না! তাহ'লে আর আমি কারুর সামনে বেরোতেই পারব না—। তুমি যাও, আমি ঠিক বেঁধে নিচ্ছি।

তা বটে!...মেয়ে বৎসর দুই-তিন ইস্কুলে গিয়াছিল, তাহাতেই এই। ইন্দ্রাণী হাসিয়া কহিলেন, একেবারে কারুর সামনে বেরোনো যাবে না, হ্যাঁরে—? আমাদের তাহ'লে ঘেরাটোপ পরে থাকা উচিত বল্!...যা খুশী করগে যা—

তিনি ক্ষুন্নমনেই নীচে নামিয়া আসিলেন। তিনি কি এতই বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন যে, সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞানও নাই? মেয়ে কি মনে করে তাঁহাকে? ইন্দ্রাণী হিসাব করিয়া দেখিলেন মাত্র আঠার বৎসর তাঁহার বিবাহ হইয়াছে—কিন্তু অতও মনে হয় না। মনে হয় এই ত সেদিনের কথা—যখন তিনি নবোদ্ভিন্না কিশোরী! তাঁহাদের প্রণয়লীলা হইতে এখনকার কিশোরীদের প্রণয়লীলা ত কিছুমাত্র স্বতন্ত্র নয়, প্রত্যেক অভিব্যক্তিই ত এক! তবে ইহারা নবীনত্বের কি এত গর্ব করে?

নীচে আসিতেই শান্তি একটা ফরমাস করিলেন, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাহার উত্তরে ইন্দ্রাণী কিছু একটা পরিহাস করিবেন, কারণ ফরমাসের ভিতর অন্য অর্থ ছিল। কিন্তু ইন্দ্রাণী একটাও কথা না বলাতে বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, কি হলো তোর বৌদি, মুখ অত ভার কেন?

ইন্দ্রাণী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, কৈ না, কিছু ত হয়নি।

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিলেও কথাটা তিনি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিলেন না। কাঁটার মত খচ খচ করিতেই লাগিল। এককালে শুধু তাঁহার রূপেরই গৌরব ছিল না প্রসাধনেরও ছিল। মনে পড়ে, বিবাহের পরও কত বাড়ির কুমারী মেয়ে 'কনে দেখা' দিবার পূর্বে তাঁহার কাছে

প্রসাধনের পাঠ লইয়া গিয়াছে। জবরজঙ্গ তিনি কোন দিনই ভালোবাসিতেন না, উগ্র পাউডার বা আলতা বা রঙও তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই কিন্তু তবু তাঁহার সহজ, সুন্দর পরিপাট্যে সকলেই তখন মুগ্ধ হইত। অতি বড় খুঁত-খুঁতে দৃষ্টির সামনেও তিনি পরীক্ষায় পাশ লইয়াছেন···আর এই কয়টা বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার কন্যা তাঁহাকে একেবারে বুড়ো-হাবড়ার দলে ফেলিয়া দিল!

অথচ, ঐ অনুকণা জন্মিবার পরই—ঘটনাটা ইন্দ্রাণীর মনে পড়িয়া গেল—তাঁহার স্তিকার মত হইয়া চেহারা খুব খারাপ হইয়া যায়। ঠিক সেই সময় লাহোর হইতে চিঠি আসিল যে, দীর্ঘ বারো বৎসর পরে তাঁহার জাঠশ্বশুর বাড়ি আসিতেছেন এবং আসিতেছেন শুধু ইন্দ্রাণীকে দেখিবার জন্যই। শ্বশুর ত ভাবিয়াই আকুল, স্পষ্টই একদিন বলিলেন, বৌমা তোমার রূপের কত প্রশংসা করে চিঠি লিখেছি, এখন এই অবস্থায় দেখে দাদা কি মনে করবেন কে জানে!

ইন্দ্রাণী হাসিয়াছিল সেদিন মনে মনে। তাহার পর জাঠশ্বশুর যখন সত্য-সত্যই আসিয়া পৌছিলেন এবং ইন্দ্রাণীকে ডাক পড়িল, তখন ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া শুধু জ্যাঠামশাই-ই বিস্মিত হন নাই, তাঁহার শ্বশুরও হইয়াছিলেন। আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, বৌমা, তোমার চেহারা কি ভোজবাজিতে বদলে গেল?

আজ সেই ইন্দ্রাণীকে অপমান করিয়া বসিল ঐ একফোঁটা মেয়ে অনুকণা? হায়রে সতেরো বৎসর!

সহসা শান্তির কথায় যেন ইন্দ্রাণীর তন্দ্রা ভাঙ্গিল, তুই এবার গা ধুয়ে নিলি না কেন বৌদি, প্রথম জামাইষষ্ঠী, জামাই এসেই ত প্রণাম করবে। তোকে আমাকে দু'জনকেই। সন্ধ্যের ত' আর দেরি নেই—

তা বটে। ইন্দ্রাণী কহিলেন, তা তুমিই সেরে নিলে না কেন ঠাকুরঝি?

শান্তি হাসিয়া কহিলেন, আমার আর সারাসারি কি, একখানা ধোয়া কাপড় পরা, এইত? নেহাৎ নতুন জামাইয়ের সামনে বেরোনো তাই। রান্নাটা, একদিককার শেষ করে মাংসটা চাপিয়ে একেবারে চান করতে যাব, তুই তখন

বরং একটু দেখিস এখন আমি দেখছি তাছাড়া সন্ধ্যে হয়ে গেল. মাথা বাঁধবি কখন ?

ইন্দ্রাণী অগত্যা হাতের সামান্য কাজটুকু সারিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অনুকণার প্রসাধন তখন শেষ হইয়াছে, সে ওঘরে গিয়া আবার জানালায় দাঁড়াইয়াছে।

ইন্দ্রাণী মাথা বাঁধার সরঞ্জাম লইয়া আয়নার সামনে আসিয়া বসিলেন। কথাটা তখনও মাথাতে ছিল, তুচ্ছ কথা বলিয়া বার বার মনকে তাড়না করিলেও একেবারে ভুলিতে পারেন নাই, তাই আয়নার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অকস্মাৎ চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। একবার পিতামহকে ভোজবাজি দেখাইয়াছিলেন, আর একবার পৌত্রীকে দেখাইবেন নাকি ? মেয়েকে তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয় তাহা হইলে। দোষ কি ? বেমানান দেখাইবে ? কিন্তু কেন ?······কী এমন বয়স হইয়াছে তাঁহার যে, সাজগোজ একেবারেই বাদ দিতে হইবে ?

ইন্দ্রাণী মনে মনে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। একটু যে লজ্জাবোধ না হইতেছিল তা নয়, কিন্তু তিনি মনকে বার বার বুঝাইতে লাগিলেন যে, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই ! জামাইয়ের সামনে একটু পরিষ্কার হইয়া বাহির হওয়াই প্রয়োজন, আর তিনি ত এমন কিছু ঘটা করিতেছেন না। কেহ হয়ত টেরই পাইবে না যে, তাঁহার সেদিনকার বেশভূষায় কিছু পারিপাট্য আছে—

মাথা বাঁধিবার সময় ইন্দ্রাণীর হাত কাঁপিতে লাগিল।

প্রসাধন শেষ করিয়া কাপড় বদলাইতেছেন এমন সময় নীচে জামাতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ঝিকে প্রশ্ন করিতেছে, মা কোথায় হরির মা ?

দ্রুত হাত চালাইয়া কাপড়-পড়া শেষ করিয়া ফেলিলেন তিনি। অনিল ইহারই মধ্যে আসিয়া গেল ! সবে ত সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রিয়নাথবাবুও ফেরেন নাই যে তিনি অভ্যর্থনা করিবেন। শান্তির তখনও স্নান পর্য্যন্ত সারা হয় নাই। না, তাঁহাকেই আগে দেখা দিতে হইবে, উপায় নাই—

ততক্ষণে অনিলের পদশব্দ সিঁড়িতে শোনা যাইতেছে। অনুকণা মাথায় কাপড়ের প্রান্তভাগটুকু তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দালানের বড় আলোটা সে আগেই জ্বালিয়া দিয়াছিল—সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উজ্জ্বল আলোতে আগে তাহাকেই নজরে পড়ে, এমনি একটা গোপন ইচ্ছা বোধ হয় ছিল।

হইলও তাহাই। চোখে চোখে মিলিতেই প্রচ্ছন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল দুজনের চোখে। তবু রীতির অনুরোধে অনিল প্রশ্ন করিল, মা কোথায়? তাঁকে প্রণাম করতে হবে যে—

অনুকণা ডাকিল, মা।

মৃদু চাপা কণ্ঠে উত্তর আসিল, এই যে যাই—

তাহার পরই ইন্দ্রাণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উজ্জ্বল আলো তাঁহারও মুখেচোখে আসিয়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেদিকে চোখ পড়িতেই বিস্ময়ে অনিল যেন পাথর হইয়া গেল। শাশুড়ীকে সে ত কয়েকবারই দেখিল, কিন্তু তিনি কি এত রূপসী, তাঁর এত অল্প বয়স? সে পলকহীন চোখে চাহিয়াই রহিল, প্রণাম করার কথা মনেও পড়িল না।

অনুকণারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সহজ কবরী রচনা, সামান্যতম পাউডার এবং সাধারণ একখানা ঢাকাই সাড়ি এমন ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারে, আশ্চর্য!...

ইন্দ্রাণী যখন প্রসাধন করিয়াছিলেন, তখন একমাত্র কন্যার অবহেলায় প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাটাই নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল, আর কোন কথা তাঁহার খেয়াল ছিল না। জামাতার কথাটাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন অনিলের বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ছি, ছি,—জামাই কি ভাবিতেছে।...কেন মরিতে তিনি এ কাজ করিলেন, এখন যে ছুটিয়া পলাইবারও উপায় নাই।

ইন্দ্রাণী মাথা নত করিতে অনিলেরও সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে চারটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল।

পিসিমা কোথায়, মা?

আসছেন বাবা। তুমি ও ঘরে বোসো, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি—বলিয়া তিনি একরকম ছুটিয়াই শান্তির ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। তখন মনে হইতেছে, 'ধরিত্রী দ্বিধা হও।' পিছন হইতে জামাতার কণ্ঠস্বর কানে আসিল, চুপি চুপি অনুকণাকে বলিতেছে, মাকে বেশ মানিয়েছে, না?

একটা শুষ্ক 'হুঁ' বলিয়া অনুকণাও এ ঘরে আসিল। তখন তাহার বিস্ময় রীতিমত উষ্মায় পরিণত হইয়াছে। সে আসিয়া চাপা গলায় ভৎর্সনার সুরে মাকে বলিল, ছি, ছি, মা কী করেছ? জামাইয়ের সামনে এমনি কোরে বেরোয়? কি মনে করলেন উনি বলো দেখি!·· তুমি না হয় লজ্জাসরমের মাথা খেয়েছ, আমরা মুখ দেখাই কি ক'রে?

খুব বিচলিত না হইলে এ ভাষা অনুকণার মুখ দিয়া বাহির হইত না।

জবাব ইন্দ্রাণীর মুখের কাছেই আসিয়াছিল। একবার ভাবিলেন তিনি যে বলেন, 'কেন রে, আমি ত কিছুই জানি না। তা ছাড়া তোর মত রুজ-লিপষ্টিক-পেণ্ট-রঙ্গীনকাপড় কিছুই ত ব্যবহার করিনি। তবে তোর অত ঝাল কেন?' কিন্তু কী যেন একটা দুর্নিবার লজ্জা আসিয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল, তিনি কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। কন্যার উপর বিজয়গর্বের কণা[illegible]ও তাহার ভোগ করা হইল না। দ্রুত পদে নীচে নামিয়া গেলেন।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নামিতেই প্রিয়নাথের সহিত দেখা হইয়া গেল। তখন দ্বিতীয় দফার বাজার সারিয়া ফিরিতেছিলেন। বাড়িতে ঢুকিতে ঢুকিতে প্রশ্ন করিলেন, কী গো, জামাই এসে গেছে নাকি?

তখন আলো-আঁধারে অতটা ঠাওর হয় নাই। এখন উঠানে পা দিতেই ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া চোখ ধাঁধিয়া গেল তাঁহার। মুহূর্তের জন্য হয়ত চোখে মুগ্ধ দৃষ্টিও ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, এ করেছ কি? আজকের দিনে এম্‌নি করে সাজে? জামাই দেখলে কি ভাববে বলো দেখি—। হয়ত মনে করবে যে তুমিই তার মন ভোলাতে চাও—

চুপ!

অকস্মাৎ ইন্দ্রাণী ঢাকাই সাড়ির আঁচলটা গা হইতে খুলিয়া লইয়া চড় চড় করিয়া খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তাহার পর হাঁফাইতে হাঁফাইতে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, হ'লো ত? বাপ-বেটীর মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লো ত?···এখন হরির মার একখানা ছেঁড়া কাপড় এনে দাও. পরি।

হতভম্বের মত খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন, কী হ'লো আবার?

হবে আবার কি! আমি তোমাদের বাড়ির দাসিবাঁদী, সে কথা ভুলে একখানা ফরসা কাপড় পরেছিলুম, এই ত আমার অপরাধ? যাক্—সে অপরাধ আর হবে না। ঐ হরির মার কাপড় পরেই জামাইয়ের সামনে বেরোব—

শান্তি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, কী হয়েছে বৌদি?

ইন্দ্রাণী একেবারে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ রাখিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, আমার জামাই হয়েছে ব'লে এয়োস্ত্রীর লক্ষণ করবারও উপায় নেই ঠাকুরঝি, এরা যা মুখে আসে তাই বলে।

শেষ